অমর কথা

শ্রীসরোজিনী দত্ত প্রণীত

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশিকা
শ্রীসরোজিনী দত্ত
১৮১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মূল্য দেড় টাকা মাত্র

প্রিণ্টার শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ওঁ

উৎসর্গ

স্বর্গগত পরমারাধ্য ব্রহ্মযোগী পিতৃদেব শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ

রায় ও স্বর্গগতা পরমারাধ্যা ব্রহ্মযোগিনী মাতৃদেবী

শ্রীযুক্তা হেমলতা রায়ের শ্রীশ্রীচরণকমলে

অযোগ্যা অভাগিনী কন্যার হৃদয়ের

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিরূপে

'অমর কথা'

উৎসর্গীকৃত হইল।

নিবেদন

জীবন প্রভাতে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত যখন প্রিয়তম দেহমুক্ত হইয়া গেলেন তখন সূর্য্যের আলোও কালো কালো হইয়া গিয়াছিল। সেই সময় বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানে পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় এ শ্রান্ত ক্লান্ত জীবনপথে পথের রেখা খুঁজিয়া লইতে Meditation on death and Eternity নামক গ্রন্থখানিকে সুগভীর অন্ধকারে ধ্রুবতারার মত আমার সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। তাঁহাকে আমি বার বার সেজন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি। Frederica Rowan, Stunden der Andacht নামক জার্ম্মান পুস্তকের সুগভীর অমরচিন্তা রাশি মন্থন করিয়া এই বইখানি ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছেন এবং জগৎসমাজে অপূর্ব্ব সম্পদ দান করিয়া অমর হইয়াছেন। কত তপ্ত প্রাণ ইহা পাঠ করিয়া শীতল হইয়াছে। ধন্য তাঁহার লেখনী! ধন্য তাঁহার অমর বাণী! ইহার প্রতি অক্ষর আমার তপ্তবুক জুড়াইয়া দিল; সে পুণ্যাত্মাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি ও প্রণাম করি। পরে প্রায় এক বৎসর পরে যখন মৈত্র মহাশয় বইখানি ফিরাইয়া লইলেন, তখন গৃহ শূন্য বোধ হইত। পুস্তক হইতে কিছু কিছু দৈনিক পুস্তকে উদ্ধৃত ছিল তাহাই সময়ে সময়ে পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইতাম।

তারপরে কত বৎসর আর সে পুস্তকের সন্ধান পাই নাই। ভাগ্যবিধাতার অপূর্ব্ব লীলা! বৈধব্য জীবনের প্রায় দ্বাদশ বর্ষ পরে যখন আমার একমাত্র কন্যাসন্তান আমার আনন্দপুতলি চতুর্দ্দশ বৎসরের বালিকা "মাধুরী" ধনও "পেয়েছি অভয়পদ আর ভয় কারে

আনন্দে চলেছি ভব পারাবারে" গাহিতে গাহিতে হাসিতে হাসিতে পরমানন্দে ভবপারাবার পার হইয়া গেলেন, অপ্রত্যাশিত ভাবে সেই সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় হরকান্ত বসু মহাশয় এক পত্রে একদিন এই পুস্তকখানি বাংলাভাষায় ভাষান্তরিত করিতে অনুরোধ করিয়া ইহার একখণ্ড আমার নিকট প্রেরণ করিলেন। এই পুস্তক প্রেরণ ও তাহা বাংলায় প্রকাশ করিবার জন্য যে স্নেহানুরোধ সেজন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি। আমার পিতৃদেব এই পত্র দেখিয়া সাগ্রহে বলিলেন "সরোজিনী তোমায় এ কাজ করিতেই হইবে"। পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম। হায়রে ঘটনা চক্র! পরমারাধ্য পিতৃদেব ও পরমারাধ্যা মাতৃদেবী একে একে স্বর্গধামে যাত্রা করিলেন।

নানা ঘটনা পরম্পরায় বহির্মুখীন ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর মন যখন একান্ত উদাস ও অবসন্ন, সেই সময় দীর্ঘ বিনিদ্র রজনীতে সুগভীর নিশীথের শান্ত ছায়াতলে বসিয়া বসিয়া এই পুস্তকের মর্ম্মকথা বাংলায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই পুস্তকের প্রতি অধ্যায় একটি কবিতা দিয়া আরম্ভ। আমার স্নেহভাজন কল্যাণীয় পুত্রপ্রতিম ডাক্তার শ্রীমান সুরেশচন্দ্র ঘোষ সেগুলির ভাব পদ্যে প্রকাশ করিতে অনুপ্রেরণা দান করেন। সেজন্য আমার মাতৃহৃদয় তাঁহার কাছে একান্ত কৃতজ্ঞ। 'অমর কথা' তত্ত্ব-কৌমুদী পাক্ষিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া তত্ত্ব-কৌমুদীর সম্পাদক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু মহাশয় আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন। পুস্তকাকারে অমরকথা জনসমাজে বাহির হইবে কোনও দিন ভাবি নাই। শোকসন্তপ্ত অনেকে (তাঁহাদের নাম এ ক্ষেত্রে প্রকাশ না করাই ভাল) তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত অনুবাদ পাঠ করিয়া আরাম পাইয়া আমায় ইহা পুস্তকরূপে

প্রকাশ করিতে উৎসাহিত করেন। তাঁহাদের এ উৎসাহ দান আমি কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিতেছি। বেথুন কলেজের অধ্যাপক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম, এ, মহাশয় পুস্তকমুদ্রণকালে ইহার একটি করিয়া প্রুফ দেখিয়া দিয়া এবং সেই অবসরে যথাসম্ভব ইহার ভাষা প্রভৃতি সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে অশেষ ঋণে ঋণী করিয়াছেন। তাঁহারই অনুগ্রহে অমরকথার সুশোভন স্বরূপ দশের সম্মুখে প্রকাশ করা সম্ভবপর হইল। তাঁহাকে আমার হৃদয়ের সুগভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। সর্ব্বোপরি যিনি জীবনদেবতা—যাঁহার লীলা রহস্যের ভিতর অমরকথার অবতারণা তাঁহারই চরণে ভক্তিভরে বার বার প্রণাম করি। ইতি

কলিকাতা.
বেথুন কলেজ।
বৈশাখ ১৩৪২

শ্রীসরোজিনী দত্ত

সূচী

অমর কথা

অমর কথা



(১)

নিমেষে না ধীরে ধীরে মহাপ্রয়াণ বাঞ্ছনীয় ?

শান্তি-সলিল ঢাল্‌বে ব'লে
মরণ-ব্যথার-পথে
তাই কি তোমার বিজয় নিশান
ভক্তজীবন-রথে ?
শুভক্ষণটী ঘনায় যবে
মরণ-শয়ানপাশে,
তোমার বিভা-মাল্যকুসুম
সকল বেদন নাশে।
এ কি তোমার শান্ত লীলা,
কোমল পুলক পাখা
নিবিড় ক'রে ছাইল মোরে
প্রেমানন্দে মাখা।

বাড়াস্নে পা, পাপের ছবি,
আমার শয়ান পাশে,
যেথায় জাগি মরণ গানে
বিরাম-সুখের আশে
জীবন-আলো ফুরিয়ে এল,
সন্ধ্যা-সুরের গানে,
চোখের আলো নিব্‌ল যখন
মরণ-সখার তানে।
দেবলোকের আসন ছাড়ি’
আসে স্বরগ-বালা,
আনে তোমার শুভ্র করে
পুণ্য বিজয়-মালা।
আনন্দেতে পুণ্য গান
শান্তি-দোলার দোলে,
নিয়ে যাবে ব্রহ্মলোকে
প্রাণ-জুড়ানো কোলে।

এ কি নিদারুণ বাণী! এ কি বিনামেঘে বজ্রাঘাত! এই যে সেদিন তাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছে! আজ যে ক’ঘণ্টা আগেও আমার বুকের ধনের সঙ্গে কথা বলিয়াছি! আহা! কি হৃষ্ট পুষ্ট কোমল তনুখানি তার! আহা! আর সে এ

লোকে নাই ? ও মা এ কি কথা ! এ কি মর্ম্মান্তিক যাতনা ! ভাষা পারিবে কি এ কথা প্রকাশ করিতে ? শোকাতুর ভয়াতুর প্রাণ এ মরণকুহেলী মোচন করিয়া কোথায় ছুটিবে ? কেবলই ভয় ! কেবলই ভয় ! কি বলিতেছ তোমরা ? আমারই মঙ্গলদাতা জীবনসখারই এই অমোঘ বিধান ? যাঁর বিপুল বিধাতৃত্বের ভিতর বিশ্বকল্যাণ-বোধন বাজিয়া উঠিয়াছে, এ কি তাঁরই লীলা ? ও গো বল, এ কি আমার প্রাণসখারই লীলা তবে ?

হায় ! হায় ! তবে কেন মৃত্যুবিভীষিকা ! এরই নাম কি রূপের খেলা ? এ কি ? প্রাণময়ী হাসি, বুকভরা আশা, প্রাণজাগানো ভালবাসা, সব কি নিমেষে ফুরাইয়া যাইল ? কোন্ অজানার গোপন ঘরে তাহার ডাক পড়িয়া গেল ? ও গো, কি বিচিত্র এ রহস্য ! আমিও ত এক দিন ঐ চিরস্তব্ধতার ভিতর মৌনী হইয়া যাইব। কে জানে কবে ? আজ দিনের খেলা খেলিতেই হয়ত যাইবার ঘণ্টা বাজিয়া যাইবে ! সে মরণসাগর-পারে পরম বিচিত্র রহস্যপুরে কোন্ নিমেষে আমিও ছুটিব কে জানে ? হইবে কি লওয়া প্রাণময় চিরন্তন বিদায় ? কত সাধ আমার বুকের ধনদের কোমল পুলকস্পর্শ তৃষিত ব্যথিত বক্ষে জন্মের মত অনুভব করি ! কে জানে আনন্দে বিদায়-গান গাওয়া হইবে কি না ! ঐ

যে আকুল-করা আহ্বান-বাণী! আর ত পারি না! ঐ মরণ-সাগরপারেই আনন্দে পার হইয়া যাইব। রহিল তবে সব, দাও চিরন্তন বিদায়!

ঘরে ঘরে এ কি ছবি! মরণব্যাধির এ কি বিপুল প্রতাপ! কে গো মরণপথের যাত্রী অগ্রসর হইয়া চলিয়াছ? এ কি তোমার করুণ নয়নপাত! সাধ্য কে রক্ষা করে? ধীরে ধীরে চলিয়াছ, ইহাতেই কি আমার সান্ত্বনা? এ ক্ষীণ *হাত দু'খানা তোমার সেবা করিবে, আর আমি বিদায়ের* জন্য প্রস্তুত হইব? কোথায় আমার প্রস্তুত হওয়া? ওগো আমি যে আশা-মরীচিকা দর্শন করি। আমার প্রাণপ্রিয়ের অনন্ত নিদ্রা আমি কেমন করিয়া ভাবি? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। বাছা আমার বিদায়ের গান গায়, তবুও যে জননী-প্রাণ আশার মালা গাঁথে। আহা কি হাসি! এ কি মুক্তির আনন্দ! এই যে সত্যি সত্যি মরণ-বাঁশি বাজিয়া যাইল বুকের ঘরে। কই আমার বিদায়ের প্রস্তুত হওয়া? উঃ, এ কি তীব্র বেদনা! কোথায় আরাম, কোথায় শান্তি?

আবার ভাবি, সত্যি সত্যিই কি আনন্দধামের যাত্রী তুমি কালব্যাধির ভীষণ যাতনায় ক্লিষ্ট? তবে ভীষণ রোগের অখণ্ড প্রতাপের মধ্যেও এমন হাস কেমন করিয়া? ও কি শুভ্র বিমল বিভা! আনন্দে বদন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া

উঠিল ! ও কি আনন্দ, ও কি স্নিগ্ধ মুগ্ধ আলোকজ্যোতি ! আমি ত ভাবিতে পারি না কেমন করিয়া ফুটন্ত ফুল ঝরিয়া পড়ে, কেমন করিয়া রাঙা মুখখানি সাদা হইয়া যায়, কেমন করিয়া ঢল ঢল নয়ন দুটীর স্নিগ্ধজ্যোতি ম্লান হইয়া আসে। উঃ, এ কি মুক্তির বেদনা ? এ ত সইতে পারি না ! ওগো সকলদুঃখহরণ দয়ার ঠাকুর, মুক্ত কর, মুক্তির আনন্দ দান কর। শান্ত স্নিগ্ধ আনন্দময় চিরবিরামময় কোলেই স্থান দেও।

ওগো এমনি করিয়া বিনা মেঘে যখন অশনিপাত হয় তখনও চম্‌কিয়া উঠি। আবার মৃত্যুকালিমা যখন ধীরে ধীরে ছাইয়া যায়, সোণার তনু ম্লান হইয়া যায়, তাতেই বা কোথায় শান্তি ? তবুও ত পাগল বাঁশি বাজিবেই বাজিবে আমার ঘরে। যাব ত ঐ সুরেই পাগল হইয়াই আনন্দে আনন্দধামে।

তবুও কেন আর জটিল তর্ক ? তবুও কেন বল এ যে নিমেষে বজ্রাঘাত ? হায় হায় ! বলা হইল না, সজ্ঞানে আমার নাম বলা হইল না। কিসের বিচার কর দীন সন্তান তুমি ? অনন্ত ভূমা মহানের মঙ্গল ন্যায়দণ্ডে বিশ্বলীলা নিয়ন্ত্রিত। কে তুমি ক্ষুদ্র মানব বিচার কর ? যে করুণার বিচিত্র মহিমায় মানবের বুকে অপূর্ব্ব প্রাণকাহিনী ফুটিয়া

উঠিয়াছে, যে মঙ্গল ইচ্ছার ভিতর সমস্ত মহিমান্বিত, আমি কেমন করিয়া বলি, ওগো এ কি সর্ব্বনাশ হইল? এমনি করিয়া সব শেষ হইয়া যায়, তবু এ কি তোমার দয়ার পরিচয় নয়?

ভয়চকিত বিরহবিধুর চিত্ত কেবলই চম্‌কিয়া ওঠে। কেবলই অমঙ্গল, কেবলই বিভীষিকা! ও কি খেলা? ঐ শোন ভূকম্পের ভীম গর্জ্জন, ভীষণ বন্যা। এ কি নিমেষে লক্ষ লক্ষ প্রাণ চলিয়া গেল! পাপী তাপী সাধু অসাধু সবাই ভাসিয়া গেল সে মরণ-পারাবারে! ন্যায় বিচারক কে তুমি এমনি করিয়া সকলকেই একই পথে লইয়া চল?

ওগো কে তুমি চাও ক্লান্ত রোগশয্যায় শায়িত হইয়া অনুতাপের ভীষণ অগ্নিতে পুড়িয়া, সোণা হইয়া সোণার দেশে জাগিতে? ওরে অবোধ মন, মরণক্ষণে হোমানল জ্বাল্‌লেই কি হইল? মরণক্ষণে অনুতাপ-অশ্রুজলেই কি সব ধুইয়া গেল? ওগো অমৃতের অধিকারি! তোমায় যে নিত্য জাগরণ-মন্ত্র শিখিতে হইবে, তোমায় যে নিশিদিন তপস্যার হোমানল জ্বালাইয়া প্রাণময় আহুতির ভিতর দেবগন্ধ মাখিয়া চলিতে হইবে। যতদিন যাত্রা রূপের দেশে, জাগ্রত গান গাহিয়াই চলিতে হইবে, সেই মহীয়সী ইচ্ছারই জয়লীলা

ঘোষণা করিতে হইবে। আমি কি জানি কিসে মঙ্গল? সেই ভূমা মহানের মহীয়ান্ মহিমার ভিতর, তাঁর আনন্দ-লীলার ভিতর, প্রতি প্রাণের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। আবার সেই ইচ্ছামঙ্গলের ভিতরই আমার স্তব্ধ আবেশ, অনন্ত সমাধির আয়োজন। ওগো কে আমায় জাগায়? কেন আমায় মরণ-দোলায় দুলাইয়া দুলাইয়া ঘুম-ভাঙ্গানো দেশে লইয়া যায়? কে আমার কর্ম্মক্লান্ত তনুকে সন্ধ্যার শান্ত স্নিগ্ধ নিবিড় অঞ্চলতলে চিরবিরামময় আশ্রয় দান করে? কার অজানা মুগ্ধ গোপন হস্ত আমায় শান্ত আনন্দ-কোলে স্থান দেয়? কে তুমি দীন অহঙ্কারী মানুষ, তোমার ব্যর্থ বিচারের মানদণ্ডে সব তুলনা করিবে? ওগো তোমার বিচারের মাহাত্ম্য কতটুকু? সীমার ভিতরই যে তোমার আনাগোনা। সীমার বুকে বিচারের মাহাত্ম্য কোথায়? ক্লান্ত তপ্ত অনুতপ্ত মানুষ পুণ্যধারায় স্নিগ্ধ হইয়া দেবত্বের মহিমা লাভ করে। কিন্তু কই মানবের অপরাজিত ঔদার্য্য তাহাকে বুকের ঘরে টানিয়া লয়? কেবলই ভুল বোঝার দ্বন্দ্ব, কেবলই অপ্রেম, তীব্র শাসন! ঐ দেখ পাপী, তোমার জন্য অনন্ত নরক। কোথায় বেদনাভরা সহানুভূতি? কোথায় সবাইকে সে স্নিগ্ধ প্রেমগৌরবদান? তবে আর কেন অনুতাপের কথা মরণ-ক্ষণে! সমগ্র জীবন হেলাফেলা,

এখন মরণ-মুহূর্ত্তে অনুতাপের কথা! এই কি মানবের চির সমাধান? যদি দেবত্বের অধিকার হইয়াছে, তবে সংগ্রাম-সাজে সাজিয়া সাজিয়াই প্রবল প্রতিকূল ঝঞ্ঝার ভিতরই, আনন্দময়ের আনন্দ-পরিচয়পত্র বহন করিতেই হইবে।

যখন শক্তি সামর্থ্য, তখন আমার ব্যর্থ আস্ফালন। আর ক্লান্ত পরিশ্রান্ত যখন দেহ মন, কেমন করিয়া তখন ব্যর্থ বোঝা বহন করি? তাই তখনি কেবলই মৃত্যুভয়। যেদিন মরণবাঁশি বাজিয়া উঠিবে, গাইবে কেমন করিয়া, 'মরণরূপে এসেছ প্রভু, চরণ ধরি' মরিব হে?' শুদ্ধতার ভিতরই মৃত্যুর আনন্দ পরিচয়। তাই আশৈশব পবিত্রতার ভিতরই মৃত্যুর আনন্দ অনুভূতি। তাই আশৈশব শুদ্ধতার মন্ত্রে জাগিতে হইবে। তাইত মৃত্যুর মঙ্গল আলোকে গৃহে গৃহে শান্ত শুদ্ধ সমাধি! তাইত ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু-মাঝে অমৃত হইবার পিপাসা।

ওগো আর ত পারি না সংগ্রাম-সাজে সাজিতে। আর ত চলে না আমার জীর্ণ তরী! নিত্য-তরী কবে আসিবে? আর ত পারি না নিন্দা গ্লানির তীব্র দহন সহ্য করিতে! কোথায় আরামময় মৃত্যু? এস ওগো মরণ-সখা, এস নিমেষে চকিতে সকল জ্বালা জুড়াইয়া দাও। ওগো দীন ক্লান্ত যাত্রি! কেন এ অভিযোগ? কেন এ ব্যর্থ কপট ক্রন্দন? এ অভিযোগের নিবৃত্তি কোথায়? ব্যক্তিত্বের মহিমা তবে

কোথায়? এই জ্ঞানময় লীলাযজ্ঞে ব্যথিত ক্লিষ্ট মানব, তোমার বেদনার দানই যে তোমার জয়পত্র। কেমন করিয়া, ইচ্ছা করিয়া মৃত্যুর আবাহন-গান গাহিবে বল? এমন সাধের জীবন-বীণাখানি তোমার, বাজাও বিচিত্র আনন্দে বেদন-গান। কেমন করিয়া থামিয়া যাইবে সব কে জানে? এত শোক, এত তাপ, তবুও ত চলিয়াছেন সব যাত্রীই সে মহাযাত্রার আয়োজনে। কে চাহে শ্মশানের অগ্নিলীলা দেখিতে! ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাযজ্ঞেই আমার সমস্ত দুঃখবেদনার আহুতি নিবেদন করিয়াই জাগরণ-প্রতীক্ষা। জানি, তুমি মঙ্গলময়।

এই প্রাণময়ী ইচ্ছালীলার ভিতরই জীবাত্মার মঙ্গল মাধুর্য্য। কোথায় আমার মৃত্যু? আমার স্রষ্টা পাতা জীবন মরণের ভাগ্য-বিধাতা প্রাণময় সম্বল; ঐ অভয় চরণ বুকে ধরিয়াই আনন্দে ভবপারাবারে পার হইয়া যাব। কোথায় ভয়? মানবতারণ ঐ নাম জপ করিয়াই যে "মা ভৈঃ" বাণী বাজিয়া উঠিয়াছে।

কোথায় আমার মরণ-সখা এস! এস আজ জরাব্যাধির কঠোর নিষ্পেষণের ভিতরে, এস আমার ব্যর্থ মোহ-সংগ্রামে, এস আমার আনন্দলীলায় জয়-দুন্দুভিতালে, বিজয়-গৌরব-দানে, এস আমার অভয় নিদ্রা! ভয় কোথায়?

কেমন করিয়া মহানিদ্রার আয়োজন হবে? জানি কি বিচিত্রময়ী নিদ্রার বিচিত্র সত্তা? জানি কি মরণকাঠি কেমন করিয়া আনন্দে জাগাইয়া দিবে? সে কি হিমস্পর্শ! আঃ শীতল হইয়া যাইল সব, সব জ্বালা জুড়াইল, সকল দাহন নিমেষে স্নিগ্ধ শীতলতা লাভ করিল! ও কেমনতর মায়ের কোলে শিশুর নিত্য নির্ভয়ে বিশ্রামানন্দ!

আমার অস্তিত্বের লয় কোথা? কোথায় সে সন্দেহ-কুহেলী! নীরব সখার নীরব জয়-গান বিজয়গাথা শুনাইয়া যাইতেছে। সোণার দেশের খবর আসিয়াছে, মঙ্গল-ইচ্ছা বিশ্বাস ও আনন্দ-আলোকে জাগাইয়া দিতেছে। তাই ত মৃত্যু-মাঝে অমৃতধাম। সে কি মঙ্গল প্রভাত! এ কি অনুভূতি! পরমাত্মার আনন্দময় বুকে আমার অভয় আশ্রয়, আমার ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা। কোথায় আমার বিনাশ, কোথায় আমার বেদনদাহন?

অনন্তের পূজারিপূজারিণি! মঙ্গল-চন্দনলেখা তোমাদের কপালে, অমৃতের ছাপ, তবে মৃত্যুভয় কেন? ব্যর্থ মর্ম্মান্তিক পীড়নে ক্ষুব্ধ হই, তাই দেবত্বের মহিমা ভুলিয়া যাই। কেন এ জীবন-সংহারী মৃত্যুবিভীষিকা? তাইত অবসাদ, অথচ নিমেষে মৃত্যু-যবনিকা উধাও হইয়া যাইবে, কেমন করিয়া কে জানে? অমৃতের সন্তানের কেন এ মহাসন্তাপ?

আনন্দে তরী বাহিয়া যাই। আনন্দ আমার এস। আনন্দে তোমাতেই নিত্য প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

এসেছ মৃত্যু তোমার যোগসুন্দর স্বরূপে। ভয় কি তবে জীবাত্মার? প্রাণময় আত্মার মৃত্যুসাগরপারে ধন্য অক্ষয় জাগরণ। আমি ত অভয়চরণতরী লক্ষ্য করিয়া আনন্দে চলিয়াছি গান গাহিয়া। ঐ বুঝি মরণ-বাঁশি বাজিয়া উঠিল— যে কাজ সাধিতে আসা সাধিয়া চল, দিনের আয়োজন নিষ্ঠার আনন্দে ভরিয়ে তোল! কল্যাণের ভিতর অনন্ত প্রতিষ্ঠালাভ হইবে। কর্ত্তব্য নিষ্ঠা সব দেনা পাওনা চুকাইয়া দিয়া চলি। এম্‌নি করিয়া রূপের খেলা খেলিতে খেলিতেই অগ্রসর হইয়া যাইব। মৃত্যুভয় কোথায়?

গৃহী তোমার গৃহকুঞ্জ আনন্দ-গানে ভরিয়ে তোল। ভক্তি প্রীতি শান্তি পুষ্পে থরে থরে পুণ্য আমোদগন্ধে সব আমোদিত কর। ঘৃণা হিংসা দ্বেষ কোথায়? কোথায় ঐহিকতা দৈহিকতা? বিশ্ব-প্রাণেই আনন্দ-প্রণতি। কোথায় দৈন্য, কোথায় ভয়? জীবন-বীণা যে অভয় গানে রণিত হইয়া উঠিয়াছে। মহাপ্রাণেই প্রাণলীলা। কিসের দৈন্য বেদনার লাঞ্ছনার দান? অন্তর্য্যামী ভবতাপহরণ জানেন আশৈশব সংগ্রাম, জানেন কেমন করিয়া ছুটি পাপ হইতে পুণ্যে, সীমা হইতে অসীমে, রূপ হইতে অরূপে। উত্থান-

পতনের ভিতরেই, ধূলা কাদা মাখিয়াই, চলিয়াছি মায়ের ঘরে, মায়ের বুকে। কোথায় আমার লজ্জা ভয়, সঙ্কোচ দ্বিধা ? চাই যে ভক্তপ্রাণের প্রাণময় নির্ভর, বরাভয়-শান্ত আশ্রয়।

আসুক সে প্রেমোৎসর্গ। এস আমার অরূপরতন সবাইকে লইয়া, নিমেষে সকল জটিল তর্ক ও প্রেম-সাগরে ডুবাইয়া দাও। ঐ যে শান্তিময়ী প্রাণময়ী মহানিদ্রা। এস আমার শান্তিসুধা। কোথায় কুহেলী স্বপ্নঘোর! বন্ধন-মুক্তির বেদন-গানেই মৃত্যুযবনিকার অন্তরালে শান্ত শুদ্ধ ধাম। বিশ্বকল্যাণেই সমস্ত বিকসিত, বিশ্বকল্যাণেই মহাযাত্রা। চিরকল্যাণময়, তোমারই জয়গানে আনন্দে বিশ্রাম।

(২)

মৃত্যু বিভীষিকা

(ক)

কঠিন ব্যথা নিবিড় রাগে
রঙিয়ে দেবে যবে,
দুঃখ-নিশা ফুরিয়ে যাবে,
পার হব গো তবে।
শোণিত ঝরে বক্ষ চিরি'
বেদন-রাঙা বুকে,
কাঁটার মালা পরিয়ে দিল,
সকল গেল চুকে।
কাহার পানে চায় গো আঁখি,
আশার আলো-ধামে ;
বৃথাই কি গো কাঁদন-পালা
বক্ষ-পুরে নামে ?
শোন্ রে বাছা, ফুরিয়ে যাবে
এবার দুখ-গান,

স্বরগ হোতে ধরার বুকে
নামে দুখের বাণ।
বেশ হ'য়েছে তোমার খেলা,
সইতে হবে তাই;
কোন্ নিমেষে জাগায় বল,
সাধন্-পুরে ধাই।
তার পরেতে অশ্রু-মাণিক
পড়্‌বে বুকে ঝরি'
রোগ শোকের দ্বন্দ্ব মরি
নেবে সকল হরি'।
ভুল বোঝার পালা আমার
উধাও হোল ভবে,
তাইত মোর বুক ভরেছে
মোহন বীণা-রবে।
মরণ মাঝে তাইত সখা,
শরণ-সুখ জাগে,
তাইত হিয়া দিনযামিনী
মোক্ষ-সুধা মাগে।

আশৈশব জীবন-ইতিহাসে শত শত দুঃখ বেদনার লীলা যদি নয়নপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, কে চাহিত এ ব্যর্থ

জীবন-ভার বহন করিতে? জীবনযাত্রার আদিতেও যে ইচ্ছা, অন্তেও সেই ইচ্ছা। কোন্ অজানা অন্ধকার রহস্য-পারাবার হইতে অরুণ-আলোকে জাগিয়া উঠিলাম, অনাদিকাল-বিকসিত আনন্দময় ধরণীর বুকে? আবার চলিতেছি কোন্ তমসা-যামিনীর অন্ধ যবনিকা তুলিয়া কোন্ নবীন আলোকে জাগিতে, কে জানে? কোথায় আদি, কোথায় অন্ত!

কেমন করিয়া কাল-স্রোত চলিতেছে অনন্ত সিন্ধুপানে! সাধের জীবন-প্রভাতে কত পুষ্পদল সৌরভে আর সুগন্ধে ভরিয়া উঠিল! নিমেষে কোথায় গেল সব? কোন্ গোপন রহস্যের ভিতর চলিয়াছে অনন্ত পানে? এই যে আমার সাধের বাগান হাসিয়া উঠিল! আবার রবিকর-তাপে কেমন করিয়া ঝরিয়া পড়িল! কোথায় আমার সুশীতল শান্ত বিরামকুঞ্জ? কোথায় আমার আনন্দ-নিবিড় ছায়াতল? ওগো চাই যে বিশ্রাম, চাই যে শান্তি, আরাম! কোথায় মধ্যাহ্নের রুদ্র তেজোময় স্বরূপ! এ কি সন্ধ্যাপানে প্রকৃতির বুকে শান্ত সুশীতল অঞ্চল-ছায়া? এবার ঐ ছায়াতলে তবে বিরাম লাভ করি। কিন্তু কই আমার নিত্য বিরাম? কোন্ অব্যক্ত আহ্বান আমায় ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে? যত কিছু সাধের ধন প্রাণের নিবিড় বেষ্টনে ধরিয়া রাখিতে চাই, কিন্তু সব যে চলিয়া যায় বিচিত্র রহস্য-পুরে! কোথায় সান্ধ্য স্নিগ্ধ আলো? ও কি

নিবিড় অন্ধকার ! কোথায় জগতের বিচিত্র আলোকমহিমা ? স্তব্ধ হইল রূপের খেলা, হইয়া গেল চিরন্তন বিদায়। এখন ঐ তমসা-কুহেলীর ভিতর কোন্ বিস্মৃতিতলে ছুটিব কে জানে ?

এ কি অদৃষ্টের পরিহাস ! প্রতি দিন তিমিরযামিনীর শান্ত ছায়াতলে ত নির্ভয়ে আনন্দে ঘুমাইয়া পড়ি। আর রূপের পারে ও কোন্ তিমির রজনী ? এত ভয় কেন ? এই যে বিচিত্র লোকের নিত্য পরিবর্ত্তন, এ কার লীলা ? সবই যে একই মহামঙ্গলমহিমায় মহিমান্বিত !

তবে মৃত্যু কি ? এ কি কেবল দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠা আর নিবিয়া যাওয়া ? এ কি স্বপ্ন-কুহকলীলার ভিতরই বিস্মৃতির পরিণাম ? এ কি তবে আনন্দময়ী বসুন্ধরার বুকে ক্ষণিক প্রকাশে স্বপ্ন-কুহেলী রচনা করি ? মৃত্যু-সাগরপারে ও কি সত্তা ? মরণধর্ম্মশীল মানুষ কেমন করিয়া এ জটিল কুহকজাল ভেদ করিবে ? জন্মান্ধ কেমন করিয়া মধুর প্রভাতের অরুণ-আলোকে হাসিয়া উঠিবে ? বসন্তের আনন্দোৎসব কেমন করিয়া প্রত্যক্ষ করিবে ? কে জানে মরণ-দোলায় আমায় কেমন করিয়া ঘুম-ভাঙ্গানো দেশে জাগাইয়া তুলিবে ? অজানা ভবিষ্যতের অজানা রহস্যেই ছুটিয়াছি সত্য। তবে কেন ভয় ? কত রূপের দেশে ব্যর্থ বোঝা বহন করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ মন, পরিশ্রান্ত তনু ! মৃত্য-ভয় কেন ?

কে তুমি অমৃতময়, আমায় বিনষ্ট হইতে দিবে না? তাই এত নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা বুকে জাগাইয়া রাখিয়াছ? আমি বাঁচিতে চাই; এমনি করিয়া জীবনের মায়া দান করিয়াছ কেন বল ত? কেন এ চমক-শিহরণ? তাহা না হইলে যে লীলা হয় না; তাহা না হইলে যে মানুষ ব্যর্থ বেদনার ভার ফেলিয়া রাখিয়া ছুটিয়া যাইত! কে শ্মশানের মহা হা-হুতাশের ভিতর কুসুম-কানন রচনা করিতে চাহিত? কে চাহিত সংগ্রাম-সাজ? কে চাহিত রক্তাক্ত চরণে ছুটিতে? এ কি ঐন্দ্রজালিক মায়াজাল! নিরাশার কালো মেঘের ভিতরই আশার আলো জ্বালিয়ে তুলিতেছে! এ কি মমতার নিবিড় প্রাণময় কল্যাণ-বন্ধনডোর! তাইত মৃত্যুর মধ্যেই জাগরণ-উদ্বোধন।

এই আকুল মমতা-বন্ধনই কি অনন্ত জীবনের পরিচয়পত্র দান করিবে? পরম পূর্ণ মঙ্গলের ভিতরই কি এই অক্ষয় জীবন? এই মায়াজালেই কি গতিশীল ধর্ম্মে আমার অনন্ত স্থিতিধর্ম্মের প্রাণময়ী সাধনা, অনন্ত যাত্রার উদ্বোধন?

এই সরল সহজ মমতা-বন্ধন, এ কোন্ অমৃতধামের পরিচয় দান করিল? ভীম অরণ্যে বাস করে অসভ্য; তবুও ত সে বুকের ঘরে মমতার সুরে মৃত্যু-যবনিকার অন্তরালে নিত্য-লোকের ছবি দর্শন করিতেছে! এ কি

মমতার বন্ধনে আমার সুদৃঢ় মোহজঞ্জালজাল! আমি কি পরম কল্যাণ শান্তস্বরূপের শান্ত সত্তা ভুলিয়া যাইলাম? ইহার নামই কি আসক্তি-রূপের খেলায়? এ কি আমায় বাঁধিয়া রাখিবে রূপের দেশে? এ কি আমায় ভীতি-মোহ রচনা করিয়া কল্পনার ঘোরে ভুলাইয়া রাখিবে? হায়! হায়! এ কি অন্ধ ভয়ভীতির করুণ মর্ম্মন্তুদ পরিহাস!

ওগো আমার মরণসখার এত কালো রং কেন? কেন এ অজানা গোপনরহস্যের ভিতর কালো মেঘ জমিয়া উঠে, আর আমায় ভয়ে আকুল করিয়া তুলে? মরণসখা, কেন তোমার এ ভ্রূকুটিভঙ্গিমা? কেন এ অট্টহাসির তাণ্ডব তাল? কেন এ দীন মানুষের বেদন-গানে এ ব্যর্থ করুণ অভিনয়?

ওগো মৃত্যুর ভিতরই যে সখার প্রাণময় স্বরূপ দেখিতে চাই। এই জাগিতে জাগিতেই, রূপের খেলা খেলিতে খেলিতেই, কেমন করিয়া স্বপ্নলোকে নিমেষে অরূপ হইয়া যাই! এ কেমনতর এপার থেকে ওপারে তরণী বাওয়া? ও কি মহাযাত্রার গান! এ কি অনন্ত পথের যাত্রীর আনন্দধামের বিচিত্র বর্ণন? ও কি রূপ থেকে অরূপে যাওয়া? এই থামিয়া গেল রক্ততাল, থামিয়া গেল ধমনীর আনন্দ নৃত্য, স্তব্ধ হইল সুরের পালা। ওগো যাই যাই,

জীবনদেবতার কাছে যাই। তোমরাও যে সেই মঙ্গল অস্তিত্বেই প্রতিষ্ঠিত! কোথায় ভীতি-কুহকজাল? কোথায় মৃত্যু? দেবতার বুকে অমৃতে প্রয়াণ। কোথায় তবে মৃত্যু-মহিমার কালো রূপ? এ কি আমার মৃত্যুমধুর মঙ্গলসখার হিমশীতল পুলকস্পর্শ? নিমেষে সব জ্বালা জুড়াইয়া গেল! ও কি এবার শান্ত নির্ভরশীলতা, আর আনন্দে আনন্দ বিরাম?

ওগো এই কি আমার বুকের ধনদের প্রাণহীন বুকে মরণসখার স্বরূপ পরিচয়? এই কি নিস্পন্দ হিমতনুর কঠোর পরিণাম! ঐ প্রাণহীন বুকে কোথায় সেই প্রাণভরা প্রীতি, প্রাণগলা সহানুভূতি, প্রেমে মাখা মাখা নিবিড় বন্ধন? এ কি তবে প্রতারণার রঙ্গভূমি? এ কি শিহরণ! এই কি আমার প্রেমাস্পদের চরম পরিণতি? উঃ আমার বুক যে নয়নজলে ভাসে! কোথায় আমার সব? ওগো এ কি সব স্বপ্নজাল? আমার প্রাণের পুতলির এই কি সত্তা? কোথায় সে বুকজুড়ানো ভালবাসা? কোথায় সে করুণ আকুল চাহনি? কোথায় পিতার বরাভয় আশ্রয়? এ কি সব তবে ধূলি আর ছাই? ও কোন্ অজানা ভাগ্যবিধাতার আনন্দ-আহ্বানে ছুটিয়াছেন সকলে আনন্দলোকে? কার সাধ্য বাধা দেয়! এই রূপের ভস্মমুষ্টির ভিতরই কি সব শেষ? না, রূপের পারে অমর আত্মার নিত্য বাসস্থান?

মৃত্যুর কালো ছায়ায় কত জটিল কুহেলী রচনা করি! সসীম লীলায় কত ভয়ের কাহিনী! জীবনের প্রতি ক্ষণিক মায়ায় কি এই ভীতিমোহ? কোথায় মৃত্যুর স্বরূপ? রূপের দেশেই আমার আত্মকুসুম প্রস্ফুটিত হইবে। জরাগ্রস্ত তনুখানির যে দিন সকল বিকাশ শেষ হইয়া যাইবে, ওগো তখনই কি আমার নিত্যলোকে নিত্য প্রতিষ্ঠা হইবে?

সত্যই কি কেবল মায়াময় সংসার? তবে অমৃতের পুত্রের কেন অমৃতে আহ্বান? তবে কেন জগতের বিচিত্র ভোগের ভিতর এ ত্যাগের দীক্ষাদান? তবে কেন স্বদেশ-*প্রেমিক প্রাণগুলির এমনিতর আহুতিদান দেশে দেশে?* তবে কেন শত শত ব্রহ্মসেনার ব্রহ্মযজ্ঞে প্রাণময় জীবনদান? সত্যম্ সত্যম্,—সত্যে প্রতিষ্ঠিত জীবন চাই। ধর্ম্মের জন্য, সত্যের জন্য, বিশ্বকল্যাণের জন্য, কত প্রাণের প্রাণময় আত্মোৎসর্গ! কই বিফল সাংসারিকতায় সে প্রাণপ্রতিষ্ঠা? স্বর্ণাক্ষরে সকল ইতিহাস আজও সে সত্য ত্যাগের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। প্রকৃত সত্যধর্ম্ম বিশ্বজয়ী প্রেমের ভিতরই সার্থক জীবন। কই সাংসারিকতা দৈহিকতার ভিতর শাশ্বত আরাম? কেবলই অতৃপ্তি, কেবলই লালসা! ঐ ত লীলা সাঙ্গ হইয়া গেল! তবুও কেমন করিয়া স্মৃতির সুধাগন্ধে আমার অক্ষয় গৌরব দান?

এ কি মায়া তবে? সোণার সংসারে কত আলো জ্বলে, কত চাঁদের হাট হাসিতেছে! সব ফেলিয়া কি আমায় যাইতে হইবে? ওগো কেমন করিয়া সন্তানদের অসহায় করিয়া যাইব? কে তুমি শোকবিহ্বলা জননি! কেন তোমার এ ভাবনার মোহ বল ত? কে রক্ষা করিয়াছিল জননীজঠরে? কে বন্ধনমুক্তির ভিতর বসুন্ধরার বুকে এত আয়োজন করিয়াছে? পরমমঙ্গলদাতা অনাথের নাথ, তাঁরই শাশ্বত দৃষ্টির ভিতর সকল প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মঙ্গল আহ্বানেই ছুটিয়া চল সে অমৃতধামে।

মৃত্যু-বিভীষিকা কেন? এখনও যে দীন মানবের গৃহে অমৃতের আলো জ্বলিয়া উঠিল না, এখনও যে প্রাণময় নির্ভর-শীলতা হইল না! তাই ত এত ভীতি-জঞ্জাল জমিয়া উঠিতেছে। যদি জানি সত্যে আছি, যদি জানি ভক্ত প্রাণের সত্য নির্ভর-মহিমা, যদি জানি শুদ্ধ মুক্ত আত্মস্বরূপ, যদি জানি উদার ত্যাগের আদর্শ, যদি জানি অনন্ত ক্ষমার মঙ্গল-মাহাত্ম্য, যদি বিবেকের শান্ত আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠি, তবে ভয় কোথায়?

ভক্ত-প্রাণের এ কি প্রাণময় ত্যাগ! এ কি শান্ত নির্ভরপরতা! এ কি অনন্ত নির্ভয় প্রাণ, অনন্তে তরণী বাওয়া, ব্রহ্মসাধনা, সকল বিক্ষোভের ভিতর সাম্য শান্তস্বরূপ!

মরণবন্ধুর মোহন বাঁশির সুরে এ কি আকুল পুলক জাগরণ! এ কি কল্যাণদান! মৃত্যুর ভিতরই অমৃতধাম।

ইন্দ্রিয় লইয়া অভ্যস্ত রূপের দেশে, মরণ-দেবতার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে কোথায় আমার ইন্দ্রিয়-লীলা? কোথায় আমার রূপ রস গন্ধময় ভোগের আয়োজন? কোথায় আমার ধন ঐশ্বর্য্যের গরিমা? কোথায় প্রশংসার জয়ধ্বনি? মরণ-সখার এ কি দীনতার বেশ? ওগো কোথায় যাইবে যাত্রী অতীন্দ্রিয় লোকে?

ওগো আমার সত্য সখা শান্ত মধু পরাণ বঁধু! কোথায় আমি হাত বাড়াইব বল? ঐ যে আমার রূপের লীলা শেষ হইল! এখন কোথায় জাগি বল। জীবন মরণ যদি তোমরই লীলা, তবে তোমারই ভিতর চির সার্থকতা দান কর। ওগো তুমি কি আমায় বিনাশ করিবে বলিয়া তবে এ জীবন দান করিলে? ওগো আমার জীবন-লীলা যে তোমারই বিচিত্র মুগ্ধ প্রকাশ! ওগো ধূলার ভিতরই, বিচিত্র সাধনার ভিতরই, যে আমার আত্মপ্রকাশ! ওগো অনন্ত সকল কারণের কারণ! তোমাতেই জন্ম স্থিতি গতি, তোমাতেই আমার জীবন মধুময়, তোমাতেই আমার সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম গৌরবান্বিত হউক্। যখন খেলা শেষ হইয়া যাইবে, ওগো তুমি যে অমৃতময়, আমায় তোমারই বুকে স্থান দেও।

আমি কেমন করিয়া বলি আমার সব তোমারই নামে তোমাতেই সঁপিয়া দিয়াছি, সকল দুঃখ বেদনার ভিতরই ওগো আমি তোমারই ? তুমি আমার জন্য কি রাখিয়াছ তুমি জান।

আমায় মৃত্যুরূপে তুমি কি বিষপান করাইবে ? আমি কি বিষে জর্জ্জরিত হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিব ? কে আমার সঙ্গে যাইবে বল। তুমি আমার, আমি তোমার। অনন্ত জীবনপথে তুমি আমার চির সঙ্গী, চির সহায়। এ কি গভীর নিদ্রা ? তাহা ত নয়, এ যে জীবনকাহিনীর প্রাণধারা, এ যে বিচিত্র-লোকে নবজন্মলাভ, এ যে তোমারই বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া।

ওগো সখা, জানি, তুমি মঙ্গলময়! তাই প্রাণপ্রিয়ের প্রাণহীন বুকেই অশ্রুজলে স্তব্ধ হইয়া নত হইয়া থাকিতে চাই। তুমি জান আমার গোপন কাহিনী, তুমি জান জননীর ব্যথা। জান অন্তর্য্যামী কেমন করিয়া প্রাণপুতলির প্রাণহীন বুকে অভাগিনী জননী লুটাইয়া পড়েন। তুমি জান কেমন করিয়া অন্ধের আলো গৌরবের ধন ধূলিমুষ্টিতে পরিণত হয়। ওগো পরমাত্মন্ এস এ বেদনক্লান্ত চিত্তে, এস আমার অন্তরতর অন্তরতম অন্তরনিভৃতে। এস দুর্ব্বলের বল, এ মরণধর্ম্মশীল মানবের ব্যর্থ বিলাপে। সে কেমনতর স্বর্গলোকে দেববালাগণের অমৃতময়ী সঙ্গীতলহরী-লীলা ?

ওগো তাহাই হউক, তোমারই জয় হউক। আমার প্রিয়-

ধনের মহাযাত্রায় আমার যাত্রা মধুময় হউক, অনন্ত মিলন-উদ্বোধন জাগিয়া উঠুক। ভক্তপ্রাণের মাভৈঃ বাণী অনন্ত মিলন-গান শুনাইতেছে। জানি না সে কেমনতর মিলনধাম। ইচ্ছাময়, তোমারই ইচ্ছার জয় হউক। শান্তি শান্তি শান্তি !

(২)

(খ)

ফেলে দাও গো, খুলে ফেল গো
মৃত্যু মলিন সাজ,
মরণ মাঝে বুকের ঘরে
হাসে হৃদয়রাজ।
ধূলির দেহ ধূলায় যাবে
দুঃখ নিশা ভোর,
নিবিড় ব্যথা উধাও কোথা
মরণমোহ ঘোর।
ঝর্ ঝর্ ঝর্ অশ্রুধারা
ফুরিয়ে গেল তবে,
ধূলার মাঝে ধূলির লীলা
মেশামেশি যবে।

মরণরূপে আস্‌লে·কেন
শান্তি-কলস ভ'রে,
জুড়িয়ে গেল ঐ পরশে
সুধা-গঙ্গা ঝরে।
রক্ত তালে বাজ্‌লো যবে
শেষ গানটী মরি,
স্বরগ হ'তে ব্রহ্মবালা
বাঁধে নিবিড় করি।
সমাধিপুর অন্ধকার—
জ্বল্‌ল তবু আলো,
মুক্ত পাখী চিদাকাশে
ঘুচ্‌ল সকল কালো।
একি তোমার ধূলি-খেলায়
নিত্য সুখ-মেলা,
উথ্‌লে ওঠে হৃদি-সিন্ধু
ধন্য পিতার খেলা।
নামে যদি বেদনধারা
সকল উজাড় করি,
ধন্য আমি গাইব তবু
বিশ্ব ভুবন ভরি।

থামেও যদি ঐ সুরেতে
হাসি কান্নার গান,
তবুও সখা, গাইব আমি
ধন্য তব দান।

আর ত পারি না মহাযাত্রার স্বরূপ দর্শন করিতে ; আর ত এ বিরহ-বেদনা সহ্য হয় না, ঠাকুর, দুর্ব্বল ব্যথিত বক্ষে। তবুও ত কাতর বিহ্বল হইয়াও ছুটিতে হইবে মরণসিন্ধু পারে। এ কি লীলা ! এ কি ফুটন্ত ফুলের স্তব্ধ মুদিত আঁখি। ও কি ক্লান্ত বৃদ্ধের মহাযাত্রা ! এ কি সুকুমারী কল্যাণীর ভস্ম-মুষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তরুণ যুবকের সকল আশা উৎসাহের বলিদান ! হায় ! হায় ! এম্‌নি করিয়াই ত আমার দেহও এক দিন ভস্মমুষ্টিতে পরিণত হইবে।

কেন তবে এ রূপের খেলা ? জন্মমৃত্যু আমার ইচ্ছা-তন্ত্রের ভিতর ত নিয়মিত নয়। এস আমার মরণসখা, এস তোমার মধুর মোহন সাজে। প্রাণনাথ ! এ কি অব্যক্ত বেদনা ! কোথায় আমার জীবনদয়িতের প্রাণময় সঙ্গ কঠোর বন্ধুর পথে ? এ কি অনাথ সন্তানের আকুল বিলাপ ! উঃ, কাঙ্গালিনী জননীর একমাত্র বুকের ধন কোথায় ! এ কি অদৃষ্টের পরিহাস ?

কেন এ বিরহ-গান জগতে ? মৃত্যুর অন্ধকার ? কোথায়

সকলে জাগিয়া আছেন ? যখন রজনীর শান্ত ছায়াতলে সকলে নিদ্রিত, কই তখন ত বিলাপের গান গাই না ! অথচ সুগভীর মহানিদ্রার অলস মুদিত নয়নে কেন এ চমক-শিহরণ ? ওগো এ যে সত্য, নব প্রভাতের নব আলোকে যে সব হাসিয়া উঠিব, আবার মিলন-লীলা জাগিয়া উঠিবে। মৃত্যুর অন্ধকারে কই সে জাগরণের আশ্বাসবাণী ? মর্ম্ম গৃহে এ কে আলো জ্বালাইল ? আমি যে নয়নের জলেই আশার মালা গাঁথিয়া চলিয়াছি। কে জানে কেমন করিয়া নব অরুণ-আলোকে আবার মিলনানন্দে জাগিয়া উঠিব। ঐ যে সকলে সখার বুকে হাসিতেছেন, আমিও হাসিব, তুমিও হাসিবে। কত দিনের জন্য এ খেলা ? অশীতিবৎসর বৃদ্ধ কি কথা বলেন শোন, এই যে সেদ্দিনকার খেলা চকিতে অবসান। কত কাল অপেক্ষা করিতে হইবে কে জানে ? তাই কি এ বিলাপ-ক্রন্দন ?

না গো না, মৃত্যুর কালো রূপ দেখিব না, তার বিরহ স্বরূপ ভুলিয়া যাইব। সন্ধ্যাবিদায়ের গান যেমন নির্ভয়েই গাহিয়া যাই, তেমনি করিয়াই মহাযাত্রার বিদায়গান গাহিয়া যাইব। তেম্‌নি করিয়াই মরণজয়ী মৃত্যু-মহিমা দর্শন করিব। অমৃতধামের যাত্রীকে মহা আনন্দের বাণী শুনাইয়া উৎসাহিত করিয়া তুলিতে হইবে। যাও, মহোৎসবের

আনন্দ-নিমন্ত্রণ হইয়াছে, যাও। আমিও তোমারই মত অভয়-পদ বুকে করিয়া আনন্দে ভবপারাবার পার হইয়া যাইব।

মহাপ্রস্থানের গানে যে আমার প্রিয়ের প্রাণহীন হিম-শীতল রূপখানি মনে পড়ে, তাই ত অশ্রুজলে বুক ভাসে। যদি এই মহানিদ্রার ভিতরই নব জীবনের স্বরূপ দেখিতে পাই, তবে কোথায় আমার মৃত্যু-ভয় ?

মরণসখার সংহার-স্বরূপেই যে আমি চমকিয়া উঠি! যদি ভুলিতে পারি সে রুদ্ররূপ, যদি শান্ত প্রসন্ন রাগে সব রঞ্জিত হইয়া উঠে, তবে কোথায় ভয় ? উঃ, এ কি জন্মমৃত্যুর সংগ্রাম দিনরজনী! এ কি রুদ্রস্বরূপ জগতের বুকে! কে জানে সে কেমনতর যাতনার অনুভূতি, কত যাতনার অভিব্যক্তি মুমূর্ষু জনের যাত্রাগানে—কত বিকার বিলাপ, বেদনার অব্যক্ত ক্রন্দন! তবুও ত চাই বুকে ধরিয়া রাখিতে, কত ব্যর্থ আয়োজনে তাদের আকুল করিয়া তুলি! তবুও কেমন আনন্দে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলেন। কোথায় আমার ভয়? ঐ মৃত্যুর স্বরূপে না ঐ মৃত্যুর বিকৃত আয়োজনে? কেমন করিয়া রূপের পারে ছুটিব? কেমন করিয়া অজানা লোকে আমার যাত্রা হইবে? হায়! হায়! এমনিতর কত সংশয়-কুহেলী! এই রূপের দেশে রূপরসগন্ধ ব্যবহারিক

সত্তার ভিতর আমার প্রতিষ্ঠা লাভ করি, আর যাহা নিত্য সত্তা, ধ্রুব সত্তা তাহারই মূল্য বুঝিলাম না।

কখনও বলি ওগো সখা, যদি এ ভবিষ্যৎ কুহেলী আমার কাছে অবারিত উন্মুক্ত থাকিত, তাহা হইলে ত এত সংশয়-বেদনা বহন করিতে হইত না! আবার ভাবি ধন্য! তুমি ধন্য! যদি এ বেদনার চিত্র আমার কাছে প্রকাশিত হইত, তবে কি আমি আনন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতাম?

এ যে অজ্ঞাত রহস্য অজানার বিচিত্র লীলা! কেমন করিয়া নশ্বর জীবনেই মানুষ আনন্দ খেলা খেলিয়া চলিয়াছে, তাহা না হইলে কে চাহিত এ ব্যর্থ বেদন বহন করিতে?

যতক্ষণ অনিশ্চিত ততক্ষণ সংশয়-বেদনা। কিন্তু যখন বাঁশি বাজিল, তখন তার কি বিচিত্র সুর, কি বিচিত্র মাধুর্য্য! তখন অতীতের যত কিছু স্বপ্ন হইয়া গেল, আর অনাগত জীবনরহস্যই এক নবালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অনন্ত পথের যাত্রী সব তখন সকলের সঙ্গে শেষ দেনা পাওনার হিসাব চুকাইয়া লইতে চাহে, তখন বিদায়ের সুরেই তন্ময়তা, তখন আনন্দধামের যাত্রীর আত্মপুরে অতীতের ঘন কুহেলী মোচন করিয়া, জন্ম মরণের সন্ধিস্থলে, এ কি অপূর্ব্ব আকুল আহ্বানে আনন্দে উৎফুল্ল!

প্রশ্ন এই, পারিব কি সবাই আনন্দে মরণসখার চরণ বরণ করিতে? ও কি পাপীর অব্যক্ত যাতনা? হায়! হায়! সংসারকে যে স্থিরভূমি মনে করিল, যে বিশ্ববিধাতার বিজয়লীলা নয়ন মেলিয়া একবার দেখিবার অবসর পাইল না, যাহার সংসারের ধন মান মর্য্যাদা ঐহিকতা দৈহিকতাই সার হইল, যাহার পার্থিব পিপাসা মিটাইতে মিটাইতেই দিন ফুরাইয়া আসিল, অমর আত্মার পুণ্য মাধুরী বোঝা হইল না, তারই কাছে ত মরণক্ষণে ভয়াবহ মৃত্যুর রুদ্র প্রকাশ।

সংসারে ধনীর আজ এ কি বিড়ম্বনা! কোথায় গেল তাঁর বিরাট্ ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য? আজ শিশুর মত অসহায় দীন যাত্রী কেবলই ভাবে কোথায় আমার ক্ষুদ্রে প্রতিষ্ঠা, আর কোথায় আমার আত্মসত্তা! আজ যে ধূলির দেহ ধূলিমুষ্টিতে পরিণত হইবে। আজ যে তাহার তরল ভঙ্গিমা, ব্যর্থ প্রগল্‌ভতা, সকল ভোগের আড়ম্বর, সবই বিফলে অবসান! আজ উপেক্ষিত আত্মসত্তা কেমন করিয়া তিনি উপলব্ধি করিবেন? এ কি অপূর্ব্ব বিচার জগতে!

তবুও শোন, ঐ শোন দীনাত্মার জন্য দেববালার আকুল ক্রন্দন। অনাদিকাল বিকসিত জগতের বুকে যে ঐ বাণীই প্রচারিত হইতেছে—কোথায় মানবের যাইতে হইবে! কখনও মৃদু মধুর স্বরে, কখনও গুরু গম্ভীর নিনাদে, কখনও প্রসন্ন

আলোকে, কখনও রুদ্ররূপে ঐ একই বাণী। ওগো তোমার নয়নে বচনে এত আনন্দ উচ্ছ্বাস কেন? ও যে প্রাণময়ের মঙ্গল অস্তিত্ব লীলা। এ কি রূপ-কথা? এ কি স্বপ্ন? এ কি কুহেলী? আমি আমার অদৃষ্ট রচনা করি। আত্মার বিচিত্র মহিমা কেমন করিয়া উপেক্ষা করিবে আজ মৃত্যুমঙ্গল-বাসরে! আজ কোন্ দৈহিকতার গর্ব্ব আমায় রক্ষা করিবে? আজ দেহের বিনাশে কোথায় আমার প্রতিষ্ঠা?

বর্ত্তমানের আনন্দ প্রকাশেই ভবিষ্যতের মহিমা। রূপের ভিতরেই আত্মসুন্দরের মঙ্গল মাধুর্য্য। যদি শাশ্বত শান্তির ভিখারী হইয়া ছুটি, আত্মস্বরূপ দর্শন করি, তবেই ভক্ত প্রাণের বিমলানন্দ—পরা শান্তি মোক্ষফল লাভ হইবে। ওগো অনন্ত প্রেম যে আমায় রক্ষা করিয়াছে, ঐ প্রেমের কোলেই আছি, ঐ প্রেমেই থাকিব। আমার বিনাশ কোথায়? প্রকৃতির শান্ত বুকে ঐ প্রেমেরই পরিচয়। প্রতিনিয়ত বিশ্ব চরাচর ঐ একই গান গাহিয়া চলিয়াছে—কোথায় বিনাশ, অনন্ত পথের যাত্রী সব, অনন্ত জীবন লাভ হইয়াছে।

তাই ত ভক্ত প্রাণের আনন্দ-প্রয়াণ। দৈহিকতা ঐহিকতার ভিতরই ত্রাসকম্পিত হৃদয়। ভক্তপ্রাণের ওঁ নামে আনন্দে বৈতরণীপারের আনন্দগানে জ্যোতির্ম্ময় পুণ্যসভার পুণ্য কাহিনীই প্রচার হইয়া যাইতেছে।

অমর কথা

আমার সাধের দেহবীণায় আশৈশব কত সুর সাধনা করি! আজ তার ধূলিমুষ্টিতে পরিণাম, অথচ আত্মসুন্দর যেই হাসিয়া উঠিলেন দেহবীণার মধুর ঝঙ্কারে, তখন কোথায় মৃত্যু,—সব যে বিশ্বভুবন আমারই আনন্দ-আলোকে হাসিয়া উঠিল, সব যোগানন্দে ভরপূর।

যুগ যুগান্তর ধরিয়া কত সংগ্রাম লীলা, সাধিতে হইবে রণ জগতের বুকে! তবে কেন ভীতির ব্যর্থ ত্রাস? ওগো এ কি আমার চিরন্তন বিদায়? তা যদি, তবে কেন বুকের ঘরে প্রিয়জনদের মৃত্যুর যবনিকার ভিতরও আনন্দপ্রকাশ? ওগো প্রেম যখন স্পর্শ করিয়াছে, প্রেম-স্মৃতি-সুগন্ধে যখন সব ভরিয়া উঠিয়াছে, তখন তমিস্রারজনীর পরপারে সু-প্রভাতে নব-জ্যোতির্ম্ময় আলোকে বিমলানন্দ জাগিয়া উঠিবেই উঠিবে। প্রেমময় প্রেমের খেলা খেলিতে আসিয়াই ধরা পড়িয়াছেন। তাই ত মৃত্যুমাঝে অমৃত নাম। পরম শুদ্ধ শান্ত নির্ম্মল প্রেম ত ধূলিতে পরিণত হয় না। প্রাণপুরে চেতনা-লোকে প্রেমের এ কি শান্ত স্নিগ্ধ অমৃত স্বরূপ!

ওগো আমার নয়নলোভন প্রিয়সুন্দর, অনন্ত আহ্বানে তবে দাও বিদায়! অন্তিম শয্যায় তোমাদের প্রেমাশ্রুজল, দেখ আমার যাত্রাকে কত মধুময় করিয়াছে। ওগো ও প্রেম ফুরাইবে না। স্বর্গরাজ্য যে প্রেমালোকেই হাসিয়া উঠিয়াছে।

প্রেমের অর্ঘ্য রচনা কর, এপার ওপার এক হইয়া যাইবে। ওগো প্রেম! তবে কেন ব্যর্থ ক্রন্দন? প্রেমের বুকেই অমৃত হাসিয়া উঠিয়াছেন। প্রেমের আনন্দ-আলোকেই শুদ্ধ পুণ্য শান্তি। প্রেমের আনন্দেই পুণ্য গন্ধে আনন্দ-মিলনধামে আমার মিলন রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে।

ওগো আমার বিদেহী প্রিয়, চলিব আমি চলিব, শান্ত শুদ্ধ হইয়া এ বন্ধুর যাত্রা-পথে। ওগো শুদ্ধ শান্ত শিব-সুন্দর! শিবালোকেই আমার সকল সংশয় জটিল জাল উধাও হইয়া যাইবে। সত্যগ্রাহী সত্যের মহিমা ঘোষণা করিতে করিতেই আনন্দে মরণ-সখাকে বরণ করিতেছেন! ধন্য অমর আত্মা—তুচ্ছ দৈহিকতা ঐহিকতা, কেমন হাসি-মুখে ত্যাগ করিয়া ভোগের ভিতরই ত্যাগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন। এ কি বিচিত্র লীলা, সত্যের জন্য সর্ব্বস্ব আহুতি দান। তাইত জগতে পরিত্রাণের সমাচার। চাই সে সত্য-সুন্দরের মহিমা উপলব্ধি করিতে। হউক্ জীবনে সততার সাধনা।

একি জটিল রহস্য? দুদিন দেওয়া ঘেরা ঘরে এত মায়া! কই ভক্তপ্রাণে সে কথা কই? দেহের ঘরে আত্মলোকেই আত্মসুন্দরের পরম সার্থকতা।—নব নব ভাবে কেমন করিয়া অনন্ত উন্নতির পথে জাগিয়া থাকিব কে জানে?

এই যে দেহের ঘরে এত আনন্দ-আয়োজন, এ কার দান? এ ত উপেক্ষার জিনিস নয়। কই দৈহিকতা ঐহিকতার ভিতর সে নিত্য শান্তি সুধা? অবিমিশ্রিত নির্ম্মলানন্দ কোথায় রূপের ক্ষণিক লীলায়?

ওগো দীন দুর্ব্বল মানুষ, মরণত্রাসে এত ত্রস্ত কেন? যেতে ত হবেই, দীর্ঘজীবন লাভ হইলেও ত শেষ করিতে হইবেই এ খেলা। ঐ ত চলিয়াছেন সকলে একে একে। এখন এ নিঃসঙ্গ যাত্রার কোথায় অবসান? ওগো এখনও উদাস আকুল আঁখি মৃত্যুযবনিকা ভেদ করিয়াই ছুটিবে দিন রজনী। জরা মরণাতীত শান্ত জীবনালোকে নিত্যানন্দে সকলের ব্যর্থ জীবনভার একদিন ত অবসিত হবেই হবে।

ওগো আমার প্রেমসুন্দর! পরিত্রাণ দেবে কি? বল তবে কেমন করিয়া শুদ্ধ শান্ত হই; কেমন করিয়া বিশ্বকল্যাণে জাগি? ভয় কোথায়! এ কোন্ নিত্য জাগরণ লীলা! ওগো আনন্দ, এ কেমনতর অমৃত সুধাপান? ওগো প্রেমানন্দ! মরণদোলা আমায় ওকি শান্ত শুদ্ধধামে লইয়া চলিল! একি মরণসখার আনন্দ-আলোকেই যে নব প্রভাতের জয়-উদ্বোধন বাজিয়া উঠিল। একি মিলনসন্ধিক্ষণ।

ওগো আমার অগ্রগামী প্রিয়ধন সব, থাক জেগে স্মৃতির পুণ্য গন্ধে। ঐ গন্ধে আকুল হইয়া ছুটি, প্রতীক্ষা করি। আমি প্রেমের গন্ধে পাগল হইয়াই নিত্যপূজার অর্ঘ্য রচনা করিব। জ্বেলে দাও প্রেমের আগুন—ঐ আগুনে পুড়ে পুড়েই শুদ্ধ হব, সুন্দর হব। কোথায় আমার দ্বন্দ্ব-কুহেলী বল? আমার সকল দৈন্যভার ঐ চরণ-দেউল মূলে উৎসর্গ করিয়াই মৃত্যু মাঝে অমৃতা নাম গাহিয়া চলিব। ওগো প্রেমসুন্দর, তোমারই গৌরবে আমার সকল গৌরব দান কর।

কোন্ নিমেষে পলক-পাতে
ফুরিয়ে যাবে খেলা,
সখার বুকে বিরাম হবে
শান্তিসুখ-মেলা।
সবার মুখে জয়ের গান
তাইত গাই জয়,
তাইত ওগো মরণ সুরে
নাইক কিছু ভয়,
(ওগো) তাইতে যে মোর জয়।
বিশ্ববীণা মরণ গানে
বাজায় কিবা সুর,

তারই রাগে হাসে বুকে
নিত্য আশা-সুর ;
তাইত হোল জয়
(ওগো) তাই যে মোর জয়।

(৩)

ঈশ্বর প্রেমময়

সবাই যদি থামিয়ে দিল
ভালবাসার গান,
ওগো হে প্রেম ! শুন্‌ব তবু
নিত্য তোমার মান।
চাঁদ হাস্‌বে, ফুল ফুট্‌বে,
ঐ গানটী গেয়ে,
তপন তারা সেই সুরেতে
আস্‌ল কি বা ধেয়ে !
প্রেমময়ের গানের ধারা,
রূপের ঘরে কার,

অমর কথা

ধরার বুকে নিত্য লীলা
প্রেম-কুসুমের হার
স্বর্গ ভুবন পাতাল জুড়ে
মৌনী হ'য়ে রই,
উচ্চে নীচে নাইক কথা
প্রেমে মজা বই।
আত্মপুরে পিরীত-লীলা
নিত্য ধূমধাম্
নীরব হ'য়ে রইল জাগি
বিশ্বজয়ী নাম।
করম-লীলা শান্তি-সুধা
ঐ সুরেতেই হাসে,
হাসি কান্না তাইত ওগো
ধরার বুকে ভাসে।
আমি কোথায়, কার দানেতে
আমার লীলা বল,
কোন্ ধারাতে ভাস্‌ল ধরা
প্রেমে ঢল ঢল।
কোন্ চাহনী, নীরব বাণী
কিসের কথা বলে,

বুকের ঘরে, সকল সুরে,

কাহার লীলা চলে ?

ঐ ভাবেতেই ভাবুক আমি

নীরব গানে গানে,

উঠ্‌ল ভ'রে হৃদি-অর্ঘ্য

প্রেমের দানে দানে।

ওগো হে প্রেম ! ঐ সুরেতে

নত হ'য়ে যাই,

প্রেমময়, তোমার কোলে

সবার হোল ঠাঁই।

আমার সুরে তোমার পূজা

হৃদয়-ফুলে ফুলে,

প্রেম-যোগেতে বিশ্বগানে

হাস্‌বে সবে দুলে।

স্বর্গ থেকে জীবন আনে

প্রেমগঙ্গা-জলে,

শিবময়ের শিবগঙ্গা

নাম্‌ল ধরাতলে।

জানি তুমি মঙ্গলময়। সকল শাস্ত্রে, সকল বাক্যে ঐ একই কথা—ওগো তুমি প্রেমময়। তবে কেন ভীত চঞ্চল

মানবের এ ব্যর্থ বেদনা? 'জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে'—তবুও কেন এ অবিশ্বাসের মোহ!

জাতীয় ইতিহাসের ছত্রে ছত্রেই প্রেমময়ের লীলা। কত উত্থান পতন, কত উদয় প্রলয়, কত উৎপত্তি-সংহার-লীলা! ওগো হে প্রেম! এ কেমনতর হইল? সকল ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতরও এ কি বিশ্বকল্যাণ সমস্তকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে! বিশ্বকল্যাণের ভিতর নিত্য সরস পূজার আয়োজন! কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে আকুল বেদনা-ঝঞ্ঝার ভিতর আমি প্রেমের আলো দেখি কই? তাই ত অভিযোগের ব্যর্থ বেদনা বহন করি,—কত দারুণ শিহরণ সহ্য করি! সংহারের ভীষণ দুর্দ্দণ্ড প্রতাপ। ইহাও কি প্রেমের খেলা, ইহাও কি প্রেমময়ের জয়-বিষাণ? প্রাণ চমকিয়া উঠে; কত প্রলয়ঝঞ্ঝা, কত অগ্নিলীলা, কত সংহার-স্বরূপ, কত অরাজকতা, কত অশান্তি, কত সংশয়-দোলা! ইহাও কি প্রেমময়ের বিচিত্র বিধান?

বুকের ঘরে কে যেন গাহিয়া উঠে—না গো, না, এ প্রেমের খেলা নয়। বুকের ঘরে বিভীষিকার স্বরূপ জাগিয়া থাকে! তাই শিশুজ্ঞান এই বিচিত্র জটিল কুহেলী ভেদ করিতে গিয়া আর এক বিরাট্ রুদ্র সংহারস্বরূপকে দেবতার অস্তিত্বদানে পূজা করিতে চাহিল, তবু প্রেমময়কে তাহার নিয়ন্তা বিধাতা বলিয়া পূজা করিতে

পারিল না! ওগো প্রেমের ঠাকুর, তোমায় ভালবাসি, তোমার চরণে নিত্য কৃতজ্ঞতা ও প্রেমের অর্ঘ্য সাজাইয়া লইয়া আসি, আর ভীত ত্রস্ত হইয়া ভয়ে ভয়ে পূজা করি। ভীষণ রুদ্রস্বরূপকে, সংহারকারীকে। ওগো তোমার রুদ্ররূপ সংবরণ কর।

এম্‌নি করিয়া পৃথিবীর বুকে অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্ত্তাকে এক স্বতন্ত্র রূপের ভিতর দিয়া পূজা করিতে চাহিয়াছে শিশুজ্ঞান, তবু প্রেমের ঠাকুর যিনি তাঁহার প্রেমের স্বরূপের ভিতর অপ্রেমের কথা ভাবিতে পারে নাই।

ধীরে ধীরে কেমন সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলময় দেবতার ওতপ্রোত প্রকাশের ভিতর এ দ্বৈত পূজার আয়োজন আপনা হইতে উধাও হইয়া গেল। একমেবাদ্বিতীয়ম্ জন্মমরণের ভাগ্যবিধাতা নিয়ন্তা জগৎপাতার আনন্দ-পূজার আনন্দ-সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল। কিন্তু হায়! কই সংশয়-বেদনায় ব্যথিতচিত্ত ভীতত্রস্ত প্রাণ, সকল শোকে দুঃখে প্রেমের ঠাকুর যিনি তাঁহার চরণে প্রেমের অর্ঘ্য সাজাইতে শিখিল? কত অভিযোগ! কে তুমি মঙ্গলময় ন্যায়বান্ বিধাতা? তোমার জগতে কেন এত হিংসা প্রতিহিংসা? কে তুমি মানবের ক্ষণিক ত্রুটী দুর্ব্বলতার জন্য এ ভীষণ অনন্ত অগ্নিকুণ্ডের আয়োজন কর? কোন্ অপরাধে পিতৃপুরুষের

পাপের বীজাণু আমার জীবনে অনুক্রামিত কর? কেবলই অন্তহীন প্রশ্নের জটিলতা আমাদের তুর্ব্বল বুককে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে।

চিরদিন যেমন মানবের ব্যক্তিগত আদর্শ শিক্ষাদীক্ষা, তেমনই ভাবে তাহার হৃদয়ে দেবতার স্বরূপ যুগে যুগে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যখন ভক্তপ্রাণের প্রাণময় সমাধির ভিতর পরিপূর্ণ শাশ্বত ব্রহ্মজ্ঞান স্থাবর জঙ্গম চরাচর পূর্ণ করিয়া বিকশিত হইয়া উঠিল, তখনও ঐ প্রশ্ন, ঐ একই অভিযোগ—কেন এ ত্রিতাপজ্বালা সংসারে!

যিনি শান্ত শিবস্বরূপ, তাঁহার ভিতর ক্ষুদ্রতা অশান্তি জাগে কেমন করিয়া, এই সংশয়-দোলা সংসারপীড়িত ক্লান্ত প্রাণকে কেবলই দোলায়িত করিয়া তুলিতেছে। সন্দিগ্ধচিত্ত দীন মানবের এ জটিল প্রশ্নের একমাত্র মীমাংসা এই যে, তাহারই স্বকৃত পাপ সকল সর্ব্বনাশের কুহেলী সৃষ্টি করে। যেইদিন হইতে মানুষ দেব-অধিকার পাইল, সেইদিন হইতে তাহার বিবেকের ঘরে ভালমন্দের বিচারের আয়োজন হইল।

দেবলীলার ভিতর বিশ্ব-কল্যাণ। যাহা কিছু অকল্যাণ, যাহা কিছু অসত্য, সত্য নিকেতনে তাহার স্থান নাই। মানুষ যখন সত্যভ্রষ্ট হইল, তখনই তাহার বেদনার জন্ম হইল।

এ বেদনাও মুক্তির আয়োজন করে। তাহার অন্ধকার মলিন চিত্তে সত্যের আলোক জ্বলিয়া উঠিবার সহায় হয়। বিশ্বপাতার কল্যাণ বিধান অনাহত ভাবে জড়ে চেতনে বিধৃত হইয়া আছে। সে অখণ্ড নিয়ম কে খণ্ডন করে ?

অন্ধ বাসনার ক্ষণিক উচ্ছ্বাস-তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া এ কি আমার বুকফাটা বেদনার অনুভূতি! অনন্ত ভূমা মহান্ শান্ত শিবময়ের শান্তলীলা বিশ্বব্যাপী শান্ত সুরেই সমস্ত নিয়ন্ত্রিত। অথচ এ কি অজ্ঞানতার দীন অভিজ্ঞতার ভিতরই মানুষের ভবিষ্যতের কল্যাণ-দৃষ্টি জাগ্রত হইয়া উঠে।

দেবলীলা দেবনিয়ম, সংসারে দেবজ্যোতির অক্ষয় মঙ্গল শুদ্ধতার ভিতর সাধুতার ভক্তি প্রেমে নিত্য নূতন উদ্বোধন গান রণিত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের স্বহস্তে রচিত কত বেদনা দুঃখ যাতনা আবার আমাদের চরম কল্যাণময় নিত্য সত্য পথেই লইয়া চলিতেছে। কোনও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ সত্যপথের নিয়ামক হয় না, যতক্ষণ না নীরব সুরটী সত্যভাবে মানবপ্রকৃতিতে বাজিয়া উঠে।

সত্য, মানুষ মোহদ্বন্দ্বের জটিল বন্ধনের ভিতর কত অশান্তি কুহেলী জমাইয়া তুলিতেছে, আবার সেই অশান্তির ঘন ব্যথার ভিতরই চিরশান্তির পথ ফুটিয়া উঠে! যখন প্রকৃতির বুকে ধ্বংসের বিজয়ভেরী প্রলয়পাথারে মরণসাগরে

ভাসিয়া যায়, অবাক্ হইয়া থাকে মানুষ, ভাবে ইহার ভিতরও ত পরমকল্যাণ প্রকৃতির বুকে নব নব স্বরূপে জাগিয়া উঠে—এই কি প্রেমময়ের প্রেমলীলা !

এই মরণগানে কিসের সুর বাজে ? এ কি বিনাশের কথা বলে ? এ কি আমার জড় রূপখানি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আমার অবিনাশী স্বরূপকেও বিনষ্ট করিবে ? কেমন করিয়া তাহা মনে করি ! মৃত্যুই কি চরম সমাপ্তি ? না, এই মৃত্যুমঙ্গল-বাসরেই আমার মহীয়সী লীলার প্রকৃত জন্মদান ! ব্যাধির ভীষণ প্রকোপে, কি আকস্মিক ঘটনার ফলেই হউক, লক্ষ লক্ষ মানুষ কালের করাল কবলে পতিত হইবেই হইবে। সবই চলিয়াছে সে অনন্ত সত্তার অভিমুখে। তবে মরণবীণায় কেন এ ভীতি-করুণ রাগিণী বাজিয়া উঠে ? দেবাদিদেব মহাদেব পরম কল্যাণদাতার কল্যাণস্বরূপে প্রাণময় আত্ম-সমর্পণের অভাবেই কি তবে এই বেদনার সৃষ্টি ? যাহা কিছু সবই কল্যাণের পথেই লইয়া যাইবে। কেন এই সংশয় ? এ কি স্পর্দ্ধা ! বিশ্বরাজের বিশ্বনিয়মে অবিশ্বাস ?

এ জগতের ব্যর্থ বেদনার ঘাত প্রতিঘাতের ভিতরই কি করুণাময়ের নিত্য লীলা ফুরাইয়া গেল ! দেখিতেছি ত প্রকৃতির বুকে এই দৈহিকতা-প্রসূত বেদনার ক্ষণিক অস্তিত্ব। যখন অসহনীয় বেদনা দেহকে নিষ্পেষিত করিয়া

ফেলিতে চাহিল, তখনই যাত্রীর সকল বেদনার শান্তি হইয়া আসিল। দেহ অবশ হইয়া গেল, জুড়াইয়া গেল সকল জ্বালা। এ কি! প্রেমময়ের করুণালীলা! এই পার্থিবজীবনে এ কি বহুরূপীর খেলা—কেবলই পরিবর্ত্তন, কেবলই এক হইতে আর এক হওয়া, কেবল নিত্য নূতন স্তরে অগ্রসর হওয়া।

আবার এও ত দেখিতেছি যাহাকে দৈহিকতা বলি, ঐহিকতা বলি, যাহা বেদনার আগুন জ্বালিয়া তুলিতেছে, তাহা সেই বজ্র বেদনারূপ হোমানলের ভিতর নবদীক্ষার আয়োজন করে। যত কিছু বেদনার অভিজ্ঞতা সবই চুপে চুপে বলিয়া যায়, অনিত্য হইতে নিত্যে, অসত্য হইতে সত্যলোকে, ঊর্দ্ধলোকে, সত্যপথেই ছুটিতে হইবে। এ কথাই উহা বার বার আমাদিগকে জানাইয়া যায়। এ অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর আয়োজনের অন্তরালে নিত্য শাশ্বত মঙ্গলের পথেই আপনাকে সমর্পণ করিতে হইবে। নিত্য পথের পথিক, পরম সাধক, পরম মঙ্গলে নির্ভরশীল প্রাণ যাঁহাদের, কোথায় তাঁহাদের দুঃখ গ্লানি শোক তাপ দৈন্য ?

অনন্ত ভূমা মহান্ অসীম সত্তা। সীমার ঘরে বাস করি, সীমার ভিতরই জড় দৃষ্টি সকল অভিজ্ঞতার পরিচয় লাভ করে, সেইজন্য সীমার ভিতরই এ ব্যর্থ অভিযোগ।

অসীমের বিচিত্র লীলা এ ক্ষুদ্র জ্ঞান কতটুকু উপলব্ধি করে? সেইজন্য সসীম দৃষ্টি সীমার ভিতরই সব বিচার করে।

কত সময় হয় ত বুঝি এ ক্ষণিক তুচ্ছ ব্যর্থ বেদনা আমায় কল্যাণের পথেই লইয়া যাইবে, তবুও যে দুর্ব্বল বক্ষ কাঁপিয়া উঠে, অশান্তি-আগুনে পুড়িয়া মরে! মনে হয়, কোথায় চলিতেছি নিঃসঙ্গ যাত্রী একা একা, কোন্ অন্ধ কুহেলী-ঘোরে ঘুরিতেছি চলিতেছি! এম্নি দীন চিন্তা সসীমের কুহেলী-সংশয়জাল রচনা করিয়া, পরম পরিপূর্ণ কল্যাণ তাহার কোথায় বুঝিতে পারে না, সেইজন্য পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের অভাবেই এ আত্মদৈন্যের ব্যর্থ পীড়ন।

ক্ষুদ্র জ্ঞান ভূমা মহানের মহামঙ্গল ভাব, অনন্ত সত্তা, ধারণ করিতে অক্ষম, তবু এ কথা বুঝি—পরম সত্য আছেন তাইত আমি আছি! আমার মঙ্গল বিকাশের ভিতরই যে পরিপূর্ণ শান্ত শুদ্ধের প্রকাশ! যত কিছু খণ্ড অপরিপূর্ণ সসীম পদার্থ, সবই সে পরম পরিপূর্ণেরই বিচিত্র প্রকাশ।

যখন আমাদের দীন বুদ্ধি পরম ভূমা মহানের অনন্ত সত্তা বিচার করিতে বসে, তখনই সীমার সংকীর্ণ মোহদ্বন্দ্বের ভিতর তাহার পরম দৈন্যই জাগিয়া উঠে। ততই জটিল সমস্যা, জটিল রহস্যের ভিতর সংশয় জাল ঘিরিয়া ফেলে। আবার মনে হয়, প্রাণের ঘরে কে কথা বলে? এ বিবেকবাণীর

জন্ম কোথায় ? তাই প্রতি মানবের অন্তস্থলে নিভৃত লোকে নীরবে নীরবেই এক আদর্শ মহিমা জাগাইয়া তুলিতেছেন ; মানুষ ছুটিতেছে সেই আদর্শ রচনায়, তাই তাহার প্রতিদিনের উত্থান পতনের আয়োজন আর ঊর্দ্ধলোকে কল্যাণযাত্রা।

ক্ষুদ্র চিন্তার কত কল্পনা জল্পনা! অসীমের পরিপূর্ণ বিরাট্ স্বরূপখানি কেমন করিয়া এ ক্ষুদ্র চিন্তামুকুরে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে ? কত ভাবে তার অর্থদান! কেউ ভাবিল তবে বুঝি এসব অন্ধলীলার অণুপরমাণুর বিচিত্র যোগাযোগের খেলা। আবার মানুষের বুকে ও কি চেতনার আলো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তখনই বলিতে চাহিল সকল প্রকাশের অন্তরালে এ কি অবশ্যম্ভাবী পরম আদর্শরচনার পরমকল্যাণ-লক্ষ্য ? সেই কল্যাণ-লক্ষ্যেই সমস্ত নিয়ন্ত্রিত। এ কি অচেতনের লীলা ? এ যে চেতনময় পরিপূর্ণ সত্য মঙ্গল শিবসুন্দরেরই শিবজ্যোতি, কল্যাণ-সুষমা—হায়! হায়! কোথায় ইহার ভিতর অন্ধ জড়তার শক্তিমহিমা ?

আবার এ কি কথা! বিশ্বরাজ আমারও হৃদয়রাজ! তখন দেবত্বের মঙ্গলবিভায় এ দীন বক্ষও আনন্দে পুলকিত, স্তম্ভিত হইয়া যায়। অনন্ত প্রকাশ, অগণ্য নক্ষত্রখচিত জ্যোতিষ্কলোক, আমার দীন নয়ন-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত।

এ কি আমার দুর্ব্বল আঁখি-আলোকে অনন্তের ছবি প্রতি-ফলিত! ধন্য লীলা! ধন্য এ আয়োজন! ক্ষুদ্র ভাষা কি আর বলিবে হায়!

আত্মপুরে বিচিত্র মহিমাসুরে বিশ্ববুকে যাহা কিছু সুন্দর, মঙ্গল পবিত্র, তাহারই জন্য প্রাণ রণিত হইয়া উঠে, আকুল হইয়া উঠে—যে শুনিতে পাইল, সে সুরে সুরে প্রেমময়ের প্রেমরাগিণী বাজাইয়া গেল, আত্মবীণায় নিত্য নবীন ঝঙ্কারে। তাই ত ভক্ত-প্রাণের মঙ্গললীলা! কোথায় সেখানে অবিশ্বাস?

প্রাণসখা, আমার বুকেও তোমার এত প্রেমসোহাগের উচ্ছ্বাস কেন? ইহাত আমার সৃষ্টি নয়। কে তুমি প্রাণারাম মহাপ্রাণ এমন করিয়া মোহন গানটী তোমার, আমার প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ধ্বনিত কর, বল। তাই আমার দেহী বিদেহী সব ভালবাসার ধনদের সঙ্গে এক হইতে চাই। এ ক্ষুদ্র জীবনও যে তোমার কথা বলিতে চায়! ভক্তবুকে এ কি গান গাও, বলত।

অনন্ত প্রেম! তুমি যে আমায় তোমার করিয়া দিয়াছ, তাইত আর ভয় নাই। কে এ নিবিড় বন্ধন ছিন্ন করিবে? ভক্তপ্রাণ আনন্দ-ভরে এই মিলন-গানই যে গাহিতেছে! তাইত আশার কথা সংসারে। যাহা এ লোকে আমার

হইয়াছে, তাহা লোকলোকান্তরেও আমার হইয়াই থাকিবে। তোমার বুকেই অনন্ত মিলন। তুমি আমাদের মধ্যবিন্দু, তোমারই করুণ মঙ্গল আশীর্ব্বাদ ভরসা। এই প্রাণময়ী আশা অনুপ্রেরণা জাগাও ঠাকুর—"জানি তুমি মঙ্গলময়," —তোমার প্রেমময় বুকে অভাগারও স্থান আছে।

(৪)

দুঃখীর সান্ত্বনা।

কোন্ নিমিষে ফুরিয়ে যাবে
সাধের লীলা-ঘর!
কেন তবে দাও গো সখা,
অমর-হওয়া বর?
আকুল-করা দুখের মাঝে
কে দেবে গো বল?
বেদন-রাঙা কাঁদন-গানে
আঁখি ছল ছল।
কেমন ক'রে জাগ্‌ব বল,
ধূলায় মিশি ধূলি,

কেন তবে বুকের মাঝে

নিত্য জাগার বুলি ?

আঁধার পথে সাথী কে গো

বস জীবনরথে ?

জ্বালাও সখা, সত্য আলো

নিত্য নবীন পথে ?

ফুরিয়ে যাবে নিশার স্বপন

পলক মধুর পাতে,

ভক্তগাথা ও-কি গায়

দুঃখ-বেদন রাতে ?

বিশ্ব আমার সখার লীলা,

আনন্দেরি মেলা,

জগৎ জুড়ে ঐ বুকেতেই

চল্‌ছে রসের খেলা।

তাই ত আমি সেই খানেতে

ভুলি বেদন-গান,

সবার সুরে আস্‌ছে নেমে

সত্য পথের দান।

ন্যায় সত্য প্রীতি ভক্তি

গাঁথে মিলন-মালা,

উধাও হোল দুখের নিশি
পরাণ-গোপন আলা।
কোন্ কুহেলী ভোলায় মোরে
পাগল দোলার দোল,
কে থামাবে পরাণ-বীণায়
প্রাণ-জাগানো বোল ?
সকল ভুলের মোহের পারে
হাস্‌ছে প্রেমময়,
কোথায় হাসি মন-গোপনে
জয় ব্রহ্ম জয়।
খেল্‌বে যদি আমার সাথে
নিত্য মধুর খেলা,
বাজাও তবে পাগল বাঁশি,
ফুরিয়ে এল বেলা।
বাঁশির সুরে যাই গো ছুটে,
পাগল করে মন,
ফুটিয়ে এস পরাণ-প্রিয়,
হৃদি কুঞ্জবন।

কে তুমি আকুল সাধক সাধনার গানখানি গাহিয়া চলিতেছ ? দেব-আশীর্ব্বাদে ধরণীর বুকে পরম সুখে ত সুখী

হইতে পার ; তবে কেন এ বেদনার গান ? সত্যধর্ম্মের বিমল আনন্দ তোমার বুকে ত অক্ষয় আনন্দ-শান্তি-প্রলেপ দান করিতে পারে, তোমার সরস পূজার আনন্দ গানে সকল দুঃখের নিবিড় ব্যথার মাঝখানেই শান্ত আসনখানি পাতা হইয়া যাইবে। মঙ্গল পূজার অমৃত আলো ঘোর অন্ধকার ভীষণ প্রলয়-ঝঞ্ঝার ভিতরও ধ্রুবতারা হইয়া পথ দেখায়। তবে কেন মাঝে মাঝে এ অন্ধ মুহূর্ত্ত ? চতুর্দ্দিক অন্ধকার। নয়নের জ্যোতি তাহাও বুঝি হারাইয়া গেল। কোথায় চলি ? কোথায় সে সত্য আলোক ? কেমন করিয়া অতীন্দ্রিয় পথে যাত্রা করি ? কই সে প্রাণের নিবিড় শান্তি ? এ কি বেদনা ! মনে হয় ধূলার মানুষ তবে ধূলাতেই মিশিয়া যাই, কখনও অশ্রুবিন্দু বুঝি রক্তবিন্দুতে পরিণত হইতে চায়। কোথায় সখা তুমি ? ব্যর্থ আকুল ক্রন্দনে বুক ভাঙ্গিয়া যায়। এ দুর্দ্দিনে কি তুমিও পরিত্যাগ করিবে তবে ?

সময় সময় সংসারে অসহনীয় ব্যথা এমনই নিবিড়তর হইয়া আসে যে, প্রাণে আকুল বিশ্বাসের অটল ভূমিও বুঝি বা ভাঙ্গিয়া পড়ে। প্রাণসখার চরণে আত্মনিবেদন করিতে চাহিলাম, যখন বিশ্বকল্যাণে আহুতি দিবার আয়োজন, তখনই এই কঠোর বেদনা লাঞ্ছনার আঘাত ! অথচ যাঁহারা তেমন করিয়া তোমায় ধরিতে চাহিল না,

কই তাহাদের সে পরীক্ষা? তাহারা ত নির্ব্বিবাদে চলিয়াছেন সংসারে হাসিয়া খেলিয়া। এ আকুল সাধনার কি এই চরম সার্থকতা? কি হইল তবে নীরস কঠোর সংযম-সাধনায়, শুদ্ধতার কল্যাণ উদ্বোধনে? পাপের এত জয় হয় সংসারে, আর পুণ্যের এ অভিশাপ, এ অট্টপরিহাস কেন জীবনে? কেন জগতে সহানুভূতির অভাব? বল, প্রাণের ঠাকুর, কি জন্য তবে সৃষ্টি করিলে! চাহিলাম শান্ত হইতে, শুদ্ধ হইতে, সে বুকে এত ব্যথার বজ্রবাণ বিদ্ধ করিলে কেন? কত নির্ম্মম নিষ্ঠুরতা মানুষের, অথচ বেশ ত সসম্মান যাত্রা তাঁহাদের; অথচ যে সাধনপথে যাইতে চাহিল, তাহার এ কি মর্ম্মন্তুদ বেদনার আঘাত! কেমন করিয়া নীরবে সহ্য করি বল। মনে হয় সময় সময়, ওগো নিত্য করুণাময়! ও করুণা হইতেও কি বঞ্চিত হইলাম? এই কি সাধনার বিচিত্র পরিণাম? কেন এ আকুল যাত্রা বল। যে দুঃখ বেদনালাঞ্ছিত চিত্ত, সাধন-অঙ্কিত পথে চলিতে যায়, ভক্ত প্রাণের চরণেই ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করিতে চায়, তাহারই কেন এ বিড়ম্বনা সংসারে? তাহারই একমাত্র আনন্দ-পুতলী, আশা ভরসা, সংসার হইতে চলিয়া যায়, তাহার জন্যই যত কিছু লাঞ্ছনা বেদনার আয়োজন! দীন ভিখারী হইয়া তাহাকেই রিক্ত ঝুলি

লইয়া ঘুরিতে হয়! হায়! হায়! এম্‌নি করিয়া সহায় সান্ত্বনা হারা হইয়া শেষ দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে! কেন তাহার জীবনের একমাত্র সম্বল সুকোমল স্নিগ্ধ উজ্জ্বল সুন্দর একমাত্র সন্তানের মহাযাত্রার আয়োজন? কি হইবে তবে প্রাণব্রহ্মে জীবন আহুতিদানে? কি হইবে জগতের হিতৈষণায়—ব্রহ্মসাধনায়? এমনি করিয়াই বেদনা-লাঞ্ছিত চিত্ত বিশ্বকল্যাণের মহীয়সী লীলাতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, কত অভিযোগের বেদনা জমাইয়া তুলিতেছে প্রাণের ঘরে। বিশ্বাস আনন্দ হারাইয়া ফেলিয়া, কি ঘনতম দুঃখ বিষাদের ভিতরেই বাস করে!

আবার এমনিতর নিবিড় হইয়া আসে যখন দুঃখ বেদনার ঘন অন্ধকার, যখন তপ্ত বুক রক্তাক্ত হইয়া উঠে, তখনইত দেখি ঘোর অন্ধকারের ভিতর ভক্তপ্রাণের বিচিত্র গান, ত্রিদিব ঝঙ্কৃত করিয়া, বিদ্যুতের মত আমারই বুক আলোকিত করিয়া তোলে। কে গায় অন্তরালে বসিয়া? এস এস তপ্ত ক্লান্ত ব্যথিত মানুষ! এস এস এখানেই নিত্য বিশ্রাম, সান্ত্বনার উৎসধারা। কোথায় জুড়াইবে ত্রিতাপ-জ্বালা? প্রেমময়ের সরস লোভন কোমল বুকেই ব্যথিতের চিরন্তনী সান্ত্বনা।

আসুক্ তবে প্রচণ্ড আঘাত, বহুক্ তবে আকুল

ঝঞ্ঝাপ্রবাহ, বন্ধ হউক সকল দ্বার, যাউক নিভিয়া সকল সহায় আলো, যাউক্ চলিয়া সকল বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন দূরে সুদূরে, আসুক জীবনে মৃত্যু, উত্থানপতনের ঘোর সংগ্রাম, চরম লাঞ্ছনা। জানি জানি বিশ্বপাতা স্রষ্টা বিধাতা আমারও জীবনপাতা, বিধাতা। জানি যাহা কিছু সবই বিশ্বকল্যাণে নিয়ন্ত্রিত। যাহা কিছু হারাই সকলই ক্ষণভঙ্গুর ; এই অস্থির চঞ্চলতার ভিতরই শাশ্বত ভূমির সন্ধান পাই। সকল বিচ্ছেদ বিরহের ভিতরই নিঃসঙ্গ প্রাণ প্রাণসখার পরম সঙ্গের আনন্দ-সহবাস লাভ করে।

তাই যতই রিক্ত কাতর বেদনা তিক্ততা ঘনীভূত হইয়া আসে, ততই যেন দৃঢ় সঙ্কল্প, সৎসাহস, পরম বিশ্বাস জাগিয়া উঠে। বিশ্বকল্যাণ ঘিরিয়া আছে—ভয় কি ? যতই কেন ঐহিক সুখে বঞ্চিত হই না, ঐ শাশ্বত বুকেই আছি।

সাধক নম্র ভক্ত সর্ব্বস্বহারা জোভের কি মাভৈঃ বাণী ! যাহা হারাইলাম, যাহা বিনাশের পথে গেল, তাহা ত শুধু ধূলি, শুধু ছাই ! সবই তাঁহারই দান, তাঁহারই বুকে টানিয়া লওয়া।

কই সে জীবন্ত বিশ্বাস ? কই সে বিশ্বাস জাগ্রত ? প্রাণব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভরসা, তিনি সঙ্গে আছেন, নিকটে আছেন, জীবনাধার হইয়া আছেন, প্রেমসোহাগে

তাঁহারই বুকে চাপিয়া ধরিয়া আছেন। যখন দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসে, মৃত্যুর কালো ছায়া ঘনাইয়া আসিবে, তখনও ঐ ভরসা, চরম গতি, পরম মুক্তি,—অনন্তেই মহাপ্রয়াণ, অনন্তেই নিত্য সহবাস।

ধন্য সাধক, যদি শেষ দিন শ্রান্ত ক্লান্ত রক্তাক্ত হইয়াও তন্ময়চিত্তে ব্রহ্মসাধকের চিরবাঞ্ছিত সাধনার ধন ব্রহ্মধনে ধনী হইয়া, ব্রহ্মনামের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিতে পার। ধন্য এ সাধনাসংগ্রাম, ধন্য এ একান্ত প্রাণময় জাগরণ, ধন্য এ অটল নির্ম্মল বিশ্বাস।

হায়! হায়! এ কি ভ্রম! সাধনার পুরস্কার ঐহিকতা দৈহিকতায়, ধন ধান্যে পাইতে চাই! যাহা ধূলিমুষ্টি তাই দেবতার দান বলিয়া বুকে ধরিতে চাই! সাধকের পরম গৌরব আত্মরত্ন লাভে। আত্মা অমর, তাহার সে দেবত্বের মহিমাও অক্ষয় ধনে নিত্যানন্দে। দেহী দুর্ব্বল, তাই দৈহিক ঐহিক সুখসম্ভোগে তৃপ্ত হইতে চাই। হায় হায়! যদি একবার দেহাতীত দেবধর্ম্ম পুণ্যমঙ্গল গন্ধে সমস্ত আমোদিত হইয়া যায়, তবেই চিরমুক্তির আনন্দ-পরিচয় লাভ করি। বিধাতার মঙ্গল আশীর্ব্বাদে দেবশক্তির বিমল প্রভাবে মানুষ দেহাতীত ধর্ম্ম লাভ করে; তাই এ ব্যর্থ গ্লানি বেদনাতে সাধকের শাস্তি নয়—সাধুতার পুরস্কার

সাধুতায়। কে জানে এ আসক্তির আড়ম্বরে কি ভাগ্য-বিড়ম্বনা প্রতীক্ষা করে? কোথায় ক্ষণিক দৈহিক সম্ভোগে পরম পরিতৃপ্তি?

ঘরে ঘরে জনকজননি! ও কি কথা শিখাও শিশুর কোমল মধু কণ্ঠে! শিশুর কোমল বুকে ও কি দৈহিকতা ঐহিকতার ক্ষণিক আদর্শ আঁকিয়া দাও! কোথায় পুরস্কার? সাধুতার মঙ্গলদানে, না, ধনধান্যে, মানসম্ভ্রমে? সাধুতার পুণ্যজ্যোতিতে সমস্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে হইবে। তখন সকল কর্ম্ম সকল ছন্দ পুণ্যপ্রভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। সকল কর্ম্মে সাধুতারই বিমল প্রভাব। কে রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ রাজধর্ম্ম পালন করিতে চাও? চাই সাধুতার পুণ্য জ্ঞান। তাহা না হইলে রাজার সত্য রাজধর্ম্ম পালননীতি কোথায় সুপ্রতিষ্ঠিত? কেমন করিয়া প্রজাদের সে প্রাণময় নির্ভর আশা জাগিয়া উঠিবে?

আবার এও ত দেখি কেবল ধন মান কত জীবনকে সর্ব্বনাশের পথেই লইয়া চলিয়াছে। অর্থই কি অনর্থের মূল হইল—এ কি প্রায়শ্চিত্ত জীবনে জীবনে? আবার কত জীবনে ধন মান পুণ্য-পথের সহায়! ধন্য রহস্যময়ের রহস্য লীলা। সকল ঘটনাই সত্যপথের সহায়। কোন দুঃখ বেদনা লাঞ্ছনা ব্যর্থ নয়, সকল ব্যথাই সত্য আলো

জ্বালিয়া ভগবদ্ভক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত করে। এই ত সাধনার সত্য পুরস্কার।

এ কি প্রেমময়ের বিচিত্র বিধি! দুঃখ আছে; কিন্তু কোন্ দুঃখ চিরস্থায়ী? অভ্যাসের বিচিত্র শক্তির অন্তরালে সমস্তই সরল সহজ হইয়া আছে, সকল ব্যথার নিবিড় অনুভূতিই কালে সান্ত্বনার মঙ্গল স্পর্শ অনুভব করে। রাত্রি অবসানেই প্রভাতের আলো উজ্জ্বল হইয়া উঠে, প্রলয়-ঝঞ্ঝার ভীষণ প্রলয়পারে প্রকৃতির বুকে শান্ত গম্ভীর স্নিগ্ধ ছটা উদ্ভাসিত। ক্ষণস্থায়ী সংসারে সুখ দুঃখ অভাব অনাটন সবই ভাসমান মেঘমালার মত নিত্য নূতন রূপে ভাসিয়া চলিয়াছে। কোথায় হৃদয়-আকাশে তাহার স্থির প্রকাশ?

তাইত আশা বিশ্বাস সকল বেদনা দুঃখের অন্তরালে জাগিয়া উঠে। তাইত ভক্তপ্রাণের আনন্দগান অমৃতময়ের অমৃত সহবাসে চির গৌরবমুকুট লাভ করিয়াই আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠে।

কি ভীষণ দারিদ্র্যনিষ্পেষণ! কোথায় তার শেষ? সাধুতার পথে চলিয়া, খাটিয়া মরি। তবু কই স্বচ্ছলতা? বিশ্বাসের সঙ্গে প্রার্থনা জাগিয়া উঠে, প্রত্যেকটী দান কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে গ্রহণ করি, তবু কেন এ ব্যথার

আয়োজন—তবু কেন এ দীনতার ক্লেশ বহন করি? তবুও চল ক্লান্ত যাত্রী, সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে: যদিও আশার শতদল জীবনে বিকশিত হইয়া উঠিল না, তবুও গাহিয়া চল প্রাণব্রহ্মনাম, জাগিয়া থাক নির্ম্মল আত্ম আলোকে, বিধাতার বিচিত্র বিধানে বেদনার ভিতরই এক দিন মুক্তির আনন্দধারা নামিয়া আসিবে। সংগ্রাম-সাজেই সাজিয়া চল ভগবদ্বিশ্বাসী। নিঃসঙ্গ যাত্রার ভিতরই সাধনার ধন হৃদয়রতন পরব্রহ্মের প্রেমসঙ্গ লাভ হইবে। এই ত বেদনার পুরস্কার।

কত মানুষ ঐহিক সুখে পরম সুখী হইল, কত হিতানুষ্ঠানের সুযোগ হইল, তবু কেন তাহার প্রাণের ঘরে নিত্য অভিযোগ অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠে? চতুর্দ্দিকে কত দুর্ব্ব্যবহার, কত অশান্তির আগুন, কত কঠোর বিচার! তবু বলি সততার গান গাহিয়া চল, সকল কঠোর বিচারে নিষ্পেষিত হইয়াও সেই অনিমেষ আঁখির দিকেই চাহিয়া থাক—সে আঁখিতে যদি এই আঁখি জাগ্রত হইয়া থাকে, তবেইত পুরস্কার লাভ হইল। তাইত জগৎ জুড়িয়া ভক্তপ্রাণের এই নিত্য পূজার আয়োজন।

হয় ত আশৈশব কত ব্যাধির প্রকোপে ক্লান্ত যাত্রী, তবু বলি ভয় নাই, এ ব্যাধির বেদন-বাসরেই শাশ্বত গান

বাজিয়া উঠিবে। রোগ শোক দৈন্য সবই একমেবাদ্বিতীয়ম্ মন্ত্র শিখাইবে। হায়! হায়! কত ঘরে দারিদ্র্যের ভীষণ ভ্রূকুটি—দুধের শিশুর দিন উপবাসে কাটে—জননী-প্রাণ কেমন করিয়া শান্ত হয়? তবু বলি ওগো দুঃখিনী জননী, শান্ত হও, বিধাতার ঘরেই আছি সকলে, অটল বিশ্বাসের জয়-কবচ পরিধান করিয়াই চলিতে হইবে, নীরবেই সাধনার গান বিশ্ববুকে রণিত হইয়া উঠিয়াছে! এস এস ক্লান্ত পথিক, কে নিত্য সঙ্গী এস পরম আশ্রয় চিরকল্যাণময়ের কল্যাণ ক্রোড়ে।

এ কি বল? আপন-ভোলা প্রেমে পাগলিনী নারী প্রেমাস্পদের বুকেই মাথা রাখিতে চায়, আর সেই নিবিড় আরাম আশ্রয়খানি ভাঙ্গিয়া যায়! যেখানে প্রেমের অর্ঘ্য নিত্য নূতন করিয়া ঢালিয়া দিতে চায়, সেখানে এ কি ব্যর্থ বঞ্চনার ঘোর বিষাদ-গান! এ কি মর্ম্মন্তুদ ব্যথা, এ কি বিশ্বাসঘাতকতার অট্ট পরিহাস! সত্য, এ ব্যথা কোমল প্রাণকে ক্ষত বিক্ষত করে—বিশ্বাসের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে, ঘৃণা অবহেলা জাগিয়া উঠিতেছে—তবুও একাই জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে। তবুও বলি মানুষের মতই তাহা সহ্য করিতে হইবে, সংগ্রাম-সাজে সাজিতে হইবে, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সাধুতার পুণ্য সাধন করিতে হইবে।

যদি বিশ্বভুবন ভুল বোঝে, ভয় নাই; যিনি ন্যায় সত্য প্রীতির উৎস, তাঁহার প্রেমের নিত্য লীলা আমার মন-গোপনেও চুপে চুপেই গাহিয়া যায়, বিশ্ববুকে লাঞ্ছিত রক্তাক্ত তবুও সেই অনন্ত সত্তা ঘিরিয়া আছে,—এ যে তাঁহারই করুণা!

সকলে পরিত্যাগ করিতেছেন, কঠোর বিচারে নির্ম্মম আঘাতে অপমানে বুক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তবু ভয় নাই—আমি সেই অভয় সত্তার অভয়-কোলে, সেই অভয়-পদে, ক্লান্ত মস্তক রাখিয়াই নিশ্চিন্ত নির্ভয়।

ওগো অভাগিনী পতিপ্রাণা সতি! জীবনদয়িতের বিদায়-শয্যায় এ কি ক্রন্দন বিলাপ! ওগো পিতৃহীন সন্তান, পিতার সমাধিবুকে এ কি অশ্রুজল! ওগো পাগলিনী জননী, সন্তানের শবশয্যায় এ কি বেদনার বুকফাটা কাহিনী! এ কি, এ কি জড়ের আবরণ! এখন জড়ের সে বিচিত্র প্রভাব কই? তবু ঐ হিমশীতল দেহখানি বুকে করিয়াই বুক জুড়াইতে চাই! যে রূপের খাঁচা শূন্য করিয়া প্রাণপোষা পাখী উড়িয়া গেল, সেই শূন্য খাঁচা বুকে ধরিতে চাই! কোথায়, কোথায় ধূলি হইতে চৈতন্যের জাগরণ? কোথায় সীমা হইতে অসীমের বুকে অনন্ত প্রয়াণ? এ কি বিচিত্র রহস্য-লীলা! এ কি সে প্রাণ-

মাতানো চেতনার বিচিত্র খেলাঘর? চিরনিমীলিত নয়ন-মণিতেই কি হাস্য-জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল! এই চিরস্তব্ধ বাণী-সুরেই কি প্রাণের সুরলহরীলীলা জাগিয়া উঠিয়াছিল! এখন তবে কোথায় সে চেতনলীলা? এখন অনাদি বুকে মুক্তির আনন্দ গানে সচ্চিদানন্দ-আকাশে জীবাত্মার না জানি কি আনন্দ বিহার! এই ধূলিমুষ্টিই কি মোক্ষপথের দান? এ কি পরিণতি! ক্ষণিক লীলাঘরে এ কি ঐন্দ্রজালিক প্রভাব! কত বিচিত্র কর্ম্মনিষ্ঠার নিবিড় সাধনা!

এখন খেলা শেষ হইল, কৃচ্ছ্র সাধনার ব্রত উদযাপিত হইল, এখন অনন্তে প্রয়াণ। কে জানে কেমন করিয়া নব প্রভাতে মঙ্গল জ্যোতি সত্তার ভিতর এ ক্লান্ত যাত্রীরও বরণ হইবে—এ কি প্রেমময়ের প্রেম সিংহাসন!

ওগো পিতা পাতা পরিত্রাতা সখা সুহৃদ্, কেন তবে এত বুকফাটা কান্না? শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া কর্ম্মপথে আর ছুটিতে পারি না মনে হয়, আকুল বিশ্রামের প্রার্থনা জাগিয়া উঠে। দাও সখা বুকে বল দাও, সকল ব্যথা বুক পাতিয়া গ্রহণ করি। সব ব্যথাই সহিব; বন্ধু, জানি আমি তোমারই, তোমারই কাছে আছি।

ভবের টানে আনন্দ-গান,
প্রেমবাহিনী তাল,
ধন্য সখা পূজার ফুলে
ভ'র্‌ল হৃদি থাল।
ঢাল্‌লে কত বেদন-ধারা,
ব্যথার সুরেই জাগি,
তবুও সখা ধন্য তুমি,
চরণ-সুধাই মাগি।
কান্না হাসি উধাও হোল
তোমার গানে গানে,
উঠ্‌ল ভ'রে হৃদি-অর্ঘ্য
সখার বেদন-দানে।
আমায় ঘিরে দাঁড়ায় যবে
প্রিয় জনের রূপ,
হৃদয়-দেউল গন্ধে আকুল
ক'রল মধু ধূপ।
মিটিয়ে যত দাও না সখা,
নিত্য নূতন আশা,
নিমেষে দাও পরাণ ভরি'
কতই ভালবাসা।

তবুও দেখে উদাস আঁখি
নয়নজলে ভাসি,
ফুরিয়ে যাবে সাধের খেলা,
সোহাগ রাশি রাশি।
কি আছে গো ধরার বুকে
আসে আলো জ্বেলে,
কালের বুকে মিলন আনে
হাসির খেলা খেলে।
সকল ফাঁকি, কেবল জাগে
আত্ম-যোগে যোগী,
অমোঘ বলে তাই ত জয়
ব্রহ্মসুধা-ভোগী।
নিত্য সুখ যে কোথায় জাগে,
কোন্ আলোকে ধাই,
শুদ্ধরূপে সখার হ'য়ে
তবে জীবন পাই।
কোন্ নিমেষে পলকপাতে
ফুরিয়ে যাবে খেলা,
পিতার কোলে বিরাম লভি
শান্তিসুখ-মেলা।

লক্ষ জন গায় যে জয়,
তাই ত গাই জয়
তাই ত ওগো মরণ সুরে—
নাইক কিছু ভয়
তাইত হোল জয়,
(ওগো) তাইত মোর জয়।
বিশ্ববীণা মরণ-গানে
বাজায় কি বা সুর,
তারই তালে হাসে বুকে
নিত্য অমর পুর।
তাইত হোল জয়,
(ওগো) তাইতে মোর জয়।
এই আশা যে আছে বুকে
পিতার ঘরে রই,
নাই-ক কিছু জীবন সাঁঝে
প্রেমে মজা বই।
সেই আশাতে জাগ্‌ছি আমি,
বিরাম হবে মোর—
যাক্‌ না ভেঙ্গে মায়ার বাঁধ
দুখ-নিশি ভোর।

আছে আমার সত্য সখা,
সেই বুকেতে ঠাঁই,
তাই ত আমি ধরার বুকে
একা নয়রে ভাই।
কোথায় সখা জীবনদাতা,
কর করুণাপাত,
চোখের জলে বুক যে ভাসে,
এস প্রাণনাথ।
পড়ে গেছি, চম্‌কে উঠি,
সহ্য করা ভার,
একা একা চল্‌ব কত,
এস প্রাণাধার।
ধর সখা, ঢাল শান্তি
মন-গোপনে আজ,
নিত্য আরাম দাওগো বুকে,
এস হৃদিরাজ।
নাই বা সখা ফুট্‌ল আমার
আশা-শতদল,
হোক্‌ তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ—
ঐ বলেতেই বল।

ভক্ত-গাথার আনন্দ গান
বাজ্‌ছে জীবনরথে,
সখা আমার সাথেই আছে
নিত্য আরাম-পথে
শেষে যবে ভেঙ্গে গেল
ভবের খেলা-ঘর,
তারই মাঝে জয়-সঙ্গীত
দিল মোক্ষ বর।

(৫)

পীড়া

চুপে চুপেই সইব সখা,
দহন-দুখ-রাতি,
দাও না কেন দুখের বোঝা,
ল'ব আঁচল পাতি'
বাজে বুকে বজ্রকঠোর
আগুন-ঢালা বাণ,
জানি সখা, তাও তোমার
ভালবাসার দান।

জানি ওগো তুমি আছ
নিত্য নূতন হ'য়ে,
দয়ার ঠাকুর, শান্তিধারা
যাচ্ছে সদা ব'য়ে।
তাইত গাই আনন্দগান,
সবার সাথে জাগি',
নিত্য ধেয়ান, নিত্য গেয়ান,
চরণসুধা মাগি।
ডুব্‌ল যবে দেহতরি
রূপ-সাগরে হায়,
তবুও আমি তোমার সখা,
পেলাম পরিচয়।

কত কিছু দুর্দ্দশা সংসারে! তার উপর আবার যখন স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়, তখন কি ভীষণ পরীক্ষা! যতই আমোদ প্রমোদে গৃহ ভরিয়া উঠুক না কেন, রোগীর সে আনন্দ-সম্ভোগ কোথায়? দুগ্ধফেননিভ শুভ্র কুসুম-কোমল শয্যা পাত, কিন্তু নিদ্রা কোথায়? হউক না মানুষ দীন ভিখারী, হউক না তাহার পাষাণশয্যা, আহা! তবু স্বাস্থ্য অটুট থাকিলে তাহার কি শান্তিময়ী নিদ্রার গভীর আনন্দ-ভোগ! হউক না নিত্য নূতন সুখকর রুচিকর আহারের

সুব্যবস্থা, কোথায় ক্ষুধার উদ্রেক ? দীন অন্ন শাকান্নও যে শ্রেয় ! যদি ক্ষুধার সঙ্গে পরম আনন্দে সে অন্ন গ্রহণ করে, মানুষ কি পরিতৃপ্তি লাভ করে ! হউক না কেন রাজপ্রাসাদ রাজ-আস্‌বাব, মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণাসন—অসুস্থ জনের আরাম কোথায় ? স্বাস্থ্য সম্পন্ন দীনের তৃণাসনও যে পরম আনন্দের কারণ ! তাহার সুস্থ সবল দেহখানির কি আনন্দ আরাম সেখানে !

রোগের কি ভীষণ যাতনা ! আহা কি ম্লান শুষ্ক মুখখানি তাহার ! রুগ্নজনের কাতর দৃষ্টি কি বেদনাব্যঞ্জক ! কাহার না প্রাণ তাহাতে আকুল হইয়া উঠে ! আহা রোগী শোকী কি কৃপার পাত্র ! কি পবিত্রতার আদর্শ ছবি ! তাইত রোগীর সেবার ভিতরে নিত্য পুণ্যসঞ্চয় !

হায় ! হায় ! এক দিন আমারও ত এ দশা হইতে পারে ! কি কৃপার পাত্র হইব কে জানে ? তাই অপরের রোগশয্যার পাশে দাঁড়াইতে চাই, তাই নিরাশ কাতর হৃদয়ে আশার বাণী শুনাইতে চাই। রোগশয্যায় কত সাধ হয়, প্রিয়জনের সেবা ভালবাসার ভিতরই ভীষণ শয্যাও মধুময় হইয়া উঠুক্। তাইত রুগ্ন জনকে ভালবাসিতে চাই !

এত ব্যাধি কেন সংসারে ? অভিযোগ প্রাণে কেবলই আসে। কেন পরিপূর্ণ মঙ্গলময় তোমার সংসারে, এ

কঠোর বিধান ? কত মানুষ ত সুস্থতার আনন্দ সম্ভোগ করিতে করিতেই সহসা আনন্দে দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান—কোন ব্যথার অনুভূতি নাই তাঁহাদের, জীবন-প্রদীপের শান্ত নির্ব্বাণের অবসানেই আনন্দে কি মহানিদ্রা !

কেন এত ব্যাধি কে জানে ! কত নিয়ম-ভঙ্গের ভিতর কত যুগ যুগান্তরের রোগের বীজ দেহের ঘরে জমিয়া উঠে ! ক্ষণিক ব্যক্তিগত লালসা, আত্মবিস্মৃতি, ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য কি বিষময় ফল উৎপন্ন করে সংসারে ! এ দেহ ত দেবতার দান। এক দিন এ দানের অধিকার শেষ হইবে। জীবাত্মা এই দেহযন্ত্রের বিপুল সাহায্যে, এ রূপের দেশে, কত মঙ্গল কর্ম্ম সাধনের ভিতর নব নব ভাবে ফুটিয়া উঠিবে, তাইত রূপখানির এত আয়োজন ! কত অন্যায় ও পাপের জন্য কত শাস্তিভোগ ! অতি ক্ষুদ্র নিয়মভঙ্গের জন্যও কত অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল ভোগ করিতে হয়। এমনি করিয়াই ত পরিবারে মানবসমাজে কত অকাল মৃত্যুর আয়োজন হইতেছে ! দেবস্বভাব মানুষের শমদমাদির উপেক্ষায় বংশপরম্পরায় কি নরকযাতনা ভোগ করিতে হয় ! পিতৃপিতামহের ক্ষণিক অসাবধানতার ফলও যে ভবিষ্যতে ভোগ করিতে হয় ! তাইত কেবলই সতর্কতার বাণী। সাবধান ! সাবধান ! জীবনপ্রভাতেই সাবধান।

ঘরে ঘরে কত করুণ দৃশ্য! তবু কি চেতনা জাগ্রত হয় না? তবু আত্মসংযমের পুণ্যদীক্ষার ভিতর দেহমন আত্মাকে পবিত্র করিবে না মানুষ? তবু কি প্রতিবাসীর, আত্মীয় স্বজনের, প্রাণে সে পবিত্রতার আলো জ্বলিয়া উঠিবে না? কেবল তুচ্ছ আমোদ প্রমোদ সম্ভোগে মরণ-পথে অগ্রসর হইয়া চলিবারই ব্যবস্থা হইবে সংসারে? হায়! হায়! কি বিষময় ফল!

রোগীর কাছে কে আসিতে চাও? এস, শান্ত হইয়া সান্ত্বনার কোমল করুণ বাণী শুনাইয়া যাও। ভালবাসার আনন্দ আহ্বানেই এস। ভালবাসায় গদগদ হইয়া যদি সেবা করিতে পার, এস। আহা! অতি উদার প্রেমিক ভক্ত প্রাণ কেমন করিয়া কুষ্ঠ রোগীকেও বুকে টানিয়া লন! এ কি জীবে দয়া, মানবের সেবা! এই ত বিশ্বপ্রেম। ক্ষুদ্র মানুষ, আমাদের তাহা ধারণা করিবার শক্তি কোথায়? ক্ষীণ দুর্ব্বল হস্ত সংসারে কোন বিশেষ কর্ম্ম না করিতে পারে, তবে নীরবে পীড়িত জনের শয্যাপার্শ্বে সহানুভূতি ত প্রকাশ করিতে পারে! দুটী মিষ্ট কথাও তাহার নির্ব্বাপিত জীবনে আশার আলো হয় ত ফুটাইয়া তুলিতে পারে! রুগ্ন হইয়া দিনের পর দিন কাটে, কই কেউ ত কাছে আসে না, আশার কথা, ভালবাসার কথা শুনিতে পাই না! কে

কাহাকে সাহায্য করিবে? পথে পথে কত রুগ্ন জনের আর্ত্তনাদ! কে তুমি ধনবান্ বিধাতার পরমদানের অধিকারী, এস, রোগীর রোগযাতনা উপশমের ব্যবস্থা করিবার আয়োজন কর—ধন্য হউক রত্নাগার।

কে বোঝে সে কথা? যাহা কিছু পাই সবই বিশ্বের পাই, যাহা কিছু দিই সবই বিশ্বের কাজে সঁপিয়া দিই, সবই মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধানই মানিয়া চলা। কত ক্রন্দন! কত হাহাকার! কে সেবা করে, কে সান্ত্বনা দেয়, কে পথ্য দেয়? কত প্রিয়জন বুক খালি করিয়া চলিয়া যায় সেবার অভাবে! কি মর্ম্মন্তুদ যাতনা বোঝে কে? কে দিবে উদার দান? কোথায় সে বিশ্বপ্রেম? দুঃখীর ঘরে এক মুষ্টি অন্ন মেলে না, রোগে পথ্য মেলে না, অথচ জগতের বুকে কত আমোদ প্রমোদসম্ভার, কত উৎসবাভিনয়, কত ইন্দ্রিয়সম্ভোগের আয়োজন! এ কি রহস্য জগতে! কত সলজ্জ প্রাণ দারিদ্র্যের ভীষণ পীড়নে নিষ্পেষিত! তবু ত পারে না তার রিক্ত ঝুলি লইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে! কে বোঝে সে বেদনা? ধন্য দয়ালু ধনী, যদি পার দাতব্য ভাণ্ডার খুলিয়া দাও, উচ্চবংশের গৌরবমহিমা ফুটাইয়া তোল, ধন্য হউক তোমার করুণার দান।

অতীতের ইতিহাসে কত আতিথ্যের আয়োজন, কত

আতুরের নিত্য সেবা! কই এখন সে নিত্য সেবা? কই এখন সে পুণ্য ব্যবস্থা? যদি সে পুণ্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়, কি অক্ষয় অমর কীর্ত্তিতে ধনীর মহামাহাত্ম্য লাভ হয়! কেবল বিলাসসম্ভোগে সে আনন্দকীর্ত্তি কোথায় পাবে মানুষ? কত কৃতজ্ঞ হৃদয় দাতার চরণে নিত্য অঞ্জলি নিবেদন করে! সে জয়ধ্বনি লোকলোকান্তরেও কেমন রণিত হইয়া উঠে, কে জানে? আসুক সে অতীতের পুণ্য প্রতিষ্ঠান এই ভোগ বিলাসের দিনে, আসুক আবার সে বিশ্বপ্রেমের মঙ্গল অনুপ্রেরণা, ভক্ত আঢ্য জনের দেবলব্ধ ধন দেবসেবায় উৎসর্গীকৃত হউক।

কেমন করিয়া এ জীবনযাত্রায় পরস্পরকে শ্রদ্ধাদান করি? হয় ত সুদিনে বন্ধুরূপে গ্রহণ করি, দুর্দ্দিনে কই সে প্রাণবিনিময়? কই শত্রুমিত্রে সম জ্ঞান? কই শত্রুকে প্রাণ খুলিয়া ক্ষমা করিতে পারি? কত সাময়িক উত্তেজনায় পরস্পরে কি ব্যবধান রচনা করিয়া ফেলি! পারি কি ক্ষমার শান্ত মন্ত্রে নত হইয়া বিদায়মঙ্গল ভিক্ষা করিতে? তাই ত এ অশান্তি সংসারে! জানি না কবে ক্ষমার উদ্বোধনে মানুষ শান্ত হইবে, নত হইবে।

ঐ যে অমুক তাহার শেষ শয্যা পাতিয়াছে, চলিয়াছে চিরবিদায় লইয়া, তবু কি পারি কল্যাণকামনা করিতে? মৃত্যুর

পরপারেও কি এই প্রাণের বিক্ষোভ দীর্ঘনিশ্বাস জাগিয়া থাকিবে? কই সে জ্বলন্ত বিশ্বাসে বিনত নম্র হৃদয়, কই আত্মনিবেদন? কি চাই? চাই কি অনন্ত সুপ্তি? অসংখ্য প্রাণ ত আসিতেছে যাইতেছে, তবে কেন মৃত্যুভয়? প্রতিদিনই নিদ্রাবেশ, দেহ অবশ হইয়া পড়ে, কে জানে আবার জাগরণের গান কেমন করিয়া দিকে দিকে গাহিয়া উঠিবে! সে মহানিদ্রা কেমন? এ কি মহাজাগরণের আয়োজন! অনন্তবুকে মৃত্যুমঙ্গলবাসরে অনন্ত মিলন-উদ্বোধন। কত সময় হয়ত ভীষণ ব্যাধির পীড়ন হইতে মুক্ত হই! কিন্তু তাহাতেই কি অনন্ত মুক্তি? এক দিন ত যাইতেই হইবে। এই কুহক স্বপ্নলীলা এক দিন ত ফুরাইয়া যাইবেই যাইবে। কে জানে কোন্ নিত্য চেতন-লোকে জাগিয়া উঠিবে? ছুটিতেই হইবে চিরকল্যাণসাধনায়, সেই মঙ্গলবাণী শুনিতেই হইবে। সুখে দুঃখে, সুস্থতায় অসুস্থতায়, নিষ্ঠার পুণ্যব্রতে ব্রতী হইতেই হইবে। মহাযাত্রার আনন্দব্রতে ব্রতী হইতেই হইবে। মহাযাত্রার জন্য আনন্দে প্রস্তুত হওয়া প্রতিদিনের যাত্রায় হইল কি? কোথায় তবে অনন্ত নির্ভয়, অনন্ত আশা?

যদি সকাল সন্ধ্যায়, সকল কর্ম্মে, সকল ধর্ম্মে, আমার মহাযাত্রারই জন্য প্রস্তুত হওয়ারই আয়োজন হয়, তবে

কোথায় ভয় ভাবনা ? বিধাতার দান ভোগ করি, এ যে ন্যায্য অধিকার। জীবনের প্রতি ঘটনা তাঁহারই ব্যবস্থা, তাইত নিত্য বরাভয়-স্বরূপে সকল ঘটনার ভিতর মঙ্গলবাঁশরি বাজিয়া উঠে! হে বিশ্বমঙ্গল, অনন্ত মঙ্গল, এমনি করিয়া ক্ষুদ্র হইয়াও মহানে, ঊর্দ্ধে, তোমারই দিকে ছুটিতে চাই। তোমারই হইতে দাও, মৃত্যুর চিরমঙ্গলছবি আমার সহায় হউক যাত্রাপথে। আমার সে শান্ত নিয়মিত জীবন বরণীয় হউক। তোমার প্রেমে পরম প্রতিষ্ঠা দান কর ভক্তজীবনে, তাই তাঁহাদের উদার প্রেমিক হৃদয়খানি দীন দুঃখী পীড়িতের চির সান্ত্বনাস্থল। কই এ ক্ষুদ্র শক্তির সে কল্যাণসাধনা ?

ওগো পিতা, এস আমার
নিত্য আরাম-গেহ,
শোকে দুখে তপ্ত বুকে
শান্তিসুধা দেহ।
রোগের মাঝেই নিত্য লীলা
পেলাম তোমার বরে,
বেদন-রাঙা দহন-দুখ
ডাক্‌ছে সবে ঘরে।
সকল দুখে রোগে শোকে
ভালবাসার গান,

বাজ্‌ল ও কি বুকের ঘরে
সখার মধুর তান ?

(২)

ভক্ত বুকে জাগ্‌ছে বাণী
শান্তিসুধা-ধাম,
জুড়িয়ে যাবে ঐ গানেতে
বুক-জুড়ানো নাম।
নিবিড় ব্যথা আকুল করে
দহন-দুখ-রাত,
ঐ গানেতেই জুড়িয়ে গেল
করুণ নয়নপাত।
দুখের মাঝেই নিয়ে এলে
পারিজাতের হার,
চোখের জলেই নাম্‌ল বুকে
মন্দাকিনী-ধার।

(৩)

আশার গানে সখা আমার
বুকের ঘরে রাজে,
প্রেম কখনো ফুরোবে না,
প্রাণের তারে বাজে

আসুক না মোর রোগ শোক
পরাণ-পাখী জাগে,
প্রেম-লগনে উঠ্‌ব গেয়ে
নিত্য মধুর রাগে।
ধন্য তুমি প্রেমের ঠাকুর,
ধন্য মম গান,
সইব সখা, ভাল মন্দ
তোমারইত দান।

(৬)

অমৃত পান

(ক)

(১)

গাও আজি সবে যে যেখানে আছ,
বিশ্বপিতার জয়,
নিবিড় তন্ত্রে, মধুর মন্ত্রে,
গাও রে বিশ্বময়

জাগা'য়ে পুণ্য প্রেমের ছন্দ,

মঙ্গল মধু নাম,

শুভ্র বিমল আনন্দময়

সে অমৃতময় ধাম।

(২)

মরমে বেদনে, আঁধারে বিপথে,

করুণা আসিছে নামি',

ব্যথিত চিত্ত আকুল আবেশে

ভরেছে দিবস যামি।

আছে সদা ঘিরে নিবিড় করিয়া,

করুণ সোহাগ মরি,

বুঝেছি বন্ধু, ঢেলে দেবে বুকে

তোমারি করুণা ভরি'।

(৩)

সাধ হয় আজ যে যেখানে আছ,

গাও রে তাঁহারি জয়,

প্রেমে বাঁধা আছি নিবিড় নিগড়ে,

জয় জয় প্রেমময়।

দেবলোকে যত দেব পূজারি

পেতেছে পূজার আসন,

সেই হোল সুখী যে জন হেরেছে
সে প্রেমমধুর আনন।

(৪)

সঁপে দেব আজ দেহ প্রাণ মন,
সখার চরণে মোর,
দেবলোকে যথা বাঁধে নিতি নিতি
মঙ্গল প্রেম-ডোর।
সৃজন করেছে, রেখেছে আমারে,
তোমারি করুণ পাত,
তব মঙ্গলরসমধুধারা
ঝরিছে দিবস রাত।

(৫)

ধন্য সে জন যে জন বরেছে
সখার মোহন রূপ,
ধূলি হ'য়ে গেল স্বর্ণরেণুকা,
ছড়ায়ে পুণ্যের ধূপ।
ঐ কোলে আমি আছি যে জাগিয়া,
নিত্য ভরসা মোর,
মিটি যাবে হায় যতেক পিয়াসা,
ঘুচিবে নয়ন-লোর।

এ সংসারে কত জটিল জঞ্জাল! তাহার মাঝখানেই জীবাত্মার কি জ্যোতির্ম্ময় সত্তা! চতুর্দ্দিকে ঝঞ্ঝাপ্রলয়-সাগরদোলার ভিতর এ কি শান্ত সুনির্ম্মল অক্ষয় আনন্দের আয়োজন! সকল কোলাহলের মাঝখানেই আমার 'আমি'র এ কি নিভৃতে শান্ত আরাম-গেহ! আলোক আছে, তাই ছায়ার অস্তিত্ব; দুঃখ আছে, তাই সুখের মাহাত্ম্য। সুখদুঃখ, আঁধারআলোর মাঝখানেই আমি শাশ্বত স্বরূপে জাগ্রত হইয়া থাকি। সকল নিরাশা বেদনা মর্ম্মন্তুদ যাতনা, সুখদুঃখের বিচিত্র লীলামাহাত্ম্যের মাঝখানেই আমার 'আমি'র এ কি জয়গান! ভাগ্যবিধাতা কে তুমি? তোমার এ কি কল্যাণ ব্যবস্থা! এ কি আমার অপূর্ব্ব নিয়তি! সকল নিঃসঙ্গ উদাস প্রতীক্ষায় তোমার প্রাণময় সঙ্গ ভোগ করিতে দিলে! হায়! হায়! সাধ হয় এ আনন্দ-অনুভূতি একবার বুকের ঘর খুলিয়া দেখাই সকলকে। কি মঙ্গল-মুহূর্ত্ত! আহা! জানি না ত নিত্য সেই আনন্দসম্ভোগ, তবু ক্ষণিকের সে বিচিত্রঃস্বাদ, সাধ হয়, বোঝাই সকলকে। হায়! হায়! যাহারা এ রসের স্বাদ এক দিনও পাইল না, কৃপাপাত্র তাহারা। সাংসারিক প্রগল্‌ভতা চঞ্চলতার ঘোরে যতই কেন মানুষ ঘুরিয়া মরুক্ না, এক দিন এমন

আসিবে যখন সেই সত্য সঙ্গের জন্য প্রাণ আকুল হইবেই হইবে। যখন কোন সামাজিকতা, ঐহিকতায়, ক্ষুদ্রতায়, প্রাণের অতৃপ্ত সাধ কিছুতে মেটে না,—কি যেন চায় অনন্তপিপাসু প্রাণ অনিত্যতার ঊর্দ্ধে। তখনই, তখনই নবজীবনের নব উদ্বোধনের পিপাসা জাগিয়া উঠে।

এম্‌নি করিয়া পিপাসা জাগে কই, যাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার সত্য আয়োজন হয়? সেই বিচিত্র ভূমা মহানের আনন্দবুকে, পবিত্রতার নির্ম্মললোকে, আমার কেমন করিয়া স্থান হইবে? এম্‌নি করিয়া এক অব্যক্ত প্রাণময় জ্যোতির্ম্ময় শুভ্র সত্তা আশৈশব হৃদয়নিভৃতে জাগিয়া থাকে, অথচ তাহার সে সুস্পষ্ট বিকাশ কই হয় জীবনের বিচিত্র ছন্দে? ব্যর্থ দীন যাত্রার অভ্যস্ত চঞ্চল দোলায় কেবল দোলায়মান্! কেবলই ক্লান্তি, কেবলই অতৃপ্তি!

কত সাধনার গান, কত ভক্তগাথা ত শুনি জীবনে জীবনে, মন্দিরে মন্দিরে! তবু কই সে আদর্শ মহিমার পরম অভিব্যক্তি আমার ব্যক্তিগত জীবনে? যে প্রাণময় জাগরণ, ধর্ম্মপিপাসা, অনুপ্রাণনা, ভক্ত যিশু শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতির জীবনে জাগিয়াছিল—সে ত :কেবল স্মৃতির পূজা নয়, সে ত কেবল দৈনন্দিন নিয়মতালিকারচনা নয়—সে যে আত্মা-

পরমাত্মার মহাসত্তার ভিতর আপন সত্তার প্রাণময় প্রেম-সম্মিলন !

কালের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে মানুষ। কর্ম্মপ্রবাহে, কখনও সুখ, কখনও দুঃখ। যেন আকস্মিক নিয়মতন্ত্র জীবনকে নিয়মিত করিয়া চলিয়াছে। এই সকল চঞ্চলতার ভিতরই যে চিচ্ছক্তি শান্ত স্নিগ্ধস্বরূপ দেবলোকের বিমল শুভ্র স্নিগ্ধ জ্যোতির ছটায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে ! এমন সময় আসে মানবের জীবনে, যখন ঐহিক আমোদ আহ্লাদে আর বুক ভরে না,—সকল বিষয়েই এক অতৃপ্ত অবসাদে প্রাণ মন অবসন্ন হইয়া পড়ে।

আবার কত মানুষ সংসারের এই ক্ষণিক ব্যবস্থার ভিতর ক্লান্ত হইয়া পড়ে,—হয়ত এক মঙ্গল ক্ষণ আসে যখন তাহার প্রাণকে এক অব্যক্ত স্বর্গের আনন্দ-অনুভূতির আভাসে আলোকিত করিয়া তোলে। কিন্তু সে অনুভূতি চিরস্থায়ী হয় কই ? স্বপ্নের মত নিমেষে কোথায় উধাও হইয়া যায়। এমন কি সে আনন্দ-স্মৃতিও মনের ঘর হইতে লুপ্ত হইয়া যায়। আবার একই কর্ম্ম-অনুষ্ঠানের ভিতর শুষ্ক কঠোর হইয়া উঠে, সমস্ত মরুভূমির মত নীরস হইয়া যায়।

তাই জীবনের প্রতিদিনটী ভাবিতে হয়, কোন্ দিনটী

আমার পরম সুখের দিন ; কোন্ দিনটী মধুময়, আনন্দময়। কাহার হয়ত মনে হয়, আহা, শৈশবের মত এমন নির্ম্মল পবিত্র সময় বুঝি আর নাই! শৈশবের মঙ্গলউষায় অতি তুচ্ছ বস্তুটীও কি বিচিত্র স্বরূপে প্রকাশিত হয়! একটী পুষ্পদলের ভিতরই কত কিছু উজ্জ্বল হইয়া উঠে, চতুর্দ্দিকে পারিপার্শ্বিক যাহা কিছু সব কিছুর ভিতর কি মঙ্গলমাধুরী ফুটিয়া উঠে! সব কিছুর ভিতরই কি সরস আনন্দে ভরপূর ; শৈশবের কান্নাহাসি, খেলাধূলা সবই কি সরল সহজ সুন্দর! তখন জীবনের পত্রে পত্রে ভবিষ্যতের কত আশার ছবি অঙ্কিত হইয়া উঠে! তাইত শৈশব এত সুখময়।

আবার যখন জীবন-ইতিহাসের প্রতি পরিচ্ছেদ তন্ময় হইয়া পাঠ করে, মানুষ দেখে প্রতি পরিচ্ছেদের বিচিত্র পরিবর্ত্তনের ভিতর তার স্বতন্ত্র গৌরব, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, স্বতন্ত্র আনন্দমহিমা। তাই শৈশবের খেলাধূলা চিরদিন জীবনে বাঞ্ছনীয় নয়। প্রত্যেক শিশুই কেমন আকুল হইয়া বড় হইতে চায়! শৈশবে কোন্ জিনিস বরণীয়? তখন কই পার্থিব ধনলিপ্সা? তখন রাজপ্রাসাদও খেলাধূলার বালুকা-পুঞ্জের ভিতরেই গড়িয়া উঠে! ক্ষুদ্র খেলাঘরের আসনখানিই রাজ-আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়! তার অস্ফুট কোমল হৃদয়খানি

অল্পের ভিতরই ভূমার আনন্দসাফল্য লাভ করে! কেন এমন হয়? অন্তরের আনন্দই নির্ম্মল আনন্দ। যাহা পাই তাহাতেই সন্তোষ, ভবিষ্যতের ভাবনা নেই, যাহা কিছু পায় তাহাতেই আনন্দ। তাই অল্প আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই অল্প হাসিকান্নাই জড়িত হইয়া থাকে। আবার যখন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ আশা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, তখন তাহারই জন্য অনেক চোখের জল ফেলিতে হয়—অনেক সংগ্রাম, অনেক কিছুর ভিতর যাইতে হয়। যাহাতে বেদনা দুঃখ তাহা বেশীক্ষণ বুক পাতিয়া লইতে পারি না, যাহাতে আরাম সুখ তাহা পাইতেই ছুটিয়া চলি। হয়ত সেজন্য কত অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু যখন শুদ্ধ সরল মন, তখন যাহা কিছু ভোগ করি সব শুদ্ধ ভাবেই গ্রহণ করি; তাই সেখানে কোন অনুশোচনা নাই, বেদনাক্লান্ত মুহূর্ত্ত তেমন ভয়াবহ হয় না। যখন হিতাহিতের জ্ঞান জাগে, যখন ভাল মন্দের বিচারবুদ্ধি জাগ্রত হয়, তখন অতি সামান্য আচরণের সঙ্গে সঙ্গেই কত ভীতি, কত অশান্তি! এই ভীতির অমঙ্গল চিন্তাই আবার সত্যপথে, মঙ্গলপথে লইয়া যায়। আবার, কুবাসনা হয়ত কুপথেই লইয়া চলে।

কেন যৌবনের জ্ঞানগরিমা ব্যর্থ হইবে, কেন বার্দ্ধক্যের অভিজ্ঞতা বিফল হইবে, আর কেনই বা শৈশবস্মৃতির এত

মাহাত্ম্য? আত্মপুরেই সকল আনন্দস্মৃতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা, সকল শান্তির উৎস হৃদয়কন্দরেই উৎসারিত। সুশোভন চরিত্রজ্যোতি আত্মজ্যোতির মহিমাতত্ত্বেই উদ্ভাসিত।

কেন মন ক্ষণে ক্ষণে এই অশান্ত অশোভন তৃপ্তিসাধনার ভিতর আরাম সম্ভোগ করিতে গিয়া অশান্তির আগুনে পুড়িয়া মরি—নিজ নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারি না? কেন অধিক আকাঙ্ক্ষা, অধিক ধন-মান-যশের জন্য ব্যতিব্যস্ততা? এক সময় তৃণকুটীরই কত আরামদায়ক! তাহা কেন সকল সময় সুখকর হয় না? কেন অবিমিশ্র নির্ম্মল আনন্দ-সম্ভোগ জীবনে হইয়া উঠে না?

শৈশবের স্বাভাবিক সরলতা আমরা হারাইয়া ফেলি, তাই পারিপার্শ্বিক অবস্থা মনোজগতে এক বিচিত্র পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। অসত্যের ভিতর কত মহা অনর্থের সূচনা হয়! বহির্ম্মুখীন ভোগসম্ভোগের জন্য চিত্ত পিপাসু হইয়া ছুটে, তাই ব্যর্থ হইয়া ফিরিতে হয়; কোথায় সে নির্ম্মল আনন্দ? কত অসরলতা, দ্বেষহিংসায়, শৈশবের সরল সহজলব্ধ দেবপ্রকৃতি লুপ্ত হইয়া যায়? তাইত ভক্ত গাহিয়া উঠেন, 'ওগো কে চাও পূজা করিতে, তবে এস সরল শিশু হইয়া পূজার মন্দিরে পূজার অর্ঘ্য লইয়া'। সে শান্ত স্নিগ্ধ সরল অমল জ্যোতি জীবনের প্রতি অবস্থাতেই লাভ করা

কি সম্ভব নয় ? একবার সে সরলতা যদি জীবনে ফুটিয়া উঠে, তবেই নির্ম্মলানন্দ, পূর্ণানন্দ।

হয়ত কতজনের শৈশবকালই ব্যর্থ হইয়া গেল, হয়ত ব্যাধিনিষ্পেষণে, হয়ত বা আত্মীয় স্বজনের কুটিল কঠোর ব্যবহারে, তাহার শৈশবের নির্ম্মল আনন্দ সম্ভোগ করা হইল না। তাই যে দিন মঙ্গলমুহূর্ত্তে প্রথম ভালবাসার স্নেহের আস্বাদ পাইল তরুণ জীবনে, সেদিনই তার হৃদয় আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেদিন কত সরলতা জীবনে, নিত্য নূতন প্রেমের অর্ঘ্যে হৃদয়-থাল ভরিয়া উঠে। তখন তার প্রেমজ্যোতিতে সব জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে, প্রতি ভাবকুসুম মঙ্গলসুবাসে সুবাসিত হইয়া উঠে, প্রতি দৃষ্টি, প্রতি সুরলহরীর ভিতর, নবছন্দোলহরী উদ্বেলিত হইয়া উঠে। প্রেমাস্পদের প্রেমের অর্ঘ্য কি আনন্দ-সুষমা রচনা করে! জীবন তখন কি মধুময়, কি আনন্দময়! যাহা কিছু ভালবাসার ধন, সব কিছুর ভিতর কি পুণ্যমাধুরী! প্রেমে উৎফুল্ল জীবনখানি কি শান্ত বিনতির মঙ্গলশ্রীতে ভরিয়া উঠে—কত উন্নত আকাঙ্ক্ষা কত নব নব সদ্‌গুণ সদ্ভাব সাধনা! তখন সকল দুঃখ বেদনা কি শান্তির উদ্বোধনমন্ত্রে দীক্ষিত করে! অতি তুচ্ছ ত্রুটিও সংশোধন করিতে কি নবোৎসাহ, নব আনন্দ! তখন প্রেমের সম্মানে কুকর্ম্ম কুভাব

কোথায় উধাও হইতে চায়!—প্রেমের এমনই জ্বলন্ত পুণ্যমহিমা! এমনিতর প্রেমকাহিনীর মঙ্গলস্মৃতিগন্ধ কেবলই পুণ্যপবিত্রতায় আমোদিত করিয়া তোলে।

আবার যেদিন মানুষ তাহারও ঊর্দ্ধে, সকল কুহেলীর পরপারে, যোগসুন্দরের নিত্য পরিচয় লাভ করে, শান্ত যোগাসন পাতিতে শিখে, সেদিন কি পরিপূর্ণ পরমানন্দের মধুর উপলব্ধি! মানুষ সেদিন বোঝে কোথায় ভুল ত্রুটি, সেদিন বোঝে কোথায় তাহার প্রিয়ধনদের জীবনকমলে সে মঙ্গল-আভা। এ আনন্দ-অনুভূতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা কোথায়? সেদিন মর্ম্মগুহায় নিত্য প্রেমধারা নীরস পাষাণ-বুকের তলে নামিয়া আসে। তখন সে গোপন আনন্দধারার আনন্দলহরী কে তুলনা করিবে? তখন যা কিছু সব যে আনন্দময়, মধুময়! এই পুণ্য জাগরণ শৈশবের সরলতায় পবিত্রতায়, দেবত্বের মহিমায়। যখন মোহকুহেলী সব ঢাকিয়া ফেলে, তখনই সংসার অন্ধকার।

কেন এ চঞ্চলতার মোহ সংসারে? কেন সে সহজ দেববাঞ্ছিত ধনে বঞ্চিত হই? কেন হৃদয়মন্দিরে সে পুণ্য ছবি উজ্জ্বল হইয়া উঠে না? কেন ক্ষীণশক্তি এমনই ব্যর্থ হইয়া ফিরে? কোথায় সে পুণ্যসত্তা? কোথায় বাহিরে তাহার প্রকাশ দেখিতে চাই, দেখাতে চাই? কেন

নির্ম্মলালোকের জন্য প্রস্তুত হওয়া হয় না? স্নেহ প্রেমের শুদ্ধ মুক্ত স্বরূপসাধনাতেই নন্দনের বিমল জ্যোতিছটা।

আত্মলোকে সে দেবজ্যোতি কই উদ্ভাসিত? তাই ত এ দীনতার ম্লানিমা! প্রাণসখা, দয়া কর। যদি ধূলিমুষ্টিকেই বিচিত্র অধিকারে ত্রিদিবের সুনির্ম্মল সুবাসে ভরিয়া তুলিবে তবে তোমারই নিত্য সত্তা দান কর। দেবত্বের পুণ্যজ্যোতিছটার ভিতর সার্থকতা দান কর, লুব্ধ দৃষ্টিকে আকুল কর, তোমার দানের যোগ্য কর।

ওগো বন্ধু, দয়া কর; তোমার ত্রিদিবের আনন্দদ্বার খুলিয়া আসিয়া বক্ষপুরে তোমার মাভৈঃ-বাণী ধ্বনিত কর। যদি এ প্রাণ কেবলই সুখের ভিখারী হইয়া ঘোরে, তবে নিত্যসুখপিপাসু কর। স্বর্গের উজ্জ্বল সুষমায় সমস্ত আলোকিত কর।

(৭)

অমৃত পান

(খ)

ভয়ের কথা কোথায় বল ?
সখার বুকে হাসি,
তিনি আর আমির মাঝে
সকল গেল ভাসি।
যাক্ না কেন ছাই হ'য়ে
ধূলির দেহ ধূলায়,
দিবানিশি প্রেম সোহাগে
সকল দুখ ভুলায়।
প্রেমপুলকে মধুপরশে
আনন্দগান বাজে,
উধাও হোল দুখ নিশি
শান্তি সুখ রাজে।
প্রেম-আশীষে উঠ্‌ল ভ'রে
হৃদি অর্ঘ্যথাল,

রইল পড়ে সকল খেলা,

ছেড়ে দিনু হাল।

প্রেম-উজানে যাব ভেসে

প্রেম-তীর্থধাম,

প্রেমঘরেতেই রইব ম'জে

বুক জুড়ানো নাম।

কোথায় গেল ভবের খেলা

যতেক দুখ-গান,

ফুরিয়ে গেল মোহদ্বন্দ্ব,

ছিঁড়্‌ল সকল টান।

দাঁড়ানু আজ সখার কাছে—

বঁধূর ঘরেই মোর,

বুকের মাঝে আনন্দরাজ,

দুখ-নিশি ভোর।

মরণমাঝে শরণ জাগে,

অমর হওয়া বর,

মিল্‌ল যত হারানিধি

মিলনমধু-ঘর।

বিশ্বাস ত করি জীবনে জীবনে প্রতি ঘটনায় প্রকৃতির বুকে বিচিত্র রহস্যলীলা। দেবতার দেব-মন্দিরে কত

অসংখ্য প্রাণ ! সবই সে আনন্দ-লীলা—সবই বিধাতার পরম সৃষ্টি। এই অনিত্য লীলাপুরেই নিত্যলীলার আনন্দ আভাসে প্রাণ মন পুলকিত। সুখ দুঃখ আমাদেরই পাপ পুণ্যের পরিণতিফল।

ধন্য সে ভাগ্যবান্ মানুষ, যাঁহার হৃদয় শান্ত গম্ভীর, কোন পরিবর্ত্তন যাঁহার হৃদয়কে আন্দোলিত করে না—যাঁহাকে কোন দুশ্চিন্তা, কোন উচ্ছ্বসিত ভাব আকুল করে না, যাঁহার হৃদয় নিবিড় শান্ত শুদ্ধ জ্যোতিপ্রভায় উদ্ভাসিত। সে নির্ব্বিকার ভাব চঞ্চল মোহমুগ্ধ মানুষের উপলব্ধি করিবার শক্তি কোথায় ?

প্রকৃতির আনন্দবুকে কি নব নব সুষমা ! মধুমাসে মঙ্গল অরুণ ঊষার কি মঙ্গল ছটা ! বালার্কের অমল জ্যোতিছটা শ্যাম কুঞ্জবনে, তার কি উজ্জ্বল কান্তি ! প্রভাত-মর্ম্মর-হিল্লোলে কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলবালার কি মৃদুমধুর লীলা, শিশিরসিক্ত শ্যামল পত্রদলের কি স্নিগ্ধ পুণ্য জ্যোতিপ্রভা ! গিরিপ্রবাহিণী স্রোতস্বিনীর সুমধুর কল্লোলধ্বনিতে পর্ব্বত বন কান্তার আনন্দে মুখরিত। উচ্চে নীচে বিহগ-কলসঙ্গীত, ভ্রমরের গুঞ্জনগান প্রাণের ঘরে কিসের ভাব যেন জাগাইয়া তোলে ! বুকের ঘরে ও কি অব্যক্ত আনন্দ সঞ্চার। তন্ময়তার ভিতর সমস্ত দেহ মন স্তব্ধ হইয়া যায়। আর

দু-নয়নে অশ্রুসলিল ঝর ঝর ধারে যখন ঝরিতে থাকে, ও কি মন্দাকিনী ধারা! তখন মনে হয় সে মঙ্গলউষায় উধাও হইয়া যাই। গম্ভীর শ্যামশোভায়, নীলাম্বরের নীলিমায়, নীলসাগরের কোন অজানা পারে যেন ভাসিয়া যাই। এম্‌নি করিয়া প্রাণের অব্যক্ত প্রেম বিশ্ববুকে ছড়াইয়া যাইতে চায়।

যখন ক্লান্ত শয়ানে অনন্ত আকাশে কাননে কান্তারে প্রকৃতির বনচ্ছায়ে শান্ত সরল গ্রাম্য ছবিতে এ দীন উদাস আঁখি উধাও হইয়া যায়, তখন কোথায় দুঃখ, কোথায় ব্যর্থ বোঝার উৎপীড়ন? সকল কোলাহল স্তব্ধ হইয়া যায়, অব্যক্ত শান্তি-প্রবাহিণী নামিয়া আসে, অশান্তিকুহেলী ঘনঘটা কোথায় অন্তর্হিত হয়! ধন্য এ শাশ্বত বিমল আনন্দ সম্ভোগ।

ধন্য প্রকৃতির শান্ত নীরব কোমল ছবি, তপ্ত বুকে কি আরাম আনিয়া দেয়! ধন্য ভক্তপ্রাণ যাঁহারা সংসারের সকল দৈন্য কোলাহলের ভিতরই শান্তযোগে যোগী হন। আর কর্ম্মপীড়িত সাধারণ মানুষ প্রকৃতির শান্ত বুকে মাথা রাখিয়া ক্ষণিকের জন্য সব ভুলিয়া যায়, কিন্তু আবার কর্ম্মস্রোতে পড়িয়া সেই দৈন্য ক্লান্তি ভোগ করে। কেন এ অশান্তির আগুন বুকে জ্বলিয়া উঠে? একি আমারই অসংযত প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল?

ভগবদ্বিশ্বাসী প্রাণ অশান্তিকোলাহলের ভিতরও শান্তি আনন্দ আরাম লাভ করিতে চায় শান্তিময়ের শান্ত সহবাসে —বিশ্বপিতা পাতা, পরিত্রাতা, দীন দুঃখী কাঙ্গালের আশ্রয়; তাই ত আশা, তাই ত দুঃখঝঞ্ঝার ভিতর আশার আনন্দ-হিল্লোল বহিয়া যায়। আজ ঘনতম অন্ধকার ছাইয়া ফেলিয়াছে, জানি আবার জ্যোতিষ্কালোকে সব হাসিয়া উঠিবে। মঙ্গলদাতা সকলের মূলে। ধনীই হই আর নির্ধনই হই, নিন্দিত হই, কি প্রশংসনীয় হই, সবই কল্যাণ লইয়া আসিবে। জানি বহির্জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত নয়, আমার অন্তর্জগতে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। যদি ঈশ্বর সহবাস আমার নিত্য সহবাস হয়, যদি শুদ্ধ মন প্রাণ হয়, জানি স্বর্গধনে বঞ্চিত হইব না।

প্রতি জীবনেই দেব আশীর্ব্বাদে এক মঙ্গলমুহূর্ত্ত আসে, যখন আপনা হইতে তার পথ কত স্নিগ্ধ সুন্দর উজ্জ্বল হইয়া উন্নত লোকের দিকে যায়। যা কিছু অর্থ উপার্জ্জন করি, যা কিছু আহার করি, পরিধান করি, কেহ আমায় প্রশংসাপত্র দিল কি না দিল, কিছুতে আসিয়া যায় না, কিছুতে অন্তরের শান্তি বিনষ্ট হয় না। যদি আমার অন্তরাত্মা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই নির্ম্মল আনন্দভোগের অধিকারী হইব।

কত উপাখ্যান মানবের ইতিহাসে, কত নিষ্কলঙ্ক নিরপরাধ সাধুজীবনে অগ্নিপরীক্ষা, উপেক্ষা, ব্যর্থ কলঙ্কদান, নির্য্যাতন নিষ্পেষণ; কিন্তু একদিন আসে যেদিন ভুল ভাঙ্গিয়া যায়, ন্যায়ের আলো জ্বলিয়া উঠে। সেদিন সে ভুলের জন্য কে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করে? কত ভুলবোঝার কঠোর বিচারে কত মানুষের দুর্ব্বল হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে! তবুও যদি হৃদয়ে শান্তি থাকে, তবে কে নিষ্পীড়িত করিবে? নীরব অশ্রুপাতের ভিতরই যদি নির্ম্মল আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারি, তবেই শুদ্ধ মঙ্গলময়ের স্বভাব লাভ হয়। তাইত সকল বেদনায় পীড়িত হইয়াও তন্ময় ভাবে সাধনা করিতে হয়, ক্ষুদ্রতার ঘন জঞ্জালরাশি দূরে ফেলিয়া নিত্য শাশ্বত আনন্দলোকে যাত্রা করিতে হয়।

শৈশবে যৌবনে বার্দ্ধক্যে সেই একই দিব্যজ্যোতি, দেব-সত্তা, জীবনে জীবনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে চায়। এই মানবের দীন যাত্রায়ও সে দিব্য-আননজ্যোতি ফুটিয়া উঠে; তাইত শুভমুহূর্ত্তে তার শুভলোকের যাত্রার আকুল আয়োজন।

জননীবুকে মাতৃস্নেহ-পীযূষধারায় কি পুণ্যধারা প্রবাহিত হয়! প্রাণপুতলীর মধুর আননজ্যোতিতে জননীপ্রাণ স্নেহচুম্বনের ভিতর শিশুর কি পুণ্যসত্তা আপন সত্তাতে

উপলব্ধি করেন! শিশুর নিত্য নূতন ভঙ্গিমার ভিতর কিসের মঙ্গল সুষমা উজ্জ্বল হইয়া উঠে? জনক জননীর এ নির্ম্মল আনন্দসম্ভোগের সঙ্গে কোন্ ঐশ্বর্য্যসম্ভোগের তুলনা হইতে পারে? দুঃখ আসে, ব্যথা আসে; শিশুর কমনীয় মুখজ্যোতিতে সকল ব্যথা হরণ করে। ভিখারীর ঘরে যে আনন্দমেলা, হয়ত রাজরাণীও সে সুখে বঞ্চিতা।

এই যে হৃদয়ের ভাবলহরী, কত ভাবে তা কর্ম্মতন্ত্রকে স্পন্দিত করে। শান্ত শুদ্ধ প্রেমের আনন্দ প্রকাশই জীবনে জীবনে। সভ্য অসভ্য সকলেই শিশুর সরল স্নিগ্ধ কোমল পবিত্র মুখজ্যোতিতে আকৃষ্ট হন। সে শুভ্র জ্যোতি যদি আশৈশব উজ্জ্বল হইয়া থাকে, তবে চিরদিনই তাহা আকর্ষণের বস্তু। মানবমন স্বভাবতই সরলতাপ্রিয়; তাই শিশুর সরল সহবাসে দেহমন সরস হইয়া উঠে। কত দৈন্য অসরলতা! তাই লইয়া কোন্ সাহসে শিশুর সম্মুখীন হইতে চাই? কত দুর্ব্বলতা, কত ক্রুটী, শিশুর নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিতে হয়।

জীবনে সকল অভিজ্ঞতার ভিতর এ কথাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে—হৃদয়ের শান্তি বহির্ম্মুখীন ধনজনে প্রতিষ্ঠিত নয়, প্রতি মানবের শুদ্ধ শান্ত স্বভাবেই তার সকল শান্তি। এক এক শুভক্ষণে আমাদের সদ্ভাবকুসুম কি মধুর

সুবাসে ভরিয়া উঠে! তখন যা কিছু ভাবি, যা কিছু দেখি, সব সুগন্ধে আমোদিত হইয়া উঠে, তখন সকল হিংসা দ্বেষ দূরে চলিয়া যায়, তখন বিশ্বের সুখদুঃখে আমার সুখ দুঃখ জড়িত হইয়া আসে। তখন সকলের আনন্দে আমার আনন্দ, তখন শত্রুমিত্র ভেদাভেদ চলিয়া যায়, তখন বিশ্বপ্রেমের নব উদ্বোধনে প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। সত্য ধর্ম্মপ্রেরণাই ইহার প্রাণধর্ম্ম; তাইত ভক্তমুখের বাণী "নির্ম্মলাত্মারা ধন্য, তাঁহাদের হৃদয়ে দেবতার পুণ্য আসন চিরবিরাজিত।"

নির্ম্মল চিত্তের নিত্য সাধনার ভিতরই শান্তি! ক্ষণে ক্ষণে সত্যভ্রষ্ট হই; তাই ত ব্যর্থ দৈন্য বেদনার বোঝা বহন করিতে হয়। বহির্ম্মুখীন জগতে শান্তি খুঁজিতে গিয়া সত্য-ভ্রষ্ট হই, অসত্যের অন্ধকারে আত্মজ্যোতি হারাইয়া ফেলি। দেখি ত সংসার চিরদিন আরাম দিতে পারে না; পাগলের মত দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া মরি—কোথায় আরাম, কোথায় আনন্দ। পরাধীনতার ভিতর স্বাধীনতা, অবিবেচনার ভিতর বিবেকের মাহাত্ম্য, ভয়ের ভিতর অভয় সত্তা খুঁজিতে চাই, তাইত এ দুর্দ্দশা! জাগুক্ প্রার্থনা—ওগো দেবতা, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত কর। দেখ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া ভাই ভাইকে কত পীড়িত করে, কত অসত্যের ভিতর দিন

যাপন করিতে হয়, হৃদয়নিভৃতে কত হিংসা দ্বেষ জটিল দ্বন্দ্ব জমিয়া উঠে! কত ব্যর্থ আকুল পিপাসায় ছুটিয়া চলি। দশের গৌরবে, ধনে ধান্যে জনে মানে সংকীর্ণ মন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। এমনি করিয়া কি নির্ম্মল আনন্দ সম্ভোগ হইবে? কোথায় হৃদয়ে সে ক্ষুদ্রাতীত শাশ্বত ভূমানন্দের আকাঙ্ক্ষা?

যদি নিত্য শান্তিলাভ হয়, তবে অপরের আনন্দে যে আমারও আনন্দ। ধন জন মানেই যদি শান্তি থাকিবে, তবে চিরদিন ধরিয়া মানুষ আর কিছু পাইতে চাহে কেন? কেন তবে এ ইন্দ্রজাল? শান্ত হও, স্তম্ভিত হও, করজোড়ে দাঁড়াও, যা ক্ষুদ্রে মেলে না, সেই ভূমানন্দের ভিখারী হইয়া এস। পরমানন্দে বিশ্বপিতার সঙ্গে শিশুর মত মুক্ত হইয়া বাস করি। বহির্মুখীন ভোগের ভিতর কেন আর ছুটা ছুটি? বিবেকের মঙ্গলবাণী শুনিয়া মঙ্গলদাতার চরণে হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করিতে শিখি। সকল দৈন্য ক্ষুদ্রতা দূর হইয়া যাক্, বিধাতার বিচিত্র দান আত্মপ্রভাবে কঠোর ব্রত পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই, সাধনার নিত্য জাগরণমন্ত্র গ্রহণ করি। দীনাত্মায় দেবজ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক্, আত্মলোক আত্মজ্যোতির ছটাতে জ্যোতির্ম্ময় হউক্।

প্রেমময় দয়াময়, তোমার স্নেহ প্রেমে সবই যদি আনন্দময়, তবে এ মৃত্যু বিভীষিকা কেন? আমি যে তোমার বরাভয় আশ্রয়ে বাস করি। কোথায় অনিষ্ট, অমঙ্গল? সকল ধনে বঞ্চিত হইলেও যে তোমার অভয় সত্তায় বাস করি। সে অধিকার হইতে কে বঞ্চিত করিবে? প্রিয়ধন সব একে একে বুক ছিঁড়িয়া চলিয়া যায়—তবু আছি সে অমৃত বুকে। মরণ সখা যে প্রাণ সখারই মঙ্গল দূত। তারই বুকে আমার সকল কিছু; সেই আশাতেই ঐ বুকেই মাথা রাখিতে চাই।

(৮)

অমৃতের আভা

রাজে রাজে বিশ্বরাজ,
মধুর মোহন রাজ;
সাজে সাজে রঙীন সাজে
মঙ্গল মধু সাজ।
যুগে যুগে নিমেষে নিমেষে,
অনন্ত সুখ গান;

দানে দানে উঠেছে ভরিয়া
তাঁহারি মধুর দান।
হাসে হাসে বিশ্ব হাসে
ওকি রে সোহাগ হাস!
গানে গানে পুলক গানে
আকুল মধুর ভাষ।
নাচে নাচে অনন্তে নাচে
নিত্য মধুর তান ;
ভাসে ভাসে অনন্তে ভাসে
গাহ অনন্ত গান।
তালে তালে নিত্য দোলায়
অসীম সাগর দোল ;
পাতে পাতে বসুধাজননী
অমৃত মধুর কোল।

—*—

আর কত কাল সইবে সখা,
সবার অবহেলা ;
হায় গো দেখ ভুলায় মোরে
মিথ্যা মায়ার খেলা!

তোমার উদার মুক্ত প্রেম
নীরবে রয় জাগি,
ক্ষমার সুরে টান্‌ছে বুকে
নিত্য মিলন লাগি।
ক্ষুদ্র আমি সীমার মাঝে
অন্ধ আঁখি মেলি,
তাই ত সখা দিন রজনী
ব্যর্থ খেলা খেলি।
কে তুমি গো ভূমা মহান্‌,
দিয়ে দহন-দোল,
দণ্ডদাতা বিশ্বপাতা
ডাক্‌ছ পাতি কোল?
রুদ্ররূপে আগুন ঢেলে
মার্‌তে পার বাণ,
কিন্তু সখা, গাহিলে ওকি
ভালবাসার গান!
ঐ বুকেতেই বিশ্ব হাসে,
তোমারি নাথ জয়,
তাইত সবার বুক ভরেছে
শান্তি সুধাময়।

যুগে যুগে ভক্ত প্রাণের আনন্দগাথার মধুর জয়সাম্য গানে গানে, জীবনে জীবনে। প্রকৃতির বিচিত্র সুষমার ভিতর কি এক পরম ঐক্যতান মঙ্গল সুরে নন্দিত হইয়া উঠিতেছে! আত্মপুরে তাঁহারই লীলা—কি অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক রহস্য! সবই রহস্যময়—অগণ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডল শূন্যে কি বিচিত্র নিয়ম-কৌশলে যথাস্থানে ভ্রাম্যমাণ! আবার অমর আত্মার বুকে এ কি ছবি? সে আনন্দ আহ্বানে সকল প্রাণতন্ত্রীকে আনন্দের সুরে রণিত করিয়া তুলিতেছে! আর অখণ্ড ন্যায়তন্ত্র সমস্ত নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, কি দ্যুলোকে কি ভূলোকে সর্ব্বত্র একই প্রাণময় সত্তা! যতই ভক্তপ্রাণের আনন্দ-কাহিনী প্রাণকে আকুল করে, ততই অনন্ত বিশ্বপ্রকাশের বিচিত্র কৌশল তাঁহারই পুলক সহবাসে হৃদয়ে মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এ ত অন্ধ শক্তি নয়।

অগণ্য জ্যোতিষ্কলোক সেই মহানেরই চিরমঙ্গল লীলা—কে তাহা বর্ণনা করিবে? অতল অসীম জ্ঞানসিন্ধু-কূলে বাস; কে লহরীলীলা গণনা করিবে? কে আমার আমিত্বের এ বিচিত্র চেতনসত্তাই বা উপলব্ধি করিবে? সবই প্রহেলিকাময়। যাহাকে তুচ্ছ বলি, তাও ত অক্ষয় অব্যক্ত মাধুর্য্যের পরিচয়। পরম জ্যোতির্ম্ময় সত্তার ভিতর দুর্ব্বল আঁখি মেলিতে চায়—ক্ষণিক দৃষ্টি সে জ্যোতিসত্তা ধারণ

করিতে পারে কই ? সসীম জ্ঞানের অন্ধ আবরণে সব আচ্ছন্ন। কতটুকু সত্যস্বরূপ দেখিতে পাই ? যাহা কিছু দেখি, যাহা কিছু শুনি, সবই সীমার সুরেই বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। তবুও অনন্তের বিশ্বাস আশা ও করুণাময়ের করুণামাহাত্ম্যেই অসীমের আনন্দ গান। এই বসুন্ধরার বুকে দুদিনের খেলা খেলিতে আসিলাম—তারও কি অনন্ত প্রকাশ ! এমনি করিয়াই দেবাদিদেবের আনন্দমহিমায় জীবাত্মার আনন্দসত্তা এই ঘন তমসাচ্ছন্ন অস্পষ্ট সসীম জ্ঞানলীলার ভিতরই বিকশিত হইবে। এই ঘন তমসাচ্ছন্ন অস্পষ্ট সসীম জ্ঞানলীলার ভিতরই অসীমের মহিমা—জগৎপাতা প্রেমদাতার অনন্ত সৃষ্টিতত্ত্ব, অনন্ত লীলাপ্রবাহ, অনন্ত বিশ্বে অনন্ত মিলন-গান। ইহকাল পরকাল সেই অনন্ত মহিমায় মহিমান্বিত।

কেমন ধীরে ধীরে বিরাটের প্রকাশ ! ক্ষুদ্র বীজদলেই প্রকাণ্ড বৃক্ষের প্রাণসত্তা। সমস্তই ক্রমবিকাশের পূর্ণতার দিকেই ছুটিয়াছে। সেই প্রাণময়ী শক্তি বিশ্ববুকে অনুপ্রাণিত, সর্ব্বত্রই তাহার প্রকাশ। দুর্ব্বল আঁখি সে পূর্ণ স্বরূপ দেখিতে পারে কই ? যাহা কিছু পরিবর্ত্তনের ভিতর চলিয়াছে, মনে করে এই বুঝি ধ্বংসলীলা। কোথার ধ্বংস ? অণুপরমাণুর বিচিত্র যোগাযোগে, সংমিশ্রণ ও বিমিশ্রণে নব নব শক্তি ও নব নব স্বরূপেই ফুটিয়া উঠিল ! এ কি

অব্যক্ত শক্তির ভিতর বিরাট্‌ বৃক্ষের কাহিনী ঐ ক্ষুদ্র বীজে সন্নিবদ্ধ! কেমন করিয়া ভূতলে নিহিত অনাদিকালসঞ্চিত ধূলিকণার ভিতরই প্রাণের খাদ্য সংগৃহীত হইয়া বিশ্ববুকে নয়নলোভন ফল ফুলে শোভিত মোদিত কুঞ্জকানন, কত গন্ধে কত বরণে কত রসে কত ছন্দে সমস্ত আমোদিত করিয়া তুলিতেছে! এই প্রাণময়ী শক্তি জড়ে চেতনে। যাহাকে অংশ বলি সে ত পরিপূর্ণের ভিতর জাগিয়া আছে, কেমন করিয়া তাহার ভিন্ন সত্তা দান করি? সকল ধ্বংস ও প্রলয়-লীলার মাঝখানেই নবতর মাধুর্য্য বিকাশেরই আয়োজন।

এই পার্থিব তনু—তাহারও প্রকাশ ত সেই চেতনময়ী সত্তাতেই প্রকাশিত! প্রতি অঙ্গে অঙ্গে সেই চৈতন্য-প্রবাহ, ধমনীতে ধমনীতে সেই প্রাণের সাড়া, জীবাত্মার দেহমন্দিরে নিত্য নূতন ভাবেই নিত্য চেতনলীলা। কোন্‌ প্রাণশক্তি শিরায় শিরায় রক্তছন্দতালে প্রাণের খাদ্য নিত্য পরিবেশন করে, তাহার শক্তি সঞ্চার করে? তাই ত তাহার নয়নজ্যোতিবিন্দুর ভিতর ভুবনমোহন দৃশ্যমাধুর্য্য ফুটিয়া উঠে, তাই ত তাহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় সানন্দে বিশ্বের আনন্দগন্ধ সম্ভোগ করে। বিশ্বের সমস্ত রূপ রস গন্ধ প্রতি ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের ভিতর জীবাত্মাকে কেবলই আনন্দে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতেছে। আর যেদিন এ খেলা

ফুরাইয়া যাইবে, সে দিনও জ্ঞানময় আত্মা পরমজ্ঞানময়েই জাগিয়া থাকিবে, আর ধূলির দেহ ধূলিতেই পরিণত হইবে।

যেমন চেতনের আনন্দ প্রকাশ জড়ের বিচিত্র উপাদানে, তেমনই অমর আত্মার প্রাণসত্তা ঐ পরম প্রাণেই! কোথায় তাহার অনন্ত নিদ্রা? কোথায় মৃত্যু? মৃত্যুর ভিতরই অমৃতত্বলাভ। জীবন হইতে নব জীবনে অধিকতর সৌন্দর্য্যপরিপূর্ণ প্রকাশের ভিতরই প্রকাশবান্। বিনাশ কোথায়? এ ত কেবল ক্ষণিক পরিবর্ত্তন! যে ফুল ঝরিয়া পড়িল, সে বসুধাবুকে ভবিষ্যতের প্রাণসঞ্চয়ের আয়োজন করিতে চলিল। তেমনই এই চেতনশক্তি বিধাতার অনন্ত বুকে অক্ষয় নিয়ম পালন করিয়া অনন্ত চৈতন্যপ্রবাহে দেহের আবরণ মুক্ত করিয়াই ছুটিল অনন্তলীলাসাগরে।

সসীম দৃষ্টি অসীমের শক্তি দেখিবে কেমন করিয়া? কোন্ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দূরাদপি দূরস্থ জ্যোতিষ্কলোকের সীমা নির্দ্ধারণ করিবে? অথচ এই সসীম প্রকাশেই অসীমের আলো জ্বালাইয়া দিয়া যায়। কি দ্রুত স্পন্দনের ভিতর আলোকস্পন্দন বিশ্ববুকে খেলা করে! গ্রহ উপগ্রহ অগণ্য অগ্নিগোলককুণ্ডে এক হইতে আর এক বিচিত্র আলোক-স্পন্দনলীলা চলিয়াছে, কে তাহার দূরত্বের মহিমা বর্ণনা করে? নক্ষত্রমালা জ্যোতিষ্কসভায় কেমন ঝক্ ঝক্ করে,

কোন্ ঊর্দ্ধলোকে তাহার বসতি কে জানে? কত কোটি কোটি শশী ভানু কে জানে কেমন করিয়া বিরাটের প্রাণগর্ভে জাগিয়া আছে, আজও তাহার আলোকস্পন্দন-প্রবাহ বিশ্ববুকে নামিয়া আসিল না! এ কি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড! কতটুকু দেখিলে মানুষ? গণিতের গণনা-সাহায্যেই অগণ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলের গণনা করিতে গিয়া স্তব্ধ হইয়া যায় ক্ষুদ্র মানবজ্ঞান! চলিয়াছে খরতর গতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলে,—কে নিয়ন্ত্রিত করে; অথচ এ নৃত্যতালের ভিতর এ কি শান্তস্বরূপসত্তা! দেবাদিদেব মহাদেবের বিচিত্র সিংহাসনতলে কোটি শশীভানুর অনন্ত আরতি। ধন্য আদি কবির কবিত্বমাধুরী, আর ধন্য মানবকবির সৌন্দর্য্যবর্ণনা। সুদূরাদপি সুদূরে বাস করিয়াই ভূলোক দ্যুলোক এক প্রাণময় নিবিড় আকর্ষণে আবদ্ধ—তাই চন্দ্রমার আকর্ষণে সিন্ধুবুক উদ্বেলিত হইয়া উঠে! ভাষার সাধ্য কোথায় প্রকাশ করে সে অনন্ত মহিমা! আবার খণ্ড খণ্ড প্রকাশেই অখণ্ডের বিচিত্র প্রকাশ। হায়! হায়! বসুধাজননীর বুকে বাস করি, স্তনসুধা পান করি, ভোগ করি, লীলা করি, জানি কতটুকু? অনন্ত অস্তিত্বের মাঝখানেই অনন্ত মন্দিরের আমিও দীন প্রজা। প্রতি জীবনের জীবননাথ যে বিশ্বনাথ সকলেরই সঙ্গী সাথী। প্রতি মুহূর্ত্ত

মাস বৎসর সব অনন্ত কালসূত্রে গ্রথিত। বিশাল জলধি-বক্ষে প্রতি জলবিন্দু তাহার খণ্ড প্রকাশ—কে স্বাতন্ত্র্য দান করিবে? অথচ স্বতন্ত্র মহিমার ভিতরই পরিপূর্ণের অনন্ত অস্তিত্ব।

যখন সকল শক্তি পরাহত হয়, যখন বৈজ্ঞানিকের দীন আবিষ্কার স্তব্ধ হইয়া যায়, তখন বিস্মিত প্রাণ করজোড়ে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি দিতে অবনত হইয়া পড়ে।

বিশ্বময়ের বিশ্বগান আমারই হৃদয়বীণাতে বাজিয়া উঠিল? ওগো! কি অব্যক্ত তার সুরের মূর্চ্ছনা! এ কি অনন্ত যোগসম্মিলন! অনন্ত জ্ঞানসিন্ধুকূলে এ কি দুর্ব্বল অজ্ঞানের স্তম্ভিত জাগরণ! যুগ যুগান্তর বিকশিত এ কি অনন্ত মাধুরীছটা! ক্রমবিকাশের নিত্য নব উদ্বোধনে নিত্য মঙ্গলবিকাশ. সহজ হইতে বিচিত্রে, কদর্য্য হইতে সৌন্দর্য্যের বিমল জ্যোতিসত্তা। যে দিকে চাই, সে দিকেই সে বিকাশ-তত্ত্ব। উদ্ভিজ্জগৎ, প্রাণীজগৎ, সর্ব্বত্রই সেই পূর্ণ মঙ্গলেরই আনন্দ মাধুর্য্যমহিমা। কেমন করিয়া ধারাবাহিক লীলা চলিয়াছে। ধীরে ধীরে আজ অমর আত্মার মঙ্গল জ্যোতি-মহিমা কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিল কে জানে? আবার যুগযুগান্তর ধরিয়া ভবিষ্যতে কি পরিপূর্ণ মঙ্গলসুষমা উজ্জ্বলতম হইয়া উঠিবে কে বলিবে? এই কি দেবলীলা,

শেষ গতি ? কে জানে কোন্ বিচিত্র লোকে বিচিত্র দেবের সৃষ্টিকাহিনী জাগিয়া উঠিবে ? অনন্ত উন্নতি,—ধূলিকণা হইয়াই বিশ্বপ্রবাহে ছুটিয়াছি। কে জানে, কেমন করিয়া আনন্দময় পবিত্র পুণ্যকাহিনী লোক লোকান্তরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে ?

দেবতার আশীর্ব্বাদে কত দেবত্বলাভ, আর দেবদেবীর শান্ত সুনির্ম্মল আনন্দসত্তা ! অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অসীম রহস্য কে ভেদ করে ? ক্ষুদ্র তৃণ আমি কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছি এ অনন্ত প্রবাহে ? এ কি চির চেতনাময় জাগরণ ! ক্ষুদ্র ঘরে বাস করি, তবু ক্ষুদ্র বুকেই অসীমের ছটা ? আমার চেতনাজ্যোতি মধ্যে এ কি দেবত্বমহিমা !

এমন বিচিত্র অধিকার, দেবতার দান, অনন্ত জীবনলাভ ! আমি কোথায় ? কেন আমার বেদনার গান ? কেন তবে পশুপ্রকৃতির এ অসহ্য তাড়না ? আত্মশক্তিপ্রভাবে অতীন্দ্রিয় শাশ্বত-লোকে ছুটিয়া চলি কেমন করিয়া ? সব জানিয়াছেন আমার অন্তর্য্যামী। সে অনিমেষ আঁখি যে দৃষ্টি রাখিয়াছে এ ক্ষুদ্র আঁখিতে, আর কেমন করিয়া ভালমন্দ গোপন করি ? সমগ্র কালের লীলা আমি কেমন করিয়া জানি ? কি জানি ভবিষ্যতে কি কল্যাণমহিমা অপেক্ষা করিতেছে ? জানি বিশ্বকল্যাণ কল্যাণের পথেই লইয়া চলিয়াছে। সত্যন্যায় দেবতার অধিকার লাভ হইবে,

তাই ত দিনরজনী এ সংগ্রাম সাধনা—কেন ক্ষুদ্র পার্থিব নিন্দাপ্রশংসায় আন্দোলিত হই? কবে নিন্দাপ্রশংসার ঊর্দ্ধে শান্তলোকে, দেবলোকে, অগ্রসর হইব? কবে শুদ্ধ হইব, মুক্ত হইব, কবে শত ঐহিক বাসনার ঊর্দ্ধে ভক্ত প্রাণের আনন্দগান গাহিয়া যাইব? কবে সখার আনন্দ মুরলীধ্বনি আমায় মুগ্ধ করিয়া তুলিবে? হায়! হায়! ক্ষুদ্র জ্ঞান ক্ষুদ্র বিচার বুদ্ধি সসীমের জটিল জালে আবদ্ধ, প্রেমময়ের অনন্ত প্রেমতত্ত্ব বুঝিল না! ওগো আমার দেববালা, এস এস, আনন্দ আলো জ্বালাইয়া এস, এ অন্ধ যাত্রীকে সত্য পথে লইয়া চল। বলদাতা, বল দাও, এ আকুল পিপাসা অমৃতের আস্বাদনে ভরিয়া দাও—রিপুপরতন্ত্রতা হইতে রক্ষা কর, যদি দেবত্বের অধিকার দিলে তবে দুর্দ্দিনে পরিত্যাগ করিও না। সত্যধনে সমস্ত উৎসর্গ করিবার শক্তি দাও। ওগো চিরবাঞ্ছিত! এ দীন লাঞ্ছিতের প্রতি কৃপা কর। ওগো পুণ্যময় জ্যোতির্ম্ময়! প্রেম-উৎস! শান্ত পূর্ণ ব্রহ্ম! ঐ প্রেমে দীক্ষিত কর—তোমারই হই, তোমায় ভালবাসি, অনন্ত প্রেমের জন্য লালায়িত কর। একবার যদি ও প্রেমরসে মজিতে পারি তবে ত এখানেই স্বর্গ; যদি প্রাণব্রহ্মে প্রাণ সঁপিয়া দিই দুঃখ কোথায়?

(৯)

বিদেহী মেলা

অনাদি আনন্দ বুকে
জাগে বিশ্বমধুরিমা,
সৃষ্টির মহান্ মন্ত্র
কি বিচিত্র সে মহিমা!
ক্ষুদ্র নর ঘু'রে মরে
জ্বালিয়া জ্ঞানের বাতি,
প্রকৃতির প্রাণমন্ত্র
খোঁজে শুধু দিন রাতি।
হেথা হোথা যাহা কিছু
ফুটে ওঠে জ্যোতি-রেখা,
অমিয়-আলোক হাসে
তোমারই করুণালেখা।
জ্যোতির সাগরে জ্বলে
আমারি জ্যোতির বিন্দু,
তোমারি নয়ানে ভাসে
আনন্দে হসিত ইন্দু।

তোমারি নয়ানে জাগে

বিকসিত ফুলবালা,

সাগর শ্যামল কুঞ্জ

সকলি মধুর আলা।

তব নামে নামী হ'য়ে

হাসে সবে নামে নামে,

তোমারি গানের সুরে

ছুটি চলে প্রেমধামে।

প্রাণপুরে জেগে ছিল

সংশয়কুহেলী ঘোর,

তোমারি অমৃতালোকে

কেটেছে আঁধার মোর।

ভাল মন্দ যাহা কিছু

বাজে সব তব সুরে,

আদি অন্ত সবই বঁধু,

জাগে তব প্রাণপুরে।

অসীম জ্ঞানের খনি

গম্ভীর বিরাট্ সিন্ধু,

চঞ্চল চকিত চিত্ত

অণু পরমাণু বিন্দু।

করজোড়ে নত শির
স্তম্ভিত আকুল মন,
অপার মহিমা মাঝে
কি যে মাগে, কি সে ধন!
ইচ্ছার জলধি-বুকে
ভেসে যাই তৃণ আমি,
বাজে বুকে বাজে ব্যথা,
তবু জাগি দিবাযামি!
গেয়ে যায় দেবদেবী
তোমারি মহিমা গান,
কোথা আদি কোথা অন্ত,—
—ধন্য সখা তব দান।

চিরদিন দেবস্বভাবপিপাসু মানবপ্রাণ তার ক্ষুদ্র সংসারেই মানবীয় ভাবের ঊর্দ্ধে সাধু সাধ্বী দেবদেবীগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে চায়, আর পূজার অঞ্জলি তাঁহাদের চরণে নিবেদন করিতে চায়। যতই জ্ঞান বিকশিত হয়, যতই দেশে কালে বিচিত্র লীলা দর্শন করে, ততই দেখে কোথাও শূন্যতা নাই—অনন্ত সৃষ্টিতন্ত্রের ভিতর সমস্ত নিয়ন্ত্রিত। ক্ষুদ্র হইতে মহানেরই অভিব্যক্তি, এক প্রাণধারা মঙ্গলসুষমায় সমস্ত বিকশিত করিয়া তুলিতেছে।

এই ক্রমবিকাশতত্ত্ব স্বতঃই এক প্রশ্ন জাগ্রত করে। যদি এ লোকেই এই ক্রমবিকাশছন্দ না জানি আবার ঊর্দ্ধ লোকে তার কি নব নব স্তরে নব নব প্রকাশ। কে অখণ্ড তত্ত্ব অবগত হইবে? ধীরে ধীরে চলিয়াছে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধ স্তরে, যতই গভীর হইতে গভীর সৃষ্টিতত্ত্ব পাঠ করে মানুষ, ততই অসীম রহস্য জাগিয়া উঠে। আপন ক্ষুদ্র বিন্দুর ভিতরই দিশাহারা হইয়া যায়। কোথায় আমি? কোথায় তিনি? আমি কি বুঝিতে পারি সে ফাঁকের সুর? অথচ আমার গানেও যে কি সুর বাজে যেন শুনি। প্রকৃতির গানও যে সেই যোগের সুরেই গাহিয়া উঠে। তবে আমি আর তাঁহার মাঝেই কি শুধু ফাঁকের সুর বাজিতে থাকিবে? তাঁহার আর আমার মাঝখানেই কি নিবিড় শূন্যতা?

গ্রহ উপগ্রহ বিশ্বসুরে বাঁধা, সব ছুটিয়া চলিয়াছে লক্ষ্য-পথে, নিয়ত ঘূর্ণায়মানচক্রে সব বাঁধা। তেমনই কি বিচিত্র তারতম্যে মানবপ্রকৃতির বিচিত্র অবস্থান! সাধু সাধ্বী ঊর্দ্ধাসনে উন্নত-প্রকৃতিমনা দেবদেবীর পদে অভিষিক্ত কিন্তু কোন্ প্রকৃতি লাভ হইলে সে বরণীয় আসন লাভ হইবে? কোন্ গুণে দেবতার বরপুত্র হইব, নিত্যানন্দের অধিকারী হইব?

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই দেবত্বলাভ, বরণীয় ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির কথা বলে, এক অক্ষয় আনন্দের কথা প্রচার করে,

বিশ্বপ্রেমের কথা বলে, আর প্রেমে গদগদচিত্ত ব্রহ্মালোকের শাশ্বতজ্যোতি দর্শন করিয়া চিরকৃতার্থ হয়। জানি না সে দেবলোক, সে দেবাসন, সে দেব মর্য্যাদা, দেবদেবীর বিচিত্র মহিমা; কিন্তু জানে মানুষ জাগ্রত সাধনবলেই বিচিত্র দেবত্বমহিমা সে লাভ করিবে। যতই ব্যর্থ হই, ক্লান্ত হই, সেই আদর্শে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। স্থাবর জঙ্গম, খেচর ভূচর, জড়ে চেতনে, এক মহীয়সী শক্তিরই অনন্ত লীলা। যাকে তাপ বলি, এ কি শক্তি? এ কোন্ অদ্ভুত শক্তির সঙ্কোচন প্রসারণে জ্যোতিরহস্যের ভিতর স্পন্দনমহিমায় নয়নে জ্যোতিসত্তার জন্মদান! কেমন করিয়া চুম্বুক লৌহকে আকর্ষণ করে? কেমন করিয়া দিগ্দর্শন যন্ত্র সুনির্দ্দিষ্ট রেখার সাহায্যে ঘন ঘোর ঝঞ্ঝাবাতের ভিতরও দিক্ নির্ণয় করে?

এই যে বিজলী খেলা—কখনও জলদমালায়, কখনও সিন্ধুবুকে, কখনও জীবদেহে—এ কোন্ শক্তিপ্রবাহ? কি প্রাকৃতিক, কি চেতনশক্তি, সবই ত বিচিত্র। অতীন্দ্রিয় রহস্যের মাঝখানেই ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অপূর্ব্ব পরিচয়। প্রাণ-ময় আত্মকাহিনীও এই কর্ম্মকাণ্ডের ভিতরই জাগ্রত।

কেমন করিয়া অন্ধ শক্তি প্রকৃতির বুকেই নানা সংগ্রামের ভিতর আপন নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিতেছে? কেমন

করিয়া অগণ্য জ্যোতিষ্কলোক আমাদের দীন নয়নজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে? যাকে বলি জড় অচেতন, তাওত বিচিত্র স্পন্দনের ভিতর জাগ্রত! তেমনই ইন্দ্রিয়াতীত পরম জ্ঞানও ইন্দ্রিয়জ্ঞানরহস্যেই প্রাণময়ী।

প্রকৃতির বুকে সেই একই অব্যক্ত প্রাণময়ী শক্তির বিচিত্র প্রকাশ বিশ্বপ্রকাশে প্রকাশিত। কে জানে ইহা কেমন করিয়া নিত্য নবীন মাধুর্য্যে হাসিয়া উঠিতেছে? তেমনি আমাদের অস্তিত্ব-লীলাও দৈনিক লীলাছন্দের ভিতরই ফুটিয়া উঠিতেছে।

যাহাকে জড়শক্তি বলিতে চাহে মানুষ, তারও বা কি মনোহারিণী লীলা! জড়রূপখানির রক্তছন্দে কি প্রাণছন্দ অঙ্গে প্রত্যঙ্গে লীলালাবণ্য ভরিয়া তুলিতেছে! কেমন করিয়া উদ্ভিজ্জ পদার্থই আমাদের ধমনীতে ধমনীতে রুধির ধারায় রঙীল লীলা মাহাত্ম্য প্রচার করে! এক এক ভাবে সে শক্তির বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিতেছে। প্রতি ভিন্ন বীজ পত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণগত বিশেষত্ব। এ কোন্ ঐন্দ্রজালিক প্রাণ-শক্তি যাহা বিশেষ বিশেষ প্রাণকোষকে বিশেষ বিশেষ রূপ রস গন্ধ মাধুর্য্যে প্রস্ফুটিত করিতেছে? কেমন করিয়া একই জল একই আলো বাতাস মৃত্তিকার উপাদান হইতে এক একটী বৃক্ষের বিচিত্র স্বরূপ ফল ফুল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিকশিত

হইয়া উঠিতেছে? কেমন করিয়া বা অস্থি মজ্জা রক্ত মাংস গড়িয়া উঠিতেছে, কেমন করিয়া ধমনীতে ধমনীতে রক্ত-ছন্দ নৃত্য করিতেছে, সমস্ত দেহ যন্ত্রে কি অদ্ভূত রসায়ন-তত্ত্ব এক সাম্য ছন্দে সমস্ত নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। কে জানে বা কে দেখে? তেমনি অজানার গোপন ঘরেই অজানা আমি দেহমন্দিরে বাস করি, চেতনলীলা সাধন করি। চৈতন্যময়ী আমিত্বের দিব্য বিভা, আলো বাতাস উত্তাপ সকল শক্তিতেই এক অব্যক্ত ইন্দ্রিয়াতীত সত্তালাভের কথাই চুপে চুপে জানাইয়া যায়। এই আকাশ জল বাতাস আলো সমস্ত জড় জগৎ কেমন অজানার গোপন লীলার ভিতরই প্রাণের খেলা খেলিয়া চলিয়াছে! সমস্ত একই প্রাণযোগে যুক্ত।

সৃষ্টিলীলায় ঐ একই কথা। আমার দেহযন্ত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নিত্য নূতন লাবণ্যমহিমায় কেমন করিয়া চেতনার আনন্দগান বাজিয়া উঠে। বৃক্ষের জীবন আছে, জীব-গণেরও জীবন। আবার মানবপ্রাণে চেতনপ্রবাহের ভিতর এ কি আত্ম-অনুভূতি, ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, বিষাদ আনন্দ, নিত্য অনিত্যের জ্ঞান তার ইচ্ছাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে! সে ইচ্ছাশক্তির কর্ম্মকাণ্ড উদ্ভিদ্ প্রাণলীলায় কোথায়? তাই উদ্ভিদ্‌প্রাণের উচ্চ স্তরে জীবচৈতন্য আবার অন্ধ-

চৈতন্যের উর্দ্ধতম স্তরে আত্মজ্ঞানের বিচিত্র সত্তা। অথচ সব একই চৈতন্যের নিয়মমঙ্গলে নিয়মিত। যে অখণ্ড নিয়মে উদ্ভিজ্জগৎ অজানার ভিতরই আকাশ জল মাটী আলো বাতাস হইতে প্রাণের রস গ্রহণ করিতেছে, অর্জ্জন বর্জ্জনের ভিতর দিয়াই চেতনার আনন্দ সুষমা ফুটিয়া উঠিতেছে, সেই অখণ্ড নিয়মেই অগণ্য জীবজগৎ প্রাণগত স্বভাবের দাস হইয়াই তার নিত্য কর্ম্মসাধন করিয়া চলিয়াছে, অথচ প্রতি স্বাভাবিক নিয়মতন্ত্রের ভিতরই বিশেষত্বের অস্তিত্ব জাগিয়া উঠিতেছে।

আবার এই জীবজগতের অন্ধ চেতনলীলার মধ্যে জীবাত্মার জাগ্রত চেতনসৌন্দর্য্য কি অতুলনীয়! কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি নয়, কেবল বাসনা কামনার দাসত্ব নয়, আত্ম বিচারে ভাল মন্দ হিতাহিত উপলব্ধি, যাহা কল্যাণ সে পথেরই অনুসরণ কত ভাবে সে বুদ্ধির বিকাশ, কত ভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীকে নিত্য প্রয়োজনে ব্যবহার, কত উন্নতি সাধন, কত কৃষিকার্য্য, কত নিত্য নূতন বিজ্ঞানচর্চ্চা, উর্দ্ধে জ্যোতিষ্কলোকের কত বিচিত্র জ্ঞানসঞ্চয়, আবার আত্মজ্ঞানে দেহাতীত ধর্ম্ম দেবত্বের আনন্দস্বরূপ মাধুর্য্য লাভ করে।

সাধারণ জীবজগতে কই সে আত্মতত্ত্ব? একটী মানব-শিশুর যে আত্মপ্রভাব তা পশুপ্রাণে কই সুপ্রতিষ্ঠিত?

পশুজগতে ইচ্ছা আছে, কিন্তু সে ইচ্ছা ইন্দ্রিয় লালসা-সাপেক্ষ, দেহধর্ম্মেই অনুস্যূত। আর, মানবাত্মার লক্ষ্য কি কেবল দেহধর্ম্ম সাধনেই? ভালমন্দ হিতাহিত বিবেচনার অধিকারে তাহার বিশেষত্ব স্বাতন্ত্র্য তাহাকে দেবত্বের অধিকারী করে। এত বড় অধিকার মানবের! হায়! হায়! তবুও লক্ষ্যভ্রষ্ট মানুষ ক্ষুদ্র পশুত্বের দাস হইয়া অন্ধ কারাগারে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে? এই বিশেষত্ব যখন লাভ হইয়াছে তখন আর কেমন করিয়া বাসনার মোহশৃঙ্খলে অমৃত সত্তা ভুলিয়া যাইবে? কেন এ আত্মিক রহস্য কে বুঝিবে?

এ উন্নত ভাব, উন্নত প্রকাশ, এ কি এ জীবনেই অবসিত? তাহার এ ক্ষণিক আয়োজন কেন? জগতের যাহা কিছু সর্ব্বত্রই অনন্তের ছাপ—আর মানবাত্মার এই বিচিত্র স্বরূপই কি অনিত্য?

প্রাণ যে চাহে অনন্তে উধাও হইতে—দেবসঙ্গ, উন্নত প্রেম, অনন্ত জাগরণ লাভ করিতে। কেবলই উন্নতি জগৎ বুকে—খনিজ পদার্থের প্রকাশ, তারপর উদ্ভিদ্ জগৎ, তারপর প্রাণীজগৎ, তারপর জীবাত্মা, আরও উর্দ্ধে আবার দেবাত্মার শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ। এ কি অধিকার! নশ্বর জগতের প্রজা হইয়াও সেই দেবলোকের আভাস আমাদের হৃদয়ঘরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। যতদিন দেহের ঘরে আছে, মানুষ রূপ

রস গন্ধের ভিতর জ্ঞান সঞ্চয় করিতে করিতেই আত্মজগতে আত্মার সূক্ষ্ম মহিমা লাভ করিয়া চলিয়াছে।

এই ক্ষুদ্রের এ মহিমা! সীমার ঘর ভাঙ্গিয়া অসীমে ছুটিতে চাহে। ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের ঊর্দ্ধে শান্ত অতীন্দ্রিয় শুদ্ধ সুনির্ম্মল লোক লাভ করিতে চাহে। অপেক্ষা করিতেই হইবে; যখন বিশ্বদেবতা বরণ করিয়াছেন, আনন্দকুঞ্জে আহ্বান করিয়াছেন, দেব-অংশে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন দেবতার দেশে যাইতেই হইবে।

প্রাণসুন্দর, সত্যই সত্যই এ কি সৌভাগ্য হইয়াছে? আমি কি তার যোগ্য? আমার সে শক্তি কোথায়? আমি কেমন করিয়া বাসনা কামনা জয় করিয়া আত্মজ্যোতি তত্ত্ব লাভ করি? কি করিয়া রাগ হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া গিয়া শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হই! হে পরমাত্মন্! তোমারই বিধান মানিয়া চলিবার শক্তি দাও। আমি কই তোমাধনে পিপাসু? প্রেমেই সব সম্ভব।

হে বিশ্বপিতা পরম প্রিয়! আত্মা যে আজ পিপাসু হইয়াছে, প্রাণ যে চায় শাশ্বত লোক, তবে আমি কই সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত? মৃত্যু! ওগো আমার চেতনাময় আত্মার মৃত্যু কোথায়? না জানি এ জীর্ণ তনুর পরম মুক্তির ভিতর কি জ্যোতির্ম্ময় সত্তা! এ কি চেতন আলোক!

আমার বিনাশ কই ? যখন দেহ ভাঙ্গিয়া গেল, ভগ্ন যন্ত্র কর্ম্মে অক্ষম হইল, তখনই করুণাময়ের অপার করুণায় তাঁরই অখণ্ড প্রভাবে, আবার দেহমুক্ত আত্মা আনন্দে সচ্চিদানন্দ আকাশে বিহার করে—দেহ কোথায় উধাও হইল। আর আত্মসুন্দর আত্মজ্যোতিতে হাসিয়া উঠিল।

প্রাণ সুন্দর, তাই জ্যোতির্ম্ময় মৃত্যুবিদায়বাসরেই আনন্দ-গান গাহিয়া যাই। এবার মুক্ত আত্মা দেবলোকে যাত্রা করিয়াছে। দেবাদিদেব আশীর্ব্বাদ কর। দেবসভা অমর সভায় শান্ত হইয়া বসি, সেখানে আমার প্রিয়ধনেরা বসিয়াছেন—কত তাঁরা উন্নত পবিত্র যোগাসনে উপবিষ্ট। ওগো আমিও আজ মুক্ত; তাইত এই আত্মোৎসব মিলন-সভা।

(৮০)

মৃত্যুঞ্জয়

কে তুমি গো ভূমা মহা
অনন্ত মহান্,
তবু আমি হোতে চাই
তোমারি সমান।
অমৃতা অমর নাম
জেগে আছে বুকে,
তারি সাথে মরে যাওয়া
সব গেছে চুকে।
বাজে বুকে দিবা যামি
কত ব্যথা নিতি নিতি,
বেদন-ঝঙ্কারে জাগে
কত দুখ, কত ভীতি।
হিমানীর হিম শেষে,
মধু দূতী আসে হেসে,
চুমাটুকু দিয়ে যায়,
না জানি সে কি আবেশে!

বসুধা বাসন্তী রাগে
সাজে সবে প্রেম-সাজে,
চ'লে গেল হিম মোহ,
বাজে, ও কি গান বাজে ?
তেমনি গো দ্বন্দ্বমোহ,
রচিয়া বিষম ফাঁদ,
ঢাকে যবে দিনশেষে,
হেসে এল প্রেমচাঁদ।
আকুল জাগানো সুরে
সখা যে ডেকেছে মোরে,
ছুটি তাই প্রাণপুরে
জেগে উঠি ঘুম-ঘোরে।
বুক কাঁপে গানে গানে,
কেন গো আপন ঘরে
এমনি জটিল দ্বন্দ্ব,
ভুল বুঝে কেঁদে মরে !
বঁধূ মোর এলে কি গো,
আকুল মধুর সাজে,
দিন রাত চেয়ে থাকা
বড় ব্যথা বুকে বাজে।

ছেড় না ছেড় না আর,
আকুল আঁধার পথে
সাথে সাথে থাক, নাথ
আমারি জীবন-রথে।

ধরণীর বুকে মানবের এই তনুখানি হইতেছে তাহার শুভ্র আত্মারই স্বচ্ছ আবরণ। দেহ ও আত্মার এ কি সম্মিলন! পরমাত্মার মঙ্গল ইচ্ছায় জীবাত্মা দেহের ঘরে বসিয়াই চৈতন্যে অনুপ্রাণিত; তাইত পার্থিব লীলাঘরেই তার এত লীলারঙ্গ! ধমনীতে ধমনীতে আনন্দছন্দ ঢালিয়া দিতেছে, দেহ ও আত্মা মেশামিশি হইয়া চৈতন্যের লীলা সাধন করিতেছে। দৈহিক যন্ত্রপ্রভাবে বহির্জগতের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের মহামহিমায় জীবাত্মা অন্তরে ও বাহিরে অদ্বৈতজ্ঞানের মহিমা উপলব্ধি করিতেছে। যখন দেহ ভাঙ্গিয়া যাইবে—তখন মুক্ত আত্মা সংসারের ধূলি ঝাড়িয়া অনন্তে উধাও হইবে। এই পরম মুক্তির নামই কি মৃত্যু?

দেহখানি যেন ক্ষণভঙ্গুর স্বচ্ছ আবরণ। প্রতি কর্ম্মক্ষেত্রে এই জীবাত্মা আর এই তার আবরণের নব মহিমা। যাকে প্রেম বলি বা অপ্রেম বলি তার দেহের ঘরে স্থান কই? এ ত আমি জ্যোতির্ম্ময়ী অমৃতময়ী চেতনাময়ী আমি। কখনও ক্ষীণ শান্ত স্নিগ্ধ করুণ অমিয়বচনে প্রাণের অমৃত

স্নেহ প্রেম সিঞ্চন করি। আবার কখনও অন্ধ হইয়া, ক্ষুব্ধ হইয়া উত্তেজিত হই। আর এই আমারই রসনায় কি কর্কশ মর্ম্মবিদারী বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিয়া লজ্জা ও ধিক্কারে আপনার সর্ব্বনাশের ব্যবস্থা করি। সাহস, ভয়, লজ্জা, বেদনা, আনন্দ সবই ত আত্মানুভূতি। কেবল দেহ-যন্ত্রে নানাভাবে তার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠে। যে দিন দেহমুক্তি হইবে, সে দিন দেহ জীর্ণ বস্ত্রের মত পরিত্যক্ত হইবে, ভস্মমুষ্টিতে পরিণত হইবে। হায় রে হায়! এই ভস্মমুষ্টিতেই কি আমার বিচিত্র জাগরণ-লীলাপর্ব্ব সাধন হইয়াছিল? এ ত ভাবিতেও পারি না।

তবে কি আমি রূপখানিই ভালবাসি না ঘৃণা করি? কোথায় ভালবাসার উৎস? ভাবিয়া চিন্তা করিয়া যখন দেখিতে যাই দেখি আত্মসত্তাতেই এই ভালবাসার জন্ম, প্রেমজ্যোতিতেই তার মুগ্ধ সত্তা। তাইত জীবাত্মা যখন দেহের ঘরে বাস করেন কত প্রেমপূজা! আর যে দিন মৃত্যু—যে দিন মলিন দেহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া পাখী উড়িয়া গেল, সে দিন সে দেহে কই সে ভাবপ্রবণতা—কই সে প্রেমোচ্ছ্বাস, আর অপ্রেমেরই বা কই সে ভীরু তাণ্ডব প্রতাপ?

তবেত রূপের ঘরে আমার ভালবাসার নিত্য বসতি নয়। আত্মজ্যোতিতেই সকল প্রাণের ইতিহাস; যতক্ষণ আত্ম-

সুন্দর দেহমন্দিরে বিরাজ করেন তার যত কিছু আয়োজন, ততক্ষণ তার দেহের বিচিত্র অঙ্গনে কত আনন্দ উৎসব মেলা ; কত সতর্কতা, কত লুকোচুরি, কত ধূলি, কত কালি, কত প্রতারণার ব্যর্থ প্রয়াস। দেবতার মঙ্গল বিধানেই— জীবাত্মার এ রূপের সাজ, তাইত রূপের সঙ্গে এম্‌নি করিয়া প্রাণময় মেশামিশি, কি নিবিড় প্রণয়! তাই তার বিরহ-আশঙ্কায় কত ভীতিমোহ জাগিয়া উঠে।

মৃত্যু আবার তবে কি? এই রূপের আবরণ উন্মোচন করিয়া অরূপ সত্তা লাভ কি? এ দেহ কি বিনাশের পথে যাইবে? কই তাহা ত যায় না—যাহা হইতে গড়িয়া উঠিল এই পঞ্চভূতের দেহ, সেই পঞ্চভূতেই ত পরিণত হয়! কোথায় ধ্বংস? মুক্ত আত্মা কি তবে ঘুমাইয়া পড়িলেন স্রষ্টার সৃষ্টিলীলার ভিতর? কেমন করিয়া তাহা হইবে? ধূলিমুষ্টির যদি বিনাশ নাই, তবে যাহার চেতনস্পর্শে এই ধূলার ঘরে এত সাজ, এত লীলা, তাহারই মরণ কখনও সম্ভব? বিশ্বাস করি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা, অনন্ত সত্তাতেই প্রতিষ্ঠিত অনন্ত জীবন। ধূলার আবরণ উন্মোচন করিয়াই স্রষ্টা পাতা বিধাতার অনন্ত সত্তাতেই জাগ্রত। তিনি স্রষ্টা, তিনি বিনাশের জন্য সৃষ্টি করেন নাই; তাইত মৃত্যুভয় চলিয়া যাইল সংসারে, অভয়

পিতার আনন্দ সহবাসের ভিতরই জীবাত্মা আনন্দে অভয়ধামে যাত্রা করিয়াছেন।

তবে কেন এ যবনিকা? এত ক্রন্দন? রূপের ঘরে এমন করিয়া মুগ্ধ করিয়াছেন যে তাহার বিরহ বিচ্ছেদ অসহ্য হইয়া ওঠে। এই ভয়াবহ মৃত্যুময় সংসারে কে দিল এ মৃত্যুঞ্জয় বর? কাহার শক্তিপ্রভাবে আনন্দে ভব-পারাবার পার হইবার আয়োজন। তাইত এ লীলাযজ্ঞে কত দেহের নিত্য আহুতি। মানবজীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাসে কত প্রতারণা, কিন্তু মরণপথের যাত্রীর বুকে আর কই প্রতারণা? চলিয়াছে অনন্তযাত্রী অনন্তের পথে। কোথায় গেল তাহার ভীতিচঞ্চল কম্পিত ত্রাস? ও কি আনন্দ আবেশ! আঃ, দেহমুক্তির আনন্দ আরাম, শান্ত বিরামের কি অব্যক্ত অনুভূতি হিমশীতল বদনখানিতে ফুটিয়া ওঠে! ঐ মৃত্যুপীড়িত মুখমণ্ডলে কি শান্ত মাধুরী, কি অব্যক্ত হাসিরেখা। আহা! দেখ দেখ মৃত্যুঞ্জয়ী যাত্রীর কি আনন্দ বিশ্রাম, পরম মুক্তি।

এ কি মোহ! রূপকেই জড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চাই—রূপের ধূলিপরিণতি কল্পনা করিতেও বুক ভাঙ্গিয়া যায়, অথচ এই আমার প্রিয়ের পরিত্যক্ত দেহের ঘরে আর কই বেদনার অনুভূতি? সমস্ত শান্তি। তবে কেন বেদনা?

এ রূপসভায় এ কি রূপের বিচিত্র অভিনয়, ব্যবহারিক সত্তায় অভ্যস্ত প্রাণ সহে কেমন করিয়া সে রূপের অভাব? মৃত্যুকেও ভয় করি না। যে রূপসুন্দরে আমি আমার প্রিয় সুন্দরের পরিচয় পাইয়াছি, যাহাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসিয়াও সাধ মেটে নাই, রূপের এ ব্যবহারিক সত্তার অভাবে তাইত আমার বুক কাঁপে। সাংসারিক ধনে একান্ত অনুরাগই বেদনা জাগাইয়া তোলে, অজ্ঞান অন্ধ জড়তার অন্ধকার তুচ্ছ অসার মোহই যত বেদনার জন্মদান করে। পরম কল্যাণদাতা আমাদের কল্যাণের জন্যই সমস্ত নিয়মিত করিয়াছেন। জগতের বুকে এই খেলাঘরে নিত্য নূতন বিদায় গান। রজনীর আনন্দকোলে বিশ্রাম লইতে যাই তখনও ত প্রিয়দের কাছ হইতে বিদায় লইতে হয়। কই তখন ত বিচ্ছেদ-বেদনায় প্রাণ আকুল হইয়া ওঠে না। তাহা কেন হইবে? সেখানে যে মিলনের আশা প্রাণকে আশ্বাসের বাণীতে নিশ্চিন্ত করিয়াছে, তাই আনন্দে বিদায় লইয়া নিদ্রার শান্তবুকে ঘুমাইয়া পড়ি। কিন্তু মৃত্যু কি ভগবানের সহিত মিলিত হইবার পরম আশ্বাসের বাণী শুনায় না?

মৃত্যু ভয়াবহ কেন? যদি দেব নিয়ম ভঙ্গ করি, যদি অমর আত্মাকে অসার মলিনতায় মলিন করি,

দৈহিক ভোগলালসার ভিতরই চরম আনন্দ সম্ভোগ করিতে চাই, যদি প্রতিদিনের যাত্রাপথে ব্যর্থ ঘাত প্রতিঘাত, অট্টপরিহাসে আত্মীয় পরিজনকে লাঞ্ছিত প্রতারিত করি, তবেই আকুল ভয় ভাবনা, তবেই মৃত্যু শিহরণ। আর যদি সংযমের পুণ্যনিষ্ঠা জীবনে উদযাপিত হয়, যদি সত্য ধর্ম্মের জন্য জীবন দিনরজনী উৎসর্গীকৃত হয়, যদি ত্যাগ মন্ত্রে নবদীক্ষা লাভ হয়, যদি বিশ্বপ্রেমে চিত্ত পুলকিত হয়, তবে ভয় কোথায়? দেহকে সর্ব্বস্ব মনে করি, ধূলার ঘরে নিত্য গৃহ রচনা করিতে চাই, তাইত মরণসখার এ রুদ্র প্রকাশ। দৈহিকতা ঐহিকতার ভিতর পরম চরিতার্থতা লাভ করিতে যাইয়াই এত অপরাধ। প্রাণময় আত্মার স্বরূপ ভুলিয়া কত ভুলের বোঝা জমাইয়া তুলি। অনিত্য খেলা খেলিতে যাইয়া শাশ্বত আনন্দলোক ভুলিয়া যাই, তাইত নিত্য আমি অথচ নশ্বর ত্রাসে চমকিয়া উঠি।

কুকর্ম্মের সার্থকতা এ দীন সংসারেই বা কোথায়? মৃত্যুর পরপারে তবে কেন তাহার জন্য পিপাসা? দেব আশীর্ব্বাদে পরম কল্যাণ সত্তা আত্মসংযমে। শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত জীবাত্মা দেবস্বভাব যদি লাভ করিতে পারেন, সত্যব্রতে ব্রতী মানবের অনন্তযাত্রায় ভয় কোথায়?

পাপী আর সাধুর কি বিভিন্ন অনুভূতি! যে যাত্রায়

পাপীর ভীতি শঙ্কামোহ সেই যাত্রাতেই সাধুর মুখমণ্ডল কি পুণ্য আনন্দজ্যোতিতে উদ্ভাসিত! দেবস্বভাবের ভিতর নিত্য শুদ্ধ সত্তা, কোনও মোহজঞ্জাল জমিয়া ওঠে না। অনন্ত পথের পথিক অনন্তধামের নিত্য সম্বল সংগ্রহ করিয়াই চলেন। তাই মুক্তির আনন্দে যাত্রাগান গাহিয়া চলেন।

মৃত্যুই হইল পরম সম্পদ্। কোথায় গেল লাভ লোকসান? কোথায় জীবাত্মার চরম লক্ষ্য? বিশ্বপাতার আনন্দবুকে যিনি বাস করেন তাঁর মৃত্যুভয় কোথায়? কাজ শেষ হইল, সখার আহ্বানগান বাজিয়া উঠিয়াছে, তাই তাঁরই বিচিত্র দান দেহবীণাখানি নানা সুরে পরম সাধনা সাধন করিয়াই চলিয়াছেন—খেলা শেষ করিয়া, আবার অনন্তের বুকেই হাসিয়া উঠিবেন। পরমসখার আনন্দবুকে বিশ্বনিকেতন, আনন্দনিকেতন, তাঁরই আনন্দমহিমায় বিশ্ববাসীর এ প্রাণের বন্ধনযোগ।

মরণসখার কালো রূপে আমার ভয় কোথায়? আশার বাণী শুনিয়াছি মর্ম্মকোণে, জীর্ণ তনু পরিত্যাগ করিয়া এবার নিত্য সত্য আমি সত্য সাজে সাজিয়া উঠিব। কোথায় ক্ষতি? আমার প্রিয়জনদের হারাইয়া ফেলিব কি? তাই কি এত বিচ্ছেদবেদনা? ওগো তা কেমন

করিয়া হইবে? তাহারাও যে প্রিয়তমের বুকেই বাস করে, তাহারাও যে নিত্য স্নেহ প্রেমের নিবিড় বন্ধনে যুক্ত! দেহের ব্যবহারিক সত্তা ফুরাইয়া যাইল। তাই বলিয়া কি প্রেম ফুরাইবে? প্রেমসুন্দরের প্রেমসত্তার শেষ কোথায়? ভক্ত প্রাণের আনন্দগান প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিয়াছে কি? তবে ভয় কেন? দেহান্তে কি ভাবে জাগরণের গান বাজিয়া উঠিবে কে জানে? কোথায় বন্ধনবেদনা? কেবলই মুক্তির জয় শঙ্খ বাজে। এই তুদিনের খেলাঘরে কত ব্যর্থতা, কত দৈন্য নৈরাশ্য! কে চায় এখানে চিরদিন থাকিতে? মৃত্যুর মঙ্গল সুর আশার গান শুনাইয়া যায়, তাই অমৃত ধামের যাত্রীর বদনে নয়নে আনন্দের হাসি, আনন্দে প্রয়াণ। কোথায় মৃত্যুবিভীষিকা? যে ইচ্ছায় রূপ গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই অখণ্ডলীলাতেই দেবত্ববিকাশ, দেবত্বের নব মহিমানন্দ জাগিয়া উঠিবে।

ভক্ত প্রাণের প্রেমানন্দ রস সুধা কে পান করিয়াছেন? সে মধু আনন্দে প্রাণ বিভোর করে। ধরণীর বুকে বাস করিয়াই ও কি আনন্দ ধ্যানে জীবাত্মার আনন্দ সমাধি! এই ত মৃত্যুর সুস্পষ্ট আভাস, এখানেই ত সে আনন্দ সমাধিপুরে আমার বুকের ধনদের দর্শন পাই। কোথায় দেখিব ইহলোকে না পরলোকে, কে জানে? জানি

প্রাণময়ের প্রাণপুরেই প্রাণের প্রকাশ, প্রিয়জনদের নিত্য হাসি। সচ্চিদানন্দে হাসিয়া উঠিয়াছেন সব, যতদিন দেহের ঘরে বাঁধা আছি, কই সে পূর্ণ শাশ্বত মঙ্গল স্বরূপের পরিপূর্ণ পরিচয়? মৃত্যুর মঙ্গল-মহিমায় যেদিন দেহের খেলা শেষ হয়, সেদিন সত্য সত্তা ফুটিয়া ওঠে।

তাইত মৃত্যু মানবের পরম-সম্পদ্। কেন আনন্দময়ী বসুধা জননীর বুকে জাগিয়া উঠিলাম? কেন অনন্ত যাত্রীর সঙ্গে এ দীন যাত্রীরও যাত্রা গান? প্রকৃতির বুকে কেন অনন্ত গান বাজে? তাইত উত্থান পতন হাসিকান্নার বিচিত্র সাধনার ভিতরই জীবাত্মার পুণ্য সত্তা। যুগে যুগে ভক্তজীবনের মর্ম্মকথাই এই। সূতিকাগৃহ হইতে শ্মশান-ভূমি পর্য্যন্ত কেবলই দেবসাধনা। জীবনরথের সারথি কে? মরণ সখার গোপন রহস্যের ভিতরই দিনরজনী সুর সাধনা, অনন্ত মোক্ষফল লাভের চেষ্টা আর পূর্ণ মঙ্গলে পরম নির্ভরের আয়োজন। এই জন্যই যে আমার জাগরণপালা।

এস ওগো মরণ সখা আমার পরম বন্ধু, থাক্ পড়িয়া এ জীর্ণ অপটু দেহ; এখন দেবতনু লাভ করি, ক্ষুদ্র নিম্ন অধিকার হইতে উচ্চ অধিকার পরম গৌরব লাভ করি; তুচ্ছ ইন্দ্রিয়লালসার ঊর্দ্ধে শাশ্বত অতীন্দ্রিয় আনন্দ সুধা পান করি। কোথায় গেল ক্ষুদ্র আমি? এ কি মহীয়ান্

মহিমালোকে আমার আনন্দ সত্তা, এ বিশ্ববুকে ক্ষুদ্র বিন্দু হইয়া অনন্ত সিন্ধু বুকে মিশিয়া যাই। কেমন করিয়া ক্ষুদ্র জ্যোতিকণা মহান্ আদিত্যের জ্যোতির্ম্ময় লোকে উধাও হইয়া যাই!

এস আমার মরণ শরণ, অন্ধযাত্রীর পরম সহায়, কেন এ ব্যর্থ বিভীষিকা? কোন্ আলোকে ধরণীর বুকে আমার এ যাত্রাপথের আয়োজন? কে জান্ত এ বসুন্ধরার আনন্দ কুঞ্জে এ আনন্দ মেলা? কে জানে পর মুহূর্ত্তে কি হবে! এ কি অব্যক্ত কুহেলি? জানি কি কোথায় যাব? তবুও ত প্রতি মুহূর্ত্তে কোন্ অজানার গোপন রহস্য আমারও পথের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে! ওগো তেম্নি করিয়াই আমার মহাযাত্রার আনন্দ গান গাহিয়া যাইব। অজানার গোপন লীলা তেম্নি করিয়াই হাসিয়া উঠিবে। তবে কেন অবিশ্বাসের শিহরণ? প্রিয়ধনেরা কোথায়? আমার বুকের মাণিকেরা কাহার বুকে হাসিতেছে? সেই বুকে চলিয়াছি আমি। কেন সে মহীয়ান্ মহিমা ভুলিয়া যাই? কে জানে দেহান্তে সব আমার কেমন করিয়া দিব্য রূপে হাসিয়া আসিবেন। সে কি আনন্দ সত্তায় বিভোর হইয়া যাইব, কে জানে?

ওগো রূপসভায় এইত হইল বেশ। মৃত্যু আমার মৃত্যুঞ্জয়

হইয়া আসিলেন। আমার হৃদয়ঘর শূন্য করিয়া দিয়া, শূন্যের ভিতর পূর্ণ মঙ্গলরূপে দেখা দিলেন, আর মরণ সখার অমৃতস্বরূপে আত্মপুরে প্রাণে প্রাণে মেশামিশি হইয়া গেল! উঃ কত দিনের আকুল প্রতীক্ষা, কত দিনের অশ্রুধারা, কত দিনের রক্তাক্ত বুক আজ সার্থক হইল। মিলন বাঁশি বাজিয়া উঠিল। এ কি কথা, এ কি অধিকার! এ কি নব জীবন! প্রেমসখা, এ কি নিবিড় বন্ধন! ওগো আমার প্রিয়ধনেরা সত্য সত্যই নিত্যমিলনগানে চিরগৌরব সঙ্গীত গাহিয়া উঠিবেন। ওগো প্রেমসুন্দর, তুমিই ক্ষুদ্র বুকে প্রেমসিন্ধু রচনা করিয়াছ, গভীর হইতে গভীরে লইয়া চলিয়াছ। মরণদেবতার বিচিত্র স্পর্শে রূপ ঘুমাইয়া পড়িল, তবু প্রেম ফুরাইল না। কে বলিয়াছে আমার দুদিনের বন্ধন! এ কি অনন্ত বন্ধন, দেবলোকের সঙ্গে অনন্ত মিলন, গোপনে গোপনে! কে দেখিতে পাইবে, কে স্পর্শ করিবে? অথচ প্রেম লইয়া চলিয়াছে প্রেমসভায়। যাহা শুদ্ধ পবিত্র মুক্ত, তাহার ক্ষয় কোথায়? পুণ্যময়ের পুণ্য জ্যোতিতত্ত্ব-পরস্পরে আত্মায় আত্মায় প্রেমযোগ, অক্ষয় মঙ্গল ফল। কোন্ তপস্যায় এ মোক্ষফলের আয়োজন? এ যে প্রেমের লীলা, তাই বিশ্ববুকে জীবাত্মার আনন্দলীলা।

মরণপ্রিয় আমার চরমসঙ্গী, মৃত্যুবাসরে করুণার গান গাহিয়া আসিলেন, স্রষ্টা পাতা বিধাতার অনন্ত প্রেমালোকে সব হারানো ছবি উজ্জ্বল হইয়া উঠুক্। যেই মৃত্যুযবনিকা উধাও হইল, এ কি শাশ্বত গৌরবলোকে নবজন্মের আয়োজন। ওগো ভক্ত প্রাণের আনন্দসখা ভক্তবৎসল তুমি যে এ দীনেরও জীবনসম্বল! তোমায় যখন হারাই তখনই মৃত্যুর অন্ধকার। তোমার কথায়, তোমার সেবায় দিনযামিনী তোমারই পথে চলিতে দাও। এই বিকারের পরপারে নির্ব্বিকার লোকে স্থান দেও। তোমারি আনন্দে নব আনন্দ আশা জাগাও। প্রেমপথে সকল বাধা ভাঙ্গিয়া দাও। তোমারি আনন্দগানে আনন্দসাধনায় দেবত্বের মহিমা লাভ করিতে দাও। তোমারি আনন্দে সমস্ত মর্ম্ম-পীড়ন সহ্য করি। তোমারি আশায় আমি শান্ত হই, শুদ্ধ হই, স্বর্গরাজ্যের জন্য প্রস্তুত হই। ওগো আমার নয়নের জ্যোতিতে তোমারই প্রেমজ্যোতি উজ্জ্বল কর। ওগো তুমি যে অমৃতময় মৃত্যুঞ্জয়, তাই ত মরণস্বরূপে মৃত্যুঞ্জয় মাধুরী ফুটিয়া উঠিল। ধন্য হইলাম, কৃতার্থ হইলাম। ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্।

(১১)

চিরন্তন নিয়তি

(ক)

দিবালোকে জেগে ওঠে
মানবের হাসি খেলা,
ও কোন্ করুণ ছটা
খুলেছ আনন্দ মেলা ?
নিশার আঁধার বুকে
চন্দ্রমা তারকা ভাসে,
তারি সাথে হাসে মরি
বসুধা জলধি হাসে।
চুপে চুপে তারি সাথে
বেজে ওঠে সুরে সুরে,
আমারও ভোলা মন
ছোটে সেথা ঘুরে ঘুরে।
আগুন জ্বলেছে বুকে
তারি মাঝে আছি চেয়ে,

কম্পিত বন্ধুর পথে
কোথা চলি ধেয়ে ধেয়ে !
আমারো ব্যথিত বুকে
কি অমৃত মধু ঢালা,
থেমেছে ব্যথার গান,
মিটেছে সকল জ্বালা।
জীবন প্রভাত হ'তে
দেয় বুকে ওকি দোল,
মরণ-আঁধার বুকে
পাতিবে কি স্নেহ-কোল !
হাসি কান্না সুখে দুখে
সফল বেদন-গান,
বাজায় কি মন-তারে
মিলনের মধু তান ?
তারি সাথে বয়ে এল
শীতল শান্তির ধার,
নিয়ে এলে দুলালি কি
মিলন মঙ্গল-হার ?

আমাদের আশা নিরাশা সুখ দুঃখ হাসি কান্নার মাঝখানেই কালস্রোত কেমন নীরবে প্রবাহিত হইয়া

চলিয়াছে ! কত ভাঙ্গা গড়া, কত পরিবর্ত্তন ছয় ঋতুর কি বিচিত্র লীলা ! আজ যাহা পুরাতন কাল তাহা নবীনতার মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিল, নূতন আবার পুরাতন হইয়া গেল ! অতীতের আনন্দছবি বিস্মৃতির গভীরে ডুবিয়া গেল কিন্তু কালের সেই অনন্তধারা যে যার কাজ নির্দ্দিষ্ট পথে করিয়া চলে। প্রত্যেকটি এক অখণ্ড বিধানে নিয়ন্ত্রিত, স্বর্গ মর্ত্ত্য একই নিয়মে নিয়মিত। কাননে কাননে মাঠে ঘাটে কত বিচিত্র পুষ্পদলের বিচিত্র মাধুর্য্য, গগনমণ্ডলে জ্যোতিষ্কলোকে কি আনন্দময় জ্যোতির্ম্ময় পুর ; পাহাড়ে পর্ব্বতে গিরিশিখরে তুষারমণ্ডিত ধবলতুঙ্গে কি নিত্য নূতন শোভা ! এই বিরাট মধুর মোহন বিশ্বপুরে অনন্ত জীবনলীলা, অতি ক্ষুদ্র কীটাণুকীট হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবও ঐ একই মঙ্গল নিয়মে শৃঙ্খলিত। এরই নাম কি চিরন্তন নিয়তি ? এই নিয়তির বুকেই অজর অমর অনন্ত মঙ্গল উদ্ভাসিত। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নিয়তির বিচিত্র সুরে বাঁধা। একটি পুষ্পও ব্যর্থতার ভিতর ফুটিয়া ওঠে না, একটি শিশুর হাসিকান্নাও ব্যর্থ নয়। প্রকৃতির বুকে গিরি কান্তারে নদনদী ভূচরে খেচরে যে পরম বিকাশ, আবার কালে কত জাতির উত্থান পতন, কিছুই ব্যর্থ নয় ; সবই পরম চিরন্তন কালসূত্রে গ্রথিত— নিয়মিত। তবে আবার পাপ পুণ্য কি ? কে দোষী, আর

কে সে দোষের বিচার করিবে? আমার ইচ্ছাও কি পূর্ব্বাপর ঘটনায় নিয়ন্ত্রিত? আমি কি বিশ্ববুকে লক্ষ্যহীন যাত্রাপথে ছুটিয়া চলিয়াছি? একি আমার ইচ্ছায় সে ভূমা ইচ্ছার প্রাণময় বুকে আমার জন্ম? যদি সৃষ্টির ঊষাকাল হইতে সবই কারণপরম্পরায় নিয়ন্ত্রিত তবে মানবের বেদনাকাতর প্রতীক্ষা, জাগরণ, সংগ্রাম কি ব্যর্থ? না, এ আমারই পরম কল্যাণের পথে পরিপূর্ণ মঙ্গল সাধনার বিচিত্র উদ্বোধন। আমার দীন প্রার্থনাও কি বিশ্বদরবারে অনন্ত সভায় স্পন্দিত হইয়া ওঠে? আমি কি জড় যন্ত্রের মত বিশ্ববুকে অনন্তলীলার সঙ্গে অজ্ঞান অন্ধ যাত্রা করি? আমার স্বাধীন ইচ্ছার কি তবে জটিল কুহেলীর ভিতরই পরম গতি?

অনন্ত নিয়তি কাহাকে বলে? এই অখণ্ড চির-প্রশান্ত বিশ্বে সবই কার্য্যকারণপরম্পরা হইয়া চলিয়াছে। আজ যে কারণরূপে ব্যক্ত, কাল তার অবশ্যম্ভাবী ফল বিকশিত হইয়া উঠিতেছে—আজ যে বৃক্ষের জীবন-ইতিহাসে প্রতি বীজের জন্মদান, কাল আবার সেই ক্ষুদ্র বীজানু হইতেই বিরাট বৃক্ষের প্রকাশ। আমার আমি এই বিচিত্র সত্তা আশৈশব জাগিয়া আছে, তাই মানুষ বৎসরের পর বৎসর যুগের পর যুগ, এক আনন্দ-ইতিহাস বিশ্ববুকে পাঠ করিতেছে।

অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সকলই প্রাণময় যোগসূত্রে গাঁথা হইয়া আছে। অনন্ত রথচক্র চলিতেছে নিত্যগতিতে, অনন্ত যোগে একাকার হইয়া। এরই নাম নিয়তি? এ গতি কে রোধ করে? একটি উপলখণ্ড জলাশয়ে পতনমাত্রেই গোলাকার জলরেখা রচনা করিয়া করিয়া তার সীমান্ত রেখাকে স্পর্শ করিবেই, এ কার্য্যকারণ জ্ঞান যেমন সত্য, তেমনি সত্য নিয়ন্ত্রিত ঘটনারাশি হইতেই আমরা ভবিষ্যতের তত্ত্ব অবগত হই, কিন্তু যা সত্য নিত্য মরণ-ধর্ম্মশীল মানুষের দৈনিক জীবনে, কই তাহা ত তেমন ফুটিয়া উঠিতেছে না? উত্থান পতন হাসিকান্নার জটিল কুহেলীর ভিতর কি বিচিত্র ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিয়াছে। কোথায় চলিয়াছে কোথায় আছি, কে জানে?

আজ দুর্ভাগ্য, কাল সৌভাগ্য, এই ভাগ্যলীলার কি বিচিত্র খেলা—কোথা হইতে কেমন করিয়া কি যেন হইয়া যায়, আদি অন্ত খুঁজিয়া পাই না। এ এক জটিল রহস্য! কোথায় যেন কি সকল ঘটনার অন্তরালে লুকানো থাকে! এ কি আকস্মিক ঘটনা? না, প্রকৃতির বুকে প্রতি ঘটনা সকলের মূলেই ত এক চিরন্তন কল্যাণ জাগিয়া আছে! সেই কল্যাণপথেই তাহার অনন্ত গতি। সবই মঙ্গলসুরে উদ্বোধিত। অনন্ত বিশ্ববুকে অনন্তলোক যুগ যুগান্তর ধরিয়া

নিয়ন্ত্রিত, আর এই নিয়ন্ত্রিত কল্যাণলোকে বিচিত্র বিরাটের আনন্দ লীলায় আমিও যে যুক্ত হইয়া চলিয়াছি! কে আমি, কোথায় আমি? এই মৃত্যুময় সহায় সহানুভূতিহীন সংসারের নির্ম্মম নিষ্ঠুর পীড়নের মাঝখানে আমার সুখ দুঃখ আমার হাসি কান্নার পসরা সাজাইয়া লইয়া একা আমি কোথায় জাগি? তবে কেন আমার বুকের নিভৃত তলে, গভীর হইতে গভীরে, এত স্নেহ, এত প্রেম উথলিয়া উঠিতেছে? আমার পাপ পুণ্য সবই যদি অখণ্ড বিধানে নিয়ন্ত্রিত, তবে আমার আকুল বাসনা, প্রাণময়ী আশা, সব কেন আর যাতনা দেয়? সকলে দিক্ মুক্তি। কেন এ অব্যক্ত কুহেলী জাল? সব যদি বিশ্ববিধানে নিয়ন্ত্রিত, তবে পাপ তাপের এ প্রায়শ্চিত্ত, অনুতাপানল কেন? কেন তবে, পাপে ঘৃণা, পুণ্যে রুচি?

আমার আমিত্বের চেতনসুরে প্রকৃতির অখণ্ড নিয়মে সে প্রাধান্য কই? আমার প্রাণপাখী যে কেবল চেতন-গান গাহিয়া উঠিতেছে! আমি যে আমার স্বাধীন ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য-মহিমায় জাগিয়া আছি! যদি আমি অন্ধ অচেতন জড়ের মত চলি, তবে কেন জীবাত্মার জাগরণ উদ্বোধন? না গো না, এ জগৎ কেবল হিম জড়তার স্তূপ নয়। এই জড়ের বুকে অখণ্ড নিয়মে অনন্ত প্রাণের প্রাণহীন খেলা নয়। সকলের

অন্তরালে ও কার আনন্দ-মাধুরী সব মধুময় করিয়া দিল? চির মঙ্গল উদার প্রেম যখনই ফুরাইয়া যায়, অমনি সবই লুপ্ত হয়, অমনি পাপ পুণ্য শাশ্বত আনন্দ সবই উধাও হয়। কেন মানবের বুকে বেদনার এ জটিল রহস্য? কেন আবার আনন্দ-উচ্ছ্বাসের কুহক ঘোর?

কি জন্য কি হয় তাহা কি জানি? ভবিষ্যতের পরিপূর্ণ স্বরূপখানি সমগ্র কল্যাণের রূপখানি দেখিবার সে দৃষ্টি কই? সীমার ঘরে—অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই অপরিপূর্ণ-অভিব্যক্তির ভিতরই বিচার করিতে চাই। তাই এত ভুল-ভ্রান্তি, অমঙ্গলের মোহঘোর জমিয়া উঠে।

শাশ্বত গতি অখণ্ডলীলায় প্রবাহিত। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অখণ্ড বন্ধনে বাঁধা, অতীতের সাধনা বর্ত্তমানে ফুটিয়া উঠিতেছে। কে সে বিচিত্র নিয়ম পরিহার করে? বিশ্ববুকে কত কি দেখি, জড়ের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি, চেতনের চেতনগান শ্রবণ করি। সকলের ভিতরই এক মঙ্গলময় চেতনসত্তা অনুপ্রাণিত হইয়া আছে। যাকে জড় বলিতে যাই, অণুপরমাণুর সমষ্টি বলিয়া বুঝাইতে চাহি, দেখি, চৈতন্যের অখণ্ড শক্তি-রহস্যের ভিতরেই তার সংযোজন বিশ্লেষণ। তারই ভিতর রূপখানি গড়িয়া উঠিয়াছে, চেতনের লীলাময় রূপখানি তাইত আমার রূপরস গন্ধে

চেতনবুকে জাগিয়া উঠে। সকলের অস্তিত্বজ্ঞান আমার চেতনলোকে চৈতন্যের ভিতরেই প্রতিষ্ঠিত।

বিচিত্র শক্তিপ্রভাবে বিশ্ববুকে এই আনন্দ প্রকাশ। ক্ষুদ্র হইতে মহান্ সবই পরম সৌন্দর্য্যে বিকসিত হইয়া উঠিতেছে—নিত্য নূতন শোভা! যাকে জড় বলিতে যাইলাম, উপলখণ্ড বলিয়া উপেক্ষা করিতে চাহিলাম, তাওত বিচিত্র শক্তিরই ইতিহাস বহন করিতেছে! কি উদ্ভিদ্, কি প্রাণি-জগৎ, সবই যে সেই শক্তিলীলা! নিত্য নূতনভাবে শক্তির নব নব মহিমা, উন্নতি হইতে উন্নতি, নব জীবন হইতে নব জীবনে লইয়া চলিয়াছে। আত্মজ্ঞানের চেতনপুরে চির চৈতন্য তাঁর আনন্দগানখানি লোক-লোকান্তরে রণিত করিয়া তুলিতেছেন।

বিশ্বস্রষ্টা সর্ব্বশক্তিমান্। কে তাঁহার বর্ণনা করিবে? তাঁহার ইচ্ছার ভিতরই সকলের জাগরণ। তাঁরই শাশ্বত দৃষ্টির ভিতর সমস্ত নিয়ন্ত্রিত, তাঁরই চিরকল্যাণময় ইচ্ছার ভিতরই সকলের অস্তিত্ব। এরই নাম অনন্তগতি।

তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছায় জগৎ হাসিয়া উঠিল; তাঁহারই মঙ্গল-ইচ্ছালোকে নিত্য পূজার জয়শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। কোথায় ধ্বংস! যাহাকে ধ্বংস বলিতে গেল মানুষ, সেই ধ্বংস কাহিনীর ভিতর সৃষ্টির নবরূপ ফুটিয়া উঠিল। অণুপরমাণু

অখণ্ড বিশ্ব প্রাণবন্ধনডোরে প্রাণযোগে যুক্ত হইয়া অনন্ত-লীলানিকেতনে সাজিয়া উঠিতেছে।

জন্মমরণের ইতিহাস পরম লীলাময়ের লীলাগানে নব সত্তায় ভরিয়া উঠিল। প্রেমময়ের আনন্দ গানই বসুধা বুককে স্পন্দিত করিয়া তুলিল। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'এর আনন্দগান বিশ্বচরাচরে বাজিয়া উঠিল। তাইত ক্ষুদ্র পিপীলিকার জীবনযাত্রার ইতিহাসেও এত আনন্দলীলার আয়োজন— সকল জীবনে এক পরিপূর্ণ মঙ্গল জাগ্রত পরিপূর্ণ শিব-সুন্দরের পরম মাধুর্য্য। মানবাত্মা পশুত্বের দীনতার উপর দেবত্বলাভ করিলেন, সকল বাসনা কামনার ঊর্দ্ধে আত্মলোকে যাত্রা হইল, ভগবদানন্দধারায় শান্ত শীতল হইয়া গেল, সকল ত্রিতাপজ্বালা জুড়াইয়া গেল।

মানবের দেবলীলা প্রকাশিত, 'সত্যং-সুন্দরম্' নামের জয়চন্দন কপালে অঙ্কিত হইল। এবার সত্যসাধনার পরম উদ্বোধন, আত্মসাধনার অটল বিজয় মন্ত্রশক্তি, সত্য আদর্শ, সত্য দীক্ষা। নির্ম্মল শাশ্বত আনন্দধ্যানলোকে যাত্রা হইল। এইত অদৃষ্ট! এইত শাশ্বত নিয়তি।

তবে আসুক্ কি আসিবে আমার যাত্রাপথে? সুখ দুঃখ নিন্দা লাঞ্ছনা আসুক্। আমি মুক্তির আনন্দে আনন্দিত, চরম সত্যসাধনে সাধনতৎপর। আমার প্রিয়ধনেরা যে বুক

শূন্য করিয়া দীনহীন করিয়া, কাঙ্গাল করিয়া চলিয়া যায়, তবুও যে পরম কল্যাণে জাগ্রত হইয়া প্রাণযোগে নিত্য মিলনমালা নূতন করিয়া গাঁথিতে চাই। ধূলি হইয়া যাই, তবুও যে অমর আত্মা জাগিয়া থাকেন। ধরণীর বুকে রূপ রস গন্ধে কত আনন্দভোগ! এ সব যে দুদিনে শেষ হইবে, দুঃখে ভরিয়া উঠে বুক। কিন্তু আমি কে? অবশ্যম্ভাবী মঙ্গল ধারা কে প্রতিহত করে? মৃত্যুমহিমার ভিতরই অমৃতের পরিচয় লাভ হইবে, অনিত্য হইতে নিত্য ধনে ধনী হইব, পশুত্বের দীন আবরণ ফেলিয়া দিয়া ভাগবতী জ্যোতি সত্তা লাভ হইবে। তবে কেন দুঃখ শোক বেদনা? এই সব কিছুর ভিতরেই আমার চরম কল্যাণসাধনা। বিশ্ব-সংসারে ধ্বংসলীলাই নব কল্যাণগান গাহিয়া আসে, আমার দুঃখ বেদনা ঘোর দুর্দ্দিনও মুক্তির আনন্দের খবর দিয়া যায়। সকল দুঃখ বেদনার মাঝখানেই চিদানন্দ ভক্ত প্রাণ আনন্দে তরণী বাহিয়া যান। এই ত বিশ্বজয়ী শক্তির জয় ইতিহাস।

যতই শান্ত সমাহিত আত্মা ততই শান্ত মঙ্গল, ততই অন্তরতর অন্তরতমে প্রশান্ত গম্ভীর স্বরূপ। এইত শুদ্ধতার জ্যোতিঃ। আপাতমনোরম সুখ, আপাতদুঃখবেদনা, এ সবই ত কল্যাণের জয়পত্র বহন করিয়া আনিতেছে! আমার

ক্ষুদ্র ইচ্ছার উপর পরম ইচ্ছা, সেই মঙ্গল ইচ্ছাতেই আত্মসমর্পণ। তাই ত নিয়তির উপরে জয়লাভ, তাই ব্রহ্মানন্দ, অক্ষয় আনন্দসুধাপান। ধন্য ইচ্ছাময়, কে ইচ্ছারহস্য ভেদ করিবে?

চিরন্তন নিয়তি

(খ)

অনন্ত আঁধার বুকে
অসীম সাগর দোল
নিয়ে যায় কোন্ দেশে
অজানা আনন্দ বোল।
পেতে দেছে ঘন জাল
বসুধাবুকের ঘরে
তারই মাঝে মেনে চলে
নিয়তির মৌন বরে।
জেগে আছে একজন
অনিমেষ আঁখি-পাতে

আর সব কোথা জাগে
জটিল আঁধার রাতে।
ধূলি পরে ওকি সাজ
কাহার বিধান মানে
সেধে যায় গান-খানি
আপন আপন গানে।
করুণা নামিছে বুকে
ঝর ঝর ঝর ধার
জানি না গো কোথা ছুটি
আছে শুধু নাম সার।
মরণ আঁধার পথে
ছুটেছে ব্যথিত যাত্রী,
আপন নিয়তি সুরে
বাজায় দিবস রাত্রি।
নামে বুকে প্রেমগঙ্গা
ভকত সাধন-গান
মরণ যোগের সুরে
বাজায় মধুর তান।

যুগ যুগান্তর ধরিয়া ঋষিপ্রাণ মানবের খেলাধূলায় সেই একমেবাদ্বিতীয়মের আনন্দলীলা দর্শন করিয়া চলিয়াছে।

সকল চিত্ত এক অনাহত শক্তির জয়গৌরব সভয়ে নত হইয়া স্বীকার করিতেছে। দার্শনিক এই তত্ত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া দর্শনশাস্ত্র লইয়া আসিলেন, কত নামে প্রাণের কথা প্রকাশ করিতে চাহিলেন। কেহ তাহাকে নিয়তির অখণ্ডলীলা বলিয়া মানিয়া লইল, সাধ্য নাই তাহার অন্যথা করে। স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন দেবলোক ভূলোক সবই নিয়তির শাশ্বত বন্ধনে বাঁধা।

এ কি আশ্চর্য্য, যখন জড় ও চেতনের ভেদাভেদ নির্ণয় করিতে পারিল না মানবের শিশু জ্ঞান, তখন সে অদৃষ্টের মহামহিমা মানিয়া চলিয়াছে। যাহারা জড়কে পরমার্থ মনে করে তাহাদের নিকট দৈহিক ও নৈতিক কল্যাণ একই; এই ঐহিকতা দৈহিকতা সুখ সম্পদ্ ধন ঐশ্বর্য্যেই চরম কল্যাণ মনে করে, এই জন্যই ভোগের আনন্দেই বাঁচিয়া থাকা, এ জন্যই জীবনের মূল্য দান। এই ধনমানের হ্রাসবৃদ্ধির উপরেই জীবনের সুখদুঃখের পরিমাণ। তাই যে ঐহিক সুখে বঞ্চিত হইল তার সবই বুঝি ব্যর্থ। কয়জনের সে শাশ্বত মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা জাগে, যাহারা এই নিয়তির পরিহাসকে উপেক্ষা করিতে পারে? কয়জনেরই বা জীবনে সে আধ্যাত্মিক আলো জ্বলিয়া উঠে যা সে অদৃষ্টের ঊর্দ্ধে লইয়া যাইবে? তাই যুগে যুগে যখনই মানুষ তাহার জীবনে

এই নিয়তির বন্ধন মুক্ত করিয়া সত্যালোকে জাগ্রত হইয়া বিশ্বকল্যাণ-বাণী প্রচার করিয়াছে, তখনই অদৃষ্টবাদী মানুষ তাহাকে দেবতার আসন দান করিয়াছে।

শাশ্বত প্রকৃতিই আবার এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে দেব-স্বভাব দান করে, আর সত্যপথের রেখা চিহ্নিত করিয়া দিয়া যায়। একই জাগ্রত পরম সত্তার আনন্দ-মহিমার ভিতরই বিশ্ব-প্রকাশ। আশৈশব মানবের খেলাধূলায় সেই একেরই পরমলীলা, পরম মঙ্গল সত্তা। এই অনুভূতির ভিতরই ঐহিক জীবনের চরম কল্যাণসাধনা। আনন্দ-ময়ের আনন্দনিলয়, সত্যপিপাসু ভক্তপ্রাণ পার্থিব ও অপার্থিব তত্ত্বের বিচিত্র রহস্যের আনন্দপরিচয় এক অমৃতের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিতেছেন। এই সংসারে ভোগ-লালসাতেই পরম সার্থকতা নহে। পরমাত্মার নিবিড় প্রেমের ভিতরই যে আত্মার সুমঙ্গল সত্তা, এই আত্মসমাধানেই সত্য সফলতা। পরিপূর্ণ কল্যাণের জন্যই তাঁহাকে সুনির্ম্মল আলোকেই বিকশিত হইয়া উঠিতে হইবে। আত্মশক্তি দেবসত্তা দৈহিকতা ঐহিকতার উপর জয়লাভ করিয়াই সাধনার জয়মঙ্গল ঘোষণা করিতেছে। ঐহিক সুখের অভাবে দৈহিক ভোগসুখের চরিতার্থতা হইল না বটে, কিন্তু মানসপুরে আত্মলোকে সে নিবিড় শান্তির ত অভাব

ঘটে না। এই শাশ্বত শান্তিপুরেই আত্মার আত্মতত্ত্ব, পরমার্থ লাভ, জীবাত্মার প্রকৃত সত্তা।

জড় জগৎ এক অখণ্ড বিধানে নিয়ন্ত্রিত, দেহজগৎও নিয়মের বহির্ভূত নহে। সমস্তই ভৌতিক নিয়ম মানিতেছে। কিন্তু শুভক্ষণে দেহপুরেই এ কি আত্মজ্যোতি জীবাত্মার চিদাকাশে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, যাহার নিয়মতন্ত্র কোন পার্থিব সংস্কারে আবদ্ধ নহে। তার প্রাণসত্তা স্বাধীনতায়, মুক্তির আনন্দগানে, ধর্ম্মে পুণ্যে, মোক্ষসাধনে, পরমসুন্দরের যোগধ্যানে, শান্ত সমাধানে। পরম আনন্দ সে পরম ইচ্ছায় আপনার সকল বিসর্জ্জনেই; দাসত্বসাধনই আনন্দ। কিন্তু যখন বহির্ম্মুখীনতায় শান্তি চাই, দৈহিকতা ঐহিকতার ভিতর তৃপ্তিলাভ করিতে যাই; তখনই অশান্তির ঘন মোহমেঘ জমিয়া উঠে। আমার স্রষ্টা পাতা বিধাতার চরণে যখনই সর্ব্বস্ব নিবেদন করি, কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি দান করি, পরম সখাকেই ভালবাসিয়া যখন বুকে জড়াই, তখনই সত্য সাধনা, তখনই আমার সকল দুঃখ বেদনা পরম সুমঙ্গল লোকেই লইয়া চলে।

যা ভৌতিক নিয়মে বাঁধা তার সঙ্গে ত আত্মজগতের মিল হয় না। তাই দেবপ্রাণ ক্ষুদ্রতার অধীন হইতেই ত্রাহি ত্রাহি করে। যখনই ক্ষুদ্রের সঙ্গে সন্ধি, তখনই তাহার মহিমাময়ী

প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হয়, তখনই বিবেকের কল্যাণ-বাণী ম্লানভাব ধারণ করে। তখন আর আত্মা সে বিমলানন্দ সম্ভোগ করিতে পারে না, তখন ক্ষুদ্রতার মোহে পশুত্বের স্তরে গমন করে—নিত্য সুখ হইতে বঞ্চিত হয়। তবুও প্রেমময়ের প্রেম সকলকে বুকে করিয়াই আছে, কাহাকেও পরিত্যাগ করে না, সেই অবস্থাতেও তাহার পুণ্যপদবী লাভ করিবার চির অধিকার! আত্মজ্ঞানের ভিতর তখনও উন্নততর পথেই অগ্রসর হয়। তখনও উন্নততর সকল অবস্থার ভিতরই প্রেমময়ের বরাভয় "মা ভৈঃ" বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠে। সকল ইচ্ছা সেই ভূমা ইচ্ছারই জয় ঘোষণা করে। ধরণীর ধূলি হইতে যেমন দেবলোকে দেবত্বের শ্রেষ্ঠত্ব, তেমনই আমাদের ক্ষুদ্র ইচ্ছা ভূমার মঙ্গল ইচ্ছাতেই মহীয়সী, তাঁহারই শাশ্বত ইচ্ছার জয়।

দৈহিক রাজ্যে পার্থিব বন্ধন কেমন করিয়া ছিন্ন হইবে? দেহীর কত অভাব! তাই তাহার অভাবমোচনের জন্য কত ক্ষুদ্র বিষয়ে নিয়োজিত থাকিতে হয়! কিন্তু জীবাত্মার এ কি দেবশক্তি লাভ হইয়াছে, যে দৈহিক জীবনের ভিতরই দেবলোকে, অন্ধকার হইতেই জ্যোতিস্বরূপে, মৃত্যু হইতে অমৃতের পথে চলিতে পারে, আত্মা স্বাধীনতার ভিতর মুক্তির আনন্দ লাভ করে। কিন্তু সে আনন্দের অধিকারী হইবে

কে? যদি নির্ম্মল উদার পুণ্যময় জীবন না লাভ হয়, তবে কেমন করিয়া ভক্ত প্রাণের আনন্দতত্ত্ব বুঝিবে? যার সে আত্মার স্বাধীনতা নাই, সে কেমন করিয়া করিবে প্রাণব্রহ্মে প্রাণময় আহুতির মর্ম্ম উপলব্ধি?

যতক্ষণ দেহে আছি ভবের বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ত মোচন করিতে পারি না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া ত মোহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেও চলে না—সে বন্ধন মোচন করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হইবার শক্তি যে ভগবান্ দান করিয়াছেন। দৈহিক প্রয়োজনের জন্য—অন্নসংস্থানের জন্য যেমন আয়োজন করিতেই হয়, আবার তেমনই সকল ভোগের ভিতরই ত্যাগের আনন্দদীক্ষায় মানব প্রাণ উদ্বোধিত হইবার মন্ত্রশক্তি লাভ করিয়াছে। আজ কত বসনপারিপাট্য, কত নিত্য নূতন সাজ, আবার আমার সাধের বসনখানিই, কেমন আমার শবখানিকে মহাযাত্রার মঙ্গলসাজে সাজাইয়া দেয়। যতদিন দেহ ততদিন দৈহিক দৈন্যমোচনের আয়োজন, ততদিন ঐহিক ধনের ব্যবস্থা—কিন্তু এ সব কিছুর ভিতরই যে পরম ধনের আস্বাদন লাভ করিতে হয়, তাহা না হইলেই ক্ষণে ক্ষণে বেদনা, ক্ষণে ক্ষণে ক্লান্তি, ক্ষণে ক্ষণে যাতনা! কত মানুষ জগতে প্রশংসার জন্য কত না ত্যাগ করে, কিন্তু প্রশংসার উপরেও যে উঠিতে হইবে। আমায় কেউ ভাল

বলিতেছে কি না বলিতেছে, মানিতেছে কি না মানিতেছে, আমি পরম ইচ্ছার ইচ্ছাই পালন করিয়া চলিয়াছি, তাহাতেই আমার সার্থকতা মানুষের ভাল মন্দ বিচারে আমার কি আসিয়া যায়? বাহিরের প্রতিষ্ঠায় কি হইবে, যদি আত্মগৃহে সত্যপ্রতিষ্ঠা না হয়?

আমাদের জীবনের হাসি কান্নাও ব্যর্থ নহে, আমাদের স্নেহ প্রেম ভক্তি উপেক্ষণীয় নহে—সে সবই যে প্রাণকে সরস করিতেছে। তাই বলিয়া চরম ভুলিয়া ব্যর্থ ভোগেও সার্থকতা নাই। কত স্নেহের ধন, শ্রদ্ধার পাত্র, ভালবাসার জন শুদ্ধ স্নেহ প্রেম, সুনির্ম্মলা ভক্তি এ যে আত্মারই প্রাণধর্ম্ম! কিন্তু রূপের গৃহে বাস করিতে করিতে সে রূপেই বাঁধা পড়িয়া যাই, আত্মস্বরূপ মনে থাকে না। যেদিন সব স্নেহ ভালবাসা আত্মায় উপলব্ধি হয়, সেদিন রূপের ঘরে ছুটাছুটি থামিয়া যায়। তখন ধন্য আমার ভালবাসা, ধন্য আমার স্নেহের পরম লীলা। একদিন ত সাধের রূপখানি ভস্মে পরিণত হয়, তবুও ভালবাসার শেষ কই? এ আত্মযোগ কে নষ্ট করে? পরমাত্মার প্রকাশই বিশ্বপ্রকাশ, আবার আমাদের আত্মাই যে এ রূপমাধুর্য্যের ভিতর হাসিতেছেন! তাই ত আত্মায় আত্মায় যেদিন ভালবাসার অনুভূতি, সেদিন সকল জটিল দ্বন্দ্ব থামিয়া যায়। তখন

আর বিরহের বেদনা নাই। পরমাত্মার এ কি অধিকার-দান—অমরত্ববিধান—দেবপ্রসাদ-সম্ভোগ! হৃদয়ের বুকভরা ভালবাসা কি ধ্বংসের পথে যাইবে? দেহের বিকার কোথায় শেষ হয়?

বল তবে ভাল করিয়া কেমন করিয়া ধূলিমুষ্টির ভিতর অমর জীবন লাভ হইবে? কেমন করিয়া দ্বৈতের সঙ্গে অদ্বৈতের মিলন হইবে? কেমন করিয়া ইন্দ্রিয়সম্ভোগের ভিতরই নিত্য মোক্ষধন লাভ হইবে? ঐ যে ফুলবনে ফুলটী বর্ণে রসে ও গন্ধে ভরিয়া উঠিল—হায়! হায়! দেখিতে দেখিতেই ঝরিয়া যাইল—এই মরজগতে বাস করিয়াই এই ঝরা ফুলের শুষ্ক বুকেই এ কি গোপন বাণী শোনা গেল, অনাদিকাল ধরিয়া আত্মসত্তার পরম তত্ত্ব! প্রতি প্রভাতে, সন্ধ্যায়, দিনের সকল কার্য্যে, সকল অবসরে সর্ব্বোচ্চ অধিকার লাভ করিয়াছে মানব তাই সে নিষ্ঠামন্ত্র জপ করিয়া করিয়া শুদ্ধ সুন্দরের বিমল বিভা বদনকমলে বিভাসিত করিয়া তুলিতেছে! ঐহিক ধন মান যশ প্রতিষ্ঠা সব কিছুর ভিতরই পরম কল্যাণের আনন্দ সুর বাজিতেছে, দেবসেবার আয়োজন উদ্বোধন হইল। যে জীবনে সে পরম উদ্বোধন-সঙ্গীত ছন্দে ছন্দে নাচিয়া উঠিল তাহাকে আর কে ভুলাইবে? আর কে বিচলিত করিবে? এবার আনন্দ-

নিলয়ে আনন্দগান শ্রুত হইল। হইতে পারে তিনি দীন দরিদ্র, হইতে পারে তিনি মানব সভায় লাঞ্ছিত ঘৃণিত, হইতে পারে নিষ্পেষিত পীড়িত, তবু অন্তরে যাঁহার অম্লান কুসুমাঞ্জলি দেবতার চরণে দিন রজনী উৎসর্গীকৃত, তাঁহার যে এক অব্যক্ত আনন্দ, তাহা ত অফুরন্ত—তিনি হৃদয় নিকুঞ্জবনে বসিয়া বসিয়া মিলনসুন্দরের সঙ্গে ও কি মিলনমালা গাঁথেন, আর প্রিয়তমের আনন্দ বরণে নিত্যানন্দে গদ গদ হইয়া উঠেন। কে তাকে সে আনন্দভোগ হইতে বঞ্চিত করিবে?

এ আনন্দভোগের কথা কাহাকে বলা হইয়াছে? কাণ ত আছে সবার, তবু সে বাণী শুনিতে পায় কৈ? এই দেবপ্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্ষুদ্রেই তৃপ্ত, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগিল কই? অন্তরধামে বিশ্বরাজের মধুর আগমন, তবু আবাহনের বাঁশী বাজিল না, তবুও বুকের আঁচলখানি পাতিয়া দেওয়া হইল না! যদি আমার ভোগসুখ সসীম গৃহেই আবদ্ধ থাকে, যদি নিজ জীবনে সে মঙ্গলযোগ না হয়, যদি অশুদ্ধতার কলঙ্ককালিমাই মাখিয়া রহিলাম তবে কেবল ভগবান আছেন, এ অস্তিত্ব স্বীকারের মূল্য কি? যদি অমরত্বে বিশ্বাস করি, তবে ঐহিকতাকে কি করিয়া চরম সুখ মনে করি? বলি, অমৃত চাই অথচ অনিত্যতার পূজা করিয়া চলিয়াছি। সত্য সন্ধান করি অথচ দীনতার সম্ভোগে প্রাণ জুড়াইতে চাই,

মানব নামে, দেবসন্তান নামে পরিচয় দিতে চাই, অথচ, পাশববৃত্তির ভিতর আমার ভোগাকাঙ্ক্ষার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটাইতে চাই। হায়রে, তাইত আমার দৈন্য, তাইত দুঃখ, তাইত সংগ্রাম, তাইত অন্ধকার তাইত মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাই না। জীবনদেবতা কেবলই মা ভৈঃ বাণীতে মর্ম্মগৃহ কাঁপাইয়া তুলিতেছেন ও কি হুঙ্কারময়ী ওঙ্কার বাণী! তবুও বধির হইয়া রহিলাম! হায়! হায়! তবে আমার কপালে দুঃখভোগ হইবে না ত কাহার হইবে? ভূমা ইচ্ছার সাধনই পরম সাধন। ভূমানন্দলোক মর্ত্ত্যের ধূলির সঙ্গে কি তুলিত হইবে?

এ ভূমানন্দের কথা কাহার কাছে বল? কে এ কথার মর্য্যাদা দান করিবে? জাতিতে জাতিতে দেশেতে দেশেতে পরিবারে পরিবারে প্রতি জীবনে জীবনে এ কি দীন লক্ষ্য সাধন? জাতি, ব্যক্তি ও সমষ্টিতে। প্রতি জীবনের কি লক্ষ্য? যেমন বীজ তেমনই ত ফল আশা করিবে? কই জীবনে জীবনে সে দেবপ্রভাব। আজ যাহার ভিতর বন্ধুত্বের মোহন স্বরূপ পরিচয় লাভ হইল, কোথায় কাল তাহার সে মঙ্গল সত্তা! আজ যাহার প্রাণভরা দেশহিতৈষণা কোথায় কাল তাহার সে মঙ্গল প্রেরণা? এমনি করিয়া যদি জীবন সব ক্ষুদ্র মোহেই মুগ্ধ হয়, তবে আর কেন উপদেশের

কথা ? এই ত দলাদলি, ভেদাভেদ, হানাহানি, রক্তারক্তির আয়োজন, এই ত দুর্গতি—যুগ যুগান্তরের ইতিহাস ত মানুষ পাঠ করিতেছে, তবু কই জাগিল তেমন স্তব্ধ কমনীয়তা ? তবুও চলিয়াছে সংসার সেই ভ্রান্ত পথেই উপকরণভরা সুখের ডালি সাজাইয়া ! হয়ত কখনও এমনও হয়, যখন চতুর্দ্দিকে বিপদজাল ঘনাইয়া আসে, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, মানুষের ক্ষুদ্র শক্তি পরাস্ত, তখন সে ত্রস্ত ভীত হইয়া দেবতার বুকে আশ্রয় লইতে চাহিল, আবার বিপদঘোর যখনই কাটিয়া যাইল তৎক্ষণাৎ যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল। তা যদি হয় তবে সে দুঃখ কে ঘুচাইবে ? যদি নিজ পদে নিজ বন্ধনডোর পরিধান করি কে রক্ষা করিবে ? তবুত অভয়বাণী অহর্নিশি শুনিতেছি, পরম কল্যাণময়ী ইচ্ছারই জয় হইবে। কয়জন মানব কল্যাণব্রত গ্রহণ করিয়াছে ? কয়জন ভূমানন্দে পাগল হইতেছে ? ধন্য তিনি যিনি আত্মযোগে যোগসুন্দরে যোগমগ্ন। ধন্য সাধনা ! তাঁহার কাছে অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাস সকলই উপেক্ষণীয়।

ওগো আমি দীন হইয়াও যে নিত্য শাশ্বত সম্পদ, যে নিত্য শান্তি তাহার ভিখারী। আমিও যে আজ একবার উর্দ্ধলোকে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইতেছি, আমিও যে বিশ্বকল্যাণে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাই।

ভক্তজয়গাথা চিরদিন সত্যের জয় ঘোষণা করিতেছে—কত নিষ্পেষণ, কত বেদনা দান, তবুও ত পরাজয় স্বীকার করিতেই হইল। সেই মহিমালোকেই যাইতে আকাঙ্ক্ষা।

বাঞ্ছনীয় সে দীক্ষা, আত্মসাধনা, ভক্তপদরেণু মস্তকে লইয়া শত শত দুর্ব্বলতার ভিতরই দেবশক্তি পাইতে চাই। আত্ম-সাধনায় সকল বাসনা লীন হইবে, শুদ্ধ পুণ্যস্বরূপে আমার সত্য পরিচয় লাভ করিবার সাধ। সে পুণ্য মাধুরী লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া ছুটি। তবে আসুক্ অন্তরে সে অটল ধৈর্য্য-বীর্য্য, আসুক্ সে দেবশক্তি! ওগো আত্মসুন্দর, এস আত্মপুরে, মুগ্ধ করিয়া দাও, ডুবিয়া যাই তোমার কল্যাণসাগরে। আর কি বলি! শান্তি শান্তি শান্তি!

(১২)

মানবের গন্তব্য স্থান

ভকত-সাধনা মাঝে
জয় ভেরী বেজে যায়,
মরণ কুহেলী হরে
প্রাণপাখী হেসে চায়।

খেলা যবে শেষ হ'ল,
উধাও আঁধার রাত্রি,
পেলে ওকি বরাভয়,
পাগল আকুল যাত্রি।
ধন্য হ'ল গান খানি
সখার বরেতে যার,
জয়ধ্বনি গেয়ে ওঠে,
পরে সে অমৃত হার।
আঁধার রজনী বুকে
জ্যোতিলীলা ও কি হাসে!
চুপে চুপে গেয়ে যায়
মরি কি ললিত ভাষে!
অমর হয়েছে নর,
সে কোন্ তপস্যাবলে?
গেয়ে ওঠে সত্য বাণী,
ধ্যানলোকে নিয়ে চলে।
গম্ভীর বিরাট্ বিশ্বে
ও-কি এ আসনখানি
জয়মাল্য গলে দেবে
কে গো নেবে বুকে টানি?

গেও নাক দুখগান

সমাধি শয়ান পাশে,

জাগে যথা যোগী ঋষি,

যোগের পুলকে হাসে।

অনন্তে জাগে সে পাখী

সখার মোহন রূপে,

আনন্দে পাগল হোয়ে

পূজে সেই বিশ্বভূপে।

ভকত জীবন খানি

গেয়ে যায় জয় গান,

কোথা গেল হীন দ্বন্দ্ব

কোথা যায় সব টান!

যুগে যুগে ভক্ত-চিত্তমুকুরে মানবের সত্য আদর্শ ছবি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা কে, আমাদের কি হইতে হইবে—ইহাতেই মর্ম্মরহস্য উদ্ঘাটিত। কেমন করিয়া দেবপ্রাণ যীশুর জীবন-গাথাতে শত দরিদ্রতার ভিতরই একদিন মহাগৌরবময় গম্ভীর প্রশান্ত শান্তস্বরূপ ভগবদিচ্ছা-সাধনার মধ্য দিয়াই প্রস্ফুটিত হইল? তাই দুঃখদারিদ্র্যের মঙ্গল মহিমার ভিতর দেব আশীর্ব্বাদের পুণ্য সত্তা! নির্ম্মম, নিষ্ঠুর পীড়নের ভিতর ভিখারীর বেশেই শেবখেলা

শেষ হইয়া যাইল; তবুত ধরণীর বুকে নিত্য কল্যাণবাণী প্রতিধ্বনিত হইতেছে—ঐহিক ধনমানেই দেবত্বের সাধনা সীমাবদ্ধ নয়, দীনের জন্যও দেব আশীর্ব্বাদ, পূজার আসন পাতা হইবে। তাঁহার জীবন ইতিহাসে কোথায় পার্থিব সুখ ঐশ্বর্য্যের পিপাসা? কেবল দিবসের পর দিবস বৎসরের পর বৎসর, আশৈশব লীলাখেলায় কেমন করিয়া দেবত্বের সাধনা জাগিয়া উঠিতেছে, আজ সে কথার সাক্ষ্যই কত ভাবে প্রচারিত হইতেছে।

পরোপকার ব্রতে উদ্‌যাপিত শান্ত পুণ্যশোভন জীবনখানির কি পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন! তাই করুণাময় দুঃখ তাপ শোক বিরহ মিথ্যা দ্বন্দ্ব জড়তা হইতে মরণপথের যাত্রীকে হাত ধরিয়া মুক্তির পথে আহ্বান করিয়াছেন। তাই পরদুঃখকাতর বিশ্বপ্রেমে পাগলপ্রাণ সব যুগ যুগান্তর ধরিয়া সকলকেই প্রাণের ভিতর টানিয়া লইয়াছে—অতি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানেও কি সত্যনিষ্ঠা! অন্ধ আতুর অস্পৃশ্যজনকেও বুকে টানিয়া সেবা যত্নে অসহায়ের সহায় হইয়াছেন গৃহে গৃহে দেব আদর্শ জাগাইয়াছেন। বিশ্বমানবের কল্যাণসাধনে প্রেমময়ের জয়গান গাহিয়া বিশ্বযজ্ঞে ভক্তপ্রাণের কি সর্ব্বস্ব আহুতি? জগতের যত নিন্দা গ্লানি সব কিছুর ঊর্দ্ধে ওকি পবিত্র আত্মার মুক্ত বিহার! আহা, মানুষ কাঁটার মালা

পরাইয়া দিল, শুভ্র সুন্দর তনুখানি রক্তাক্ত, তবু কোমল কণ্ঠ ক্ষমার করুণ প্রার্থনা দেবচরণে নিবেদন করিল! মৃত্যুর পরপারে তাই জয়শঙ্খ বাজিয়া উঠিল! আর এপারে আজও শত শত প্রাণ ভক্তের জয়গৌরব ঘোষণা করিতে ভক্তপূজার অর্ঘ্য সাজাইয়া চলিয়াছে। তাইত মানুষ তাহার দীনযাত্রার ভিতরই, সাংসারিকতার মাঝখানেই, পরম সত্য জীবনের সত্য আনন্দ সন্ধান করিতে ছুটিয়াছে। দেবত্বের শুভ্র পুণ্য জ্যোতিঃপ্রভা বেদনার ভিতরই উদ্ভাসিত হইবে। ধন্য সব ভক্তজীবন! মানবের অন্ধ যাত্রাপথে তাঁহারা অমৃতের আলো জ্বালাইয়া আসেন—সকল দুঃখবেদনা আমার জন্য কি কল্যাণ বহন করিয়া আনিবে তাহাত জানি না—জানি, পরম কল্যাণ হইবেই হইবে।

এ জীবনরহস্য কে ভেদ করিবে? ক্ষুদ্র সসীম দৃষ্টি এই পার্থিব জীবনের সুখ দুঃখকেই চরম মনে করি। এই সব কিছুর ভিতরই কি সত্য আনন্দ সত্য সাধনা লাভ হইবে, তাহা ত বুঝিতে পারি না। কয়জন সে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্তা লাভ করে? আজ একজনকে দুঃখে শোকে মুহ্যমান দেখিয়া কত সান্ত্বনার কথা বলি কাল আবার সেই শোক দুঃখেই আমি নিজে মুহ্যমান! সত্য ধর্ম্ম প্রেরণার ভিতরই মানুষের কর্ম্মসাধনা। যদি সাধুতাই আমার জীবনের

পরম লক্ষ্য হয়, তবে কেন ক্ষণিক তুর্ব্বলতার জন্য বিলাপ ক্রন্দন !

কেন পরমাত্মা আমাদের তবে এ জগতে আনিলেন ? আশৈশব এই লীলাগৃহে পুতুলের মত জড়ের খেলা খেলিতে আসিয়াছি, না, মঙ্গলবিধাতার মঙ্গল ইচ্ছার ভিতর আমার হাসিকান্না নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আমিও কি ঐ কুসুমকাননে পুষ্পদলের মত, কাননে কাননে বৃক্ষরাজির মত, ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গের মত, অজ্ঞানঘোরে ধ্বংসের পথেই ছুটিয়া চলিব ? তবে আমার এ চেতনা কেন ? তবে ভূমা মহানের জ্ঞান মহিমারই বা বিচিত্রতা কোথায় ? তবে কেন আমার মর্ম্ম-তলে বিবেকের নিত্য জাগরণ ? যে আনন্দসত্তার ভিতর বিশ্বের অনন্ত প্রকাশ, সে আনন্দ সত্তাতেই আমার আমিত্বের অস্তিত্বও ত বিদ্যমান। তাই ত ক্ষণিক খেলাধূলার ভিতরও আমার নিত্য সাধনা। কই ক্ষণিক লীলাঘরে আমার জীবনরহস্যের জটিল সমাধান হয় ? কত যুক্তি শাস্ত্রের মাঝখানেই জীবাত্মা কোন্ অজানা লোকের সন্ধান পাইতে চাহে। জানি ত, ধূলির দেহ ধূলিমুষ্টিতে পরিণত হইবে। আমার এই সাধের রূপসভার আনন্দ ঘটা থামিয়া যাইবে তবুও ত এই রূপখানির অন্তরালে বসিয়া চিন্ময় আমি আমার স্বধর্ম্ম পালন করিয়াই চলিয়াছি। কত পরিবর্ত্তন ! তাহার

ভিতরই জাগ্রত আমি চেতনার নব নব সুরে, আমার নিত্য নূতন দীক্ষার ভিতর নব নব উন্নত লোকেই যাত্রা। দেহধর্ম্ম দেহের ভিতর পরিতৃপ্ত হইতে চায়, অথচ মুক্ত শুদ্ধ আত্মা সে তার সত্য স্বরূপেই ফুটিতে চাহে! তাই দৈহিক ভোগের ভিতর কিছুতে তাহার আর আনন্দ আরাম লাভ হয় না। তাই ঐহিক তৃপ্তিতে আত্মার এক অব্যক্ত অতৃপ্তি। মানবের আত্মসত্তার ভিতরই তাহার দেবত্ব-স্বাতন্ত্র্য মহিমা। সকল কিছুর ভিতরই এই চেতনধাম। আত্মপুরে আত্মসত্তা এক বিচিত্র জীবনশক্তি দান করিতেছে। এ শক্তি ধূলিমুষ্টি নয়—এ যে অমরত্ব, দেবত্ব। তাই ধূলির খেলা ধূলিতেই অবসান; আর দেবজাত, দেবস্বরূপ, অমর আত্মা অমৃতধামেই অগ্রসর।

এই আত্মজ্ঞানেই মানবের চরম সার্থকতা—ইহাই অনন্ত গতির পথ নির্দ্দিষ্ট করে। যখন শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত নির্ম্মল আমি, তখন আমার দৈহিকতা ক্ষুদ্রতা কোথায় লয় হইল? তখন মহামঙ্গললোকে আমার অক্ষয় জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ উদ্ভাসিত। এই রূপের পরপারে অরূপরতন আমার জন্য কি রাখিয়াছেন কে জানে? আমার এ দীন আঁখির কোথায় সে জ্যোতিঃ? তবুও প্রকৃতির আনন্দবুকে তাহার শান্ত ছন্দ প্রতিদিনের লীলাখেলায় মুক্তির আনন্দ-উদ্বোধন সঙ্গীত সাম্যতার

আনন্দগান, নবজীবন হইতে নব জীবন লাভের আশা জাগাইয়া তুলিতেছে।

ভূচরে খেচরে, নদীতে পর্ব্বতে কাননে কান্তারে, বিহগ-বিহগীর কলতানে, এই বিশ্বপ্রকাশের ভিতর কোন্ অজানার গোপন ইচ্ছা প্রচারিত হয়? আবার, আমার এই আকুল উদাস বুকে ও কাহার শাশ্বত প্রকাশ? ও কাহার মঙ্গলময়ী বাণী আমার অনন্ত জাগরণের কথা কাণে কাণে শুনাইয়া যাইতেছে? তাইত জীবাত্মার এই শ্রান্ত ক্লান্ত সংগ্রাম সাজ, তাইত নীরস কঠোর দীক্ষা, তাইত দেবত্বের শুভ সাধনা, তাইত শুদ্ধ সুনির্ম্মল সুন্দরের আনন্দ বিকাশ! কে জানে সে কেমনতর মহিমা গৌরব? ধন্য তিনি যিনি সে চিদানন্দ উপলব্ধি করেন। ধন্য আত্মার এই অনন্ত পিপাসা, ভক্ত আনন্দ সাধনা—দেবতার অধিকার। এ কোন্ প্রাণের তপস্যা? এ কি অমৃত আলো আমার চরম সাধনাপথে?

এই অনন্তের ক্ষুধাতেই, নিত্য সত্য পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভের পিপাসা। আজ আমার এই চিদানন্দময় স্বরূপখানি যুগ যুগান্তরের কত প্রাণময়ী সাধনার পরম অভিব্যক্তি! কে জানে ঐ অজানার আনন্দ বুকে অনন্ত পথে নবতর উজ্জ্বল মহিমা কেমন করিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র চেতনপুরে মহিমান্বিত হইবে!

তাইত এই বিজ্ঞানমহিমা, দ্যুলোকে ভূলোকে জ্যোতিষ্ক-লোকে কত বিচিত্র রহস্য, প্রকৃতির প্রাণলীলা, কত প্রাণের গোপন প্রকাশ দিনে দিনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। এ কি রহস্য! পরম জ্ঞানের এ কি লীলা! অন্তর্য্যামী সর্ব্বশক্তিময়ী দেবতার এ কি বিরাট জ্ঞানসিন্ধু এই ক্ষুদ্র মানব হৃদয়ে উদ্বেলিত! সে জ্ঞানসাগরে সে কেবলই ডুবিতে যায়! কোথায় আদি ও কোথায় অন্ত কে জানে? এই অনন্ত গতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনন্ত সত্তাতেই প্রতিষ্ঠিত।

এই ইন্দ্রিয়জ্ঞানের মহিমাতেই চিত্তমুকুরে অনন্তের ছবি প্রতিফলিত। এই অনন্ত প্রভা জীবাত্মাতে প্রভাসিত। তাইত তাহার প্রতিদিনের প্রাণযজ্ঞে কত বাসনা কামনার আহুতিদান। তাইত দিনরজনী জীবাত্মার এ আকুল সংগ্রাম। তাইত তুচ্ছ হিংসা দ্বেষ তরল আমোদ প্রমোদের পথে দেবসত্তা লাভের জন্য অহর্নিশি জাগ্রত সাধনা। যখন, মানুষ দেবসত্তা ভুলিতে চাহে, যখনই ঐহিকতার ভিতর সার্থকতা লাভ করিতে চাহে, তখনই ক্লান্তি, তখনই অশান্তি। এদিকে ক্ষণভঙ্গুর দেহ জরাজীর্ণ। এই ক্ষণস্থায়ী সংসার উপকরণ কোথায় আমার চরম পথের সঙ্গী হয়? পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, সখা সুহৃদ কেহত আমার সাথের সাথী হইল না। কই আমার ঐহিক ধর্ম্ম আমার চরম

সুখের সহায় হয়? সব দৃশ্যইত অদৃশ্যের অব্যক্ত যবনিকার অন্তরালে অন্তর্হিত। পাপেই আত্মার দাসত্ব, পুণ্যেই তাহার স্বাধীনতা। পাপের প্রতাপ সীমাবদ্ধ, আর পুণ্য-প্রভায় আত্মার উজ্জ্বল প্রকাশ। হায়! হায়! ভ্রমান্ধ মানব বুঝিতে পারিল না আত্মার মুক্ত আনন্দ স্বরূপ, বুঝিতে পারিল না তাহার নিত্য আনন্দসত্তা। তাই দৈহিক সুখেই তৃপ্ত হইতে চাহিল, ভোগের আগুন জ্বালাইয়া তুলিল। কোথায় সে তৃপ্তি, কোথায় সে শান্তি? বিবেকের জাগ্রত শাসন শুনি না, তাই পদে পদে লাঞ্ছনা, পদে পদে পদস্খলন।

বিশ্বপ্রাণ বিশ্বচেতনায় ঐ চেতন-সুর অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতেছেন। সে জন্যই জীবাত্মার অতীন্দ্রিয় লোকে যাইবার আহ্বান। তাই তাহার পাপ, অধর্ম্ম কেবলই প্রায়শ্চিত্তের অনল অন্তঃপুরে জ্বালাইয়া তুলে! তাই সংসারে যত কিছু প্রতারণা উৎপীড়ন! কোথায় জীবাত্মার শান্ত বিশ্রাম? যতক্ষণ না সে বিবেকের 'মা ভৈঃ' বাণী শুনিতে পায়, যতক্ষণ না সে তাহার শান্ত সত্তা উপলব্ধি করে, ততক্ষণ কোথায় দৈহিকতার ভিতর পরম তৃপ্তি?

অথচ এ কি অধিকার! নানা সংঘর্ষণের ভিতরই বিবেকের ইঙ্গিত মানবের প্রকৃত গন্তব্যস্থান প্রকাশ করে। যখন ভ্রম, যখন অসত্য পথে চলি, তখনই বেদনার মোহমেঘ

হৃদয়াকাশে জমিয়া উঠে। এই ঘন মোহমেঘজালের ভিতরই আবার দিব্যপ্রভা। তাইত দেব আত্মা সত্য পথের পথিক। এই ত ঐহিক লীলা, এই ত ধ্বংসগান, এই ত ভীতিমোহ, এই ত শোক তাপ, এই ত শত শত দেশের বিনাশকাহিনী এই ত কত রোগ শোক, কত প্রিয় ধনের আকুল করা অকাল যাত্রা! কেন এ সব? কেন এ ঐহিক ভোগের রাজ্যে নিত্য দীন মর্ম্মপীড়ন? যিনি ঐহিকতার উর্দ্ধে শাশ্বত লোকে দেবমহিমা লাভ করিয়াছেন, ধন্য তাঁহার অব্যক্ত আনন্দ আরাম। কি ধনী আর নির্ধন, যাঁহার বুকে ভক্তপ্রাণের প্রেমপুণ্যপ্রভা উদ্ভাসিত ধন্য তাঁহার দিব্য বিভা। যাঁহার সকল ভোগের অর্ঘ্য দেবচরণে উৎসর্গীকৃত, ধন্য তাঁহার জীবনের পুণ্যনিষ্ঠা, দেবসাধনা! তখন কোথায় মৃত্যুবিভীষিকা? কোথায় সংসারনিষ্পেষণ? ধন্য মুক্ত আত্মার দেবসত্তা, ধন্য আত্মপুরে নিত্য চিদানন্দবিহার! কে আর বাধা দিবে? ভীষণ তিমির অন্ধকার, ঝঞ্ঝাপীড়ন, সকল কিছুর ভিতর দেবযাত্রীর দিব্য চৈতন্যে বিবেকের শুভ্র জ্যোতিমহিমা; তাই তাঁহার অনন্ত পথে অনন্ত শক্তি, মুক্তি।

এই যদি মানবের অনন্ত গতি, চরম গন্তব্য স্থান, তবে দীন যাত্রীর কেন ক্ষণে ক্ষণে এমন মোহবিকার? কেন

পরস্পরে এত সংঘর্ষণ? কেন এ জটিল কুহেলীজাল? আবার কেন অন্যদিকে প্রকৃতির এ শান্ত ছবি? কেন তবে ভক্তির এ অনন্ত সাধনা—আনন্দগান? এ সব কি তবে মিথ্যা? দৃশ্য লীলা আমায় এ কি কুহকঘোরে লইয়া যায়! আমার সে অব্যক্ত পরম আনন্দ সুধাপানের পিপাসা কই? স্বাস্থ্য আরাম ধন মান সুখ সম্ভোগ দৈহিকতার ভিতরই ভোগ করিতে চাই। পরমাত্মার নিত্যস্বরূপ উপলব্ধির ভিতর শাশ্বত আনন্দলাভের জন্য আকুলতা কই? হায়! হায়! ক্ষণিক ধন মান জ্ঞান বুদ্ধি গরিমায় আমার কত চাতুরী। কি গর্ব্বিত তেজ! বেশ ত চলি। দেশকালাতীত নির্ম্মল আনন্দলোকে জাগরণের আকাঙ্ক্ষা আমার তেমন করিয়া জাগে কই? বিশ্ব বুকে এ কিসের আনন্দ বিকাশ? এ কি অনন্তের শুভ্র শান্ত জ্যোতি! ধন্য আত্মপুরে সত্য ধর্ম্মের গোপন বাণী। তাইত ক্ষুদ্র দুটী আঁখি মানবের ঊর্দ্ধলোকে উধাও হইয়া যাইতে চাহে। তবু এ কি অদৃষ্টের বেদন পরিহাস! সকল দুঃখ তাপ, সকল বিড়ম্বনা, আমার পশু প্রকৃতির ক্ষণিক উত্তেজনা কেমন করিয়া দেবত্বের গৌরব দান করিবে কে জানে? ভুলিয়া যাই দেবসত্তা, ভাবি এ দুদিনের ভোগলীলায় মিটাইয়া লই দেহের সকল পিপাসা। দেহের পরপারে হয়ত নিত্য কল্যাণ

জাগিবে। এমনি করিয়া হেলায় খেলায় কি আমার দেবত্ব লাভ হইবে? কখনও হয় ত ভয়ে ভীত চঞ্চলমুগ্ধ মানুষ পুণ্য পথে অগ্রসর হইতে চাহে—তাহার স্বর্গভোগও দেহের সুখ সম্ভোগেই জড়িত। এম্‌নি করিয়া সাধনহীন মানবের হীন আদর্শ সত্যধর্ম্মের কি লাঞ্ছনাই করে! কই ভক্তপ্রাণের মঙ্গল মধুর জাগরণবাণী তাহার মুক্তি পথের সহায় হয়? কই সে বিশ্বাস তাহার দীন যাত্রাপথে? তাইত দেবত্ব ফুটিয়া উঠিল না, তাইত দেবসত্তার ভিতর নিত্য লাঞ্ছনা।

হয়ত মৌখিক কত কিছু সত্যবাণী প্রচার করি, কিন্তু জীবনে কই তাহাদের? কত ব্যর্থ উপদেশ, কত কথার গাঁথুনি, কত জটিল তর্ক! কই সে উদার স্নেহ প্রেমভক্তি? চতুর্দ্দিকে সঙ্কীর্ণতার জটিল জাল! কই সে সত্য উদার প্রেরণা? কই জীবনে জীবনে সে সত্যসাধনপ্রিয়তা—সাধকের প্রাণময়ী নিষ্ঠা তপস্যা?

ওগো প্রেমময় ভক্তবৎসল! কই ভক্ত-প্রাণের দেব-আদর্শ আমার যাত্রাপথে? দয়া কর, সকল দুঃখ শোকে, ইন্দ্রিয় বিকারের ভিতর একবার আলো জ্বালিয়া প্রকাশিত হও। কেন সৃষ্টি করিলে আমায় ওগো প্রেমের ঠাকুর! একবার শত ভুল ভ্রান্তির ভিতরই, ওগো আমার প্রাণের দেবতা, আমার নিত্য স্বরূপখানি বিকশিত কর। তবেই ত

আমি আমার বাসনা কুহকজাল মোচন করিয়া মুক্তির পথে ছুটিব। আমার ক্ষুদ্র জীবনখানি সে পথে যাইবার সহায় হউক। কি আলো জ্বলিবে ওগো জ্যোতির্ম্ময় ভূমা মহান্, আমার এ ব্যর্থ ক্লান্ত জীবনে ? কত দুর্ব্বলতা, তবু তোমার নাম করি ঠাকুর। তুমি যদি স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রাণযোগে গাঁথিয়াছ, তবে আমার দেবস্বভাবের সুকোমল সুনির্ম্মল স্বরূপখানি আমার সকল উচ্ছ্বাসে, বাক্যে, ব্যবহারে জাগ্রত কর। এরূপের লীলাত চিরদিনের নহে। এ যে অনন্ত আহ্বানের জাগরণ উদ্বোধন। সব কিছুত পড়িয়া থাকিবে,—সবইত শূন্য, ওগো আমার আত্মসুন্দর দেবদুর্ল্ভ ধন! তোমার জ্যোতিস্বরূপে আমার আত্মার জ্যোতিঃ উজ্জ্বল কর, পরিপূর্ণ কল্যাণ দান কর।

---

(১৩)

অমরত্ব

কে জানে কেমন সে
বিচিত্র বিধান,
কেমনে বুঝিব আমি
আনন্দ নিদান !

যবে তুমি নেবে বঁধু,
আনন্দ নিলয়,
কে জানে কেমনে গাব
নামের বিজয় !
কত নামে জাগে সেথা,
কে জানে কিরূপে,
ভ'রে আছে সুধা-গন্ধে,
পুণ্য মধু-ধূপে !
সখা যবে হেসে নেবে
আনন্দ বুকেতে,
বাড়ী যাব কত খেলা
খেলিব সুখেতে !
এক তুমি আছ জেগে,
আনন্দ নিলয়,
বিশ্বে বহে প্রাণ গঙ্গা
সকলি বিলয় !
কোথা গেল মৃত্যুব্যথা
ভুবন ভরিয়া
স্রষ্টা মোরে ঘিরে আছে
নিবিড় করিয়া ।

অবিনাশী হোল সব
নিয়তির বরে,
এক হ'তে একে যাওয়া
অনন্তেরি ঘরে।
জানি আমি আছি জেগে
বিমল সুন্দর,
ছেয়ে আছে দেবগণে
অমল অম্বর।

সংসারের দৈন্যপীড়ন, মৃত্যুর নির্ম্মম আঘাত সব কিছুর ভিতরই চিরদিন ভক্ত প্রাণের নব অভ্যুত্থান অমরত্বের মহাবাণী আনন্দে ঘোষিত। এই নব জীবনলাভেই অমর-পুরের আনন্দ নিমন্ত্রণপত্র। আত্মা এই ধূলিময় দেহেই সুপ্রতিষ্ঠিত নহে, কখনও ধূলিসাৎ হইবে না। বিশ্বের সকল শক্তি সর্ব্বশক্তিমানেরই আনন্দদায়িনী শক্তি, তেমনই আত্মপ্রকাশে সেই পরম সত্তারই সত্য প্রকাশ।

মানবের এই অমরত্বলাভ, তাহার এই দেব-অধিকার, তাহার ত্রিবিধ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। প্রথম সর্ব্বশক্তিমান্ আদি কবি, সকল কারণের কারণ, সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতা। মানব এ কথা তাহার আত্মজ্ঞানে উপলব্ধি করিয়াছে। দ্বিতীয় মানবের দেবভাব ও দেবত্বের অধিকারে পরমাত্মা

ও জীবাত্মার আনন্দ সহবাসের অধিকার লাভ সে ধারণা করিয়াছে। আর তৃতীয় তার অনন্ত জীবনের আশা। যাঁহার জীবনে এই ত্রিভাবের সাধনা চলিয়াছে তিনি এই দেহলোকেই দেহাতীত শুদ্ধ শান্ত স্বরূপ লাভ করেন, চিরবাঞ্ছিত ভক্তপদবীর অধিকারী হন।

যদি দৈনিক জীবনে অতি ক্ষুদ্র ঘটনাটিও দেবতার প্রিয়সঙ্গের পরিচয় দান করিত, তবে ত আর মানব ইতিহাস ব্যর্থ ক্ষুদ্র তুচ্ছ নির্ম্মম কহিনীতে কলঙ্কিত হইত না—তবে আজ মৃত্যুবিভীষিকা এমনি করিয়া কাল করালরূপে তাহার ভয়ের মোহ জাগাইত না।

তবে দেবত্বের কাহিনী মানুষ স্মরণ করুক আর নাই করুক, অতি তুচ্ছতম জীবনও দেবতার দান। কাহারও বিনাশ নাই। আমার আমি এক চেতন সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত। সকল বদনকমলে অনন্তেরই আনন্দ হাসি।

যখন অমরত্বে প্রতিষ্ঠিত এই জীবন, তখন একদিন জয়ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে, যাব আনন্দে ভবসাগর পার হইয়া, আনন্দে আনন্দধামে ভবের খেলা খেলিতে খেলিতেই হাসিয়া উঠিব। অনন্তের আহ্বান আসিয়াছে—ধূলির দেহ ধূলির সমাবেশে গড়িয়া উঠে, আবার সেই এক চেতন সত্তায় আমার সত্তা—চেতনাময় অবিনাশী মুক্ত আত্মার অস্তিত্ব, সেই আমার

কোথায় লয়? কে জানে কেমনতর সে দিব্যস্বরূপলাভ আর পুণ্য আনন্দ সম্ভোগ? এই পরিবর্ত্তনশীল জগৎ-চরাচরে যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার জন্য এ ভীতিমোহ কেন? কেন ভবিষ্যতের ব্যর্থ বেদনার কল্পনা? কেন হা হুতাশ? ক্ষুদ্র জ্ঞানের সাধ্য কোথায় সে জটিল কুহেলী ভেদ করে? জড় ভাষার শক্তি কোথায় তাহা প্রকাশ করে? অনুসন্ধিৎসু মানব যতই মৃত্যু যবনিকা উত্তোলন করিতে চাহে, ততই অজানার বুকে সমস্ত অজানাই রহিয়া যায়।

কেবল এই আশা বুকে জাগিয়া আছে যে, অনন্ত জীবন আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ভাগ্যলিপি কে খণ্ডন করে? জানি একদিন সকল বেদনাশ্রু মুছিয়া যাইবে—একদিন মৃত্যুব্যথার, সকল দীনতার অবসান হইবে। নশ্বর ধূলি খেলার ভিতরই অমরত্বের আশা; তাই যুগে যুগে সকল জাতির ইতিহাসে আত্মার অমরত্বের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। যে মানবের অপরিস্ফুট জ্ঞান প্রাণের কথা ভাল করিয়া প্রকাশ করিতেও পারে নাই, তবুত তাহার দেব-উপাদানে গঠিত প্রাণ ভবিষ্যতের চির জ্যোতির্ম্ময় প্রতিষ্ঠা দেখিতে চাহিয়াছে।

সকল কালে—সকল ধর্ম্মেই—মানুষ তাহার প্রিয়ধনের মৃত্যুশীতল হিমকঠোর রূপখানিকে অশ্রুধারায় স্নাত করিতে

করিতেই সজল নয়নে মৃত্যুর পরপারে তাহার প্রিয়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে। তাই মানব অমর জীবনের আশায় সকল বিরহ ব্যথা সহ্য করে, আর আশার আলোকে প্রতীক্ষা করে।

প্রকৃতির লীলাপুরে কেবলই পরিবর্ত্তন। তবু কেন মানব এ আঁধার যবনিকার অন্তরালে নিত্য আত্মার দর্শন পাইতে চাহে? কেবলই শিহরণ। করজোড়ে কেবলই প্রার্থনা—'মা মা হিংস' আমায় বিনাশ করিও না ঠাকুর।

আজ যাহাকে ক্ষুদ্র ধূলিকণা ভাবি, পদদলিত করিয়া চলি, তাহাই হয়ত একদিন বিরাট্ গিরিশৃঙ্গ গঠন করিয়াছিল। কোথায় সে তুঙ্গ পর্ব্বত! অথচ আজ তার অণুপরমাণু জগৎবুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহারও ত বিনাশ নাই। এমনি করিয়া ধূলিকণারও যদি অনন্ত প্রতিষ্ঠা জগতে, তবে আমার এ দেবত্ব, এ অমরত্ব, এ আত্মচৈতন্যই কি বিলয় প্রাপ্ত হইবে? যাহার বুকে আবহমান কাল ধরিয়া ক্ষুদ্র অণু কণারও অস্তিত্ব জাগে, সেই বুকে আমার অমরত্বের আশাই কি কেবল মরণপথে ছুটিয়া চলিবে?

জগতের বুকে একি দ্বৈত দ্বন্দ্ব—এই অচেতন—এই চেতন, অথচ অচেতনেই চেতনার প্রাণশক্তির মঙ্গল মিলন-সমাবেশে বিচিত্র রূপের মাধুরী রচিত হয়। তাইত

কাননে কাননে পুষ্পদলের উজ্জ্বল মাধুরী, তাইত পাতায় পাতায় বৃক্ষলতার জড়ের ভিতরই চেতনের আনন্দ সমাবেশে বিচিত্র প্রাণের খাদ্য সংগৃহীত হইতেছে। এইত রূপমাধুর্য্যের গোপন কথা। অতি ক্ষুদ্র পুষ্পটিও তার বিচিত্র পুষ্পসত্তার স্বরূপেই বিকশিত হইয়া তার অব্যক্ত চেতনসুন্দরের মহিমা প্রকাশ করে।

জড়রূপ কি তবে বিচিত্র চিরনবীনের চেতন রহস্যলীলা ? যাহাকে শুধু ছাই, শুধু ধূলি বলিতে যাইলাম তাহার জন্মকথা চৈতন্যেই জাগ্রত, আর জাগ্রত চৈতন্য আমিই কি কেবল ঘুমাইয়া পড়িব ? কি জানি, কেমন করিয়া নবসত্তা লাভ হইবে ?

এমনও দুর্ম্মতি হয়, অনন্ত জীবনের পথে কেমন করিয়া ছুটিবে ভয়ে ভীত আত্মা। তাই চির অন্ধকার বিনাশের পথে ছুটিতে চাহে ! অথচ কে যেন অন্তরতর অন্তরতম বিবেকের অনাহত ভেরী বাজাইয়া আহ্বান করেন—অনন্তের পথে ছুটিতে হইবে ন্যায়দাতা বিধাতার অমোঘ বিধান বজ্রকঠোর শাসন, মস্তক অবনত করিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। কোথায় পলায়ন করিবে ? আমার পাপ পুণ্যের কর্ম্মকাহিনী আমারই সঙ্গে অনন্ত পথে ছুটিয়া চলিবে।

অনন্ত আলোকসিন্ধু হইতেই আমার এই চেতন কনক-

আলো উর্দ্ধে দেবলোকে লইয়া যাইবেই যাইবে। তাই চিরচৈতন্য আত্মসুন্দর জাগরণ মন্ত্রে কখনও আত্ম প্রদীপ বুকে জ্বালাইয়া নিমগ্ন হইতে চায় জলধিগর্ভে, আবার কখনও ধাবিত হয় গিরিশৃঙ্গে, আবার কখনও পূজার আসন-খানি দেবাদিদেব মহাদেবের চরণপ্রান্তে পাতিয়া বসিতে যায় আনন্দধ্যান আসনে। আত্মসুন্দরে আত্মপ্রতিষ্ঠা, তাই সকল পরিবর্ত্তনে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানে, প্রাণ-যোগের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া চলিয়াছে—সব হারাইল, তবু আমার জাগরণ ফুরাইল না।

এই যে অনন্ত জাগরণ, এ যে প্রতি মানবের ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা, নিত্য মঙ্গল পরিচয়। তাই জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন কথা—যেদিন অমরত্বে সন্দিহান হই, তখন দেবতা আমার অমৃতময়, তিনিও যে ফুরাইয়া যান।

আমাদের দৈহিক শক্তি সামর্থ্য—সকল শক্তি কল্যাণের জন্য, দেহরক্ষার জন্য, জীবনের পরম পুষ্টিসাধনের জন্যই মঙ্গল বিধাতার এ মঙ্গল দান। কোনও শক্তিই ব্যর্থ নয়। আবার এই দৈহিকতার ভিতরই যদি তার চরম সার্থকতা হইত, তবে তাহার অন্তঃপুরে এই দেবশক্তির উজ্জ্বল মহিমা মহিমান্বিত হইত না। তাহা হইলে অন্ধশক্তি অন্ধতার ঘনতম জটিল জালেই, অজ্ঞান তিমির অন্ধকারেই তাহার

সমস্ত চরিতার্থ হইত। তাহা হইলে মনোবৃত্তির এ উত্তাল তরঙ্গদোল কেন? তবে কেন মনোবৃত্তিসংযমের কঠোর সাধনা? তবে কেন পূজার আসনপ্রতিষ্ঠা? যদি সবই শূন্য, সবই ফাঁকি তবে কেন বুকের ঘরে এ বুকফাটা আকুল পিপাসা; যদি আত্মার অমরত্ব মিথ্যা মায়ার খেলা হয়, তবে অভাগা মানবের এ কঠোর সাধনার কি সফলতা? অগণ্য প্রাণীত মৃত্যুবুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে। কিন্তু কই সেখানে মৃত্যু শিহরণ? আবার কোথায় বা অমৃতধামের জন্য প্রস্তুত হওয়া? কেন প্রেমসুন্দর মানবের বুকে এ অমৃতের পিপাসা জাগাইলেন? সন্দেহবাদী হয়ত বলিয়া উঠিবেন, এ কেবল আমাদের দুঃখ দুর্গতির আয়োজন। তবে কেন আলোতে, বাতাসে জলে শূন্যে চরাচরে, জড়ে বিশ্বরূপে চিরনবীন সুন্দরের পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ মাধুরী আর মানবজীবনেই কি পূর্ণ মঙ্গলময়ের অপরিপূর্ণ অভিব্যক্তি? জীবজন্তু তাদের দীনশক্তি সামর্থ্য লইয়াই পরিতৃপ্ত। কই তাহাদের উন্নত আকাঙ্ক্ষা? কই তাহাদের সে অনন্ত ক্ষুধা—যাহাতে ক্ষুদ্র রূপের গৃহে কেবল মন তৃপ্ত হইতে চায় না। আমাদের বুকে এ কি অনন্তের বীজ, অনন্ত ক্ষুৎপিপাসা! কেন তবে ইন্দ্রিয়জালরচনা।

সবই যে সুমহান্ জ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত—স্রষ্টার বিচিত্র

জ্ঞানমহিমায়, চন্দ্রমাতারকায়, জ্যোতিষ্কলোকের আনন্দ জ্যোতিঃ—কে তাহা অস্বীকার করিবে? আবার এই বিশ্বরূপের আনন্দপ্রকাশ আমারই চেতনমুকুরে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। ঐ একই স্বর—ওঁ ওঁ, আছি, স্রষ্টা আছেন আছেন; এই বিজয় ওঙ্কার বিশ্ববুকে বাজে। যদি অমৃতের দ্বারই না খুলিল, তবে সাধক প্রাণের আশৈশব সংগ্রাম সাধনার সার্থকতা কই? তবে কি ইন্দ্রিয়াসক্ত মানব সন্তানের ব্যর্থ ধনজনমদে গর্ব্বিত নৃশংস ব্যবহারেরই জয় হইবে? যদি একজন ন্যায়বিধাতা চিরমঙ্গল না থাকেন, যাহার অমোঘ শাসনে সমস্ত নিয়ন্ত্রিত, তবে পাপ পুণ্যের বিশেষত্ব কোথায়?

সত্যই সাধুতাই সাধকের পরমদান। তাইত সত্যের মহিমাতেই সত্য পূজারী সত্য দেবতার আনন্দ পূজায় তিলে তিলে সর্ব্বস্ব আহুতি দান করেন। পাপ পুণ্যের বিচারও আছে সংসারে। মানব ইতিহাস তাই সব কিছুর ভিতরই পুণ্য সাধুতার প্রশংসা করিতেছে। পাপীই বল আর সাধুই বল, মৃত্যুর পরপারে অমরধামের আনন্দ অস্তিত্ব সকলেই স্বীকার করিতে চাহে।

তাই জগতের বুকে চির আনন্দসান্ত্বনার করুণ বাণী। কে তুমি ব্যথিত নম্র সাধক? অশ্রুজলেই তোমার দিনরজনী কাটে, তবুও এ কঠোর বেদনবন্ধুর পথে তোমায়

সংগ্রাম করিতেই হইবে। অভয় সঙ্গীত শ্রবণ কর! একদিন এর সার্থকতা আছে—যেদিন মরণ সখার আনন্দ-স্বরূপ হাসিয়া উঠিবে সেদিন—সেইদিন তোমার সকল ব্যথার পূজার অবসান হইবে, সেদিন জয়ের আনন্দবোধন বাজিয়া উঠিবে, সেইদিন আনন্দময়ের মুগ্ধ স্বরূপের ভিতর ধন্য হইবে তোমার কঠোর সংগ্রামসাধনা!

আমরা অমর হইলাম। কোথায় মৃত্যু? ওগো অনাথ সন্তানেরা পিতৃহীন মাতৃহীন, কেঁদনা ধন তোমরা। ওগো জনক জননি! প্রাণপুতলির বিরহ ব্যথায় জাগিয়া থাক। যখন অমরধামের নিমন্ত্রণ-পত্র আসিয়াছে তখন সব ফিরিয়া পাইবে—ভাগ্যবিধাতার বিচিত্র বিধি মানিতেই হইবে। একদিন শুভ আহ্বান গান দিকে দিকে রণিত হইয়া উঠিবে। একদিন আনন্দময় লোকে আমিও আনন্দে ভব পারাবারে অভয়পদ বুকে করিয়া চলিয়া যাইব!

শোন সকলে আমরা অমর। তোমার কেন এত ভ্রান্তি ক্লান্তি, কেন এত ভয়? ভয় নাই, সকল দুর্দ্দান্ত প্রচণ্ড উত্তেজিত রিপু শান্ত হইবে। যতই ব্যর্থ তরল আমোদ-প্রমোদে দিনরজনী অতিবাহিত কর না কেন, একদিন—একদিন ওগো গর্ব্বিত মানব, সব তোমার ধূলিসাৎ হইবেই হইবে। সকলে অমরলোকে জাগিয়া উঠিবেন।

অমৃতময়ের আনন্দ আলোকে সকল জীবনপুষ্প বিকশিত হইয়া উঠিবে। পরম সখার আসনতলে সকলকেই একদিন করজোড়ে নত হইতেই হইবে! ওগো দীন দুঃখী, শোন 'মা ভৈঃ' বাণী— দুঃখ নাই, তোমার নয়ন জল মুছিয়া যাইবে। প্রাণের পুতলি দেহমুক্ত হইয়া, কি মন্ত্রই শিখাইতেছেন অমৃতে জাগিতে হইবে, আত্মপুরেই আত্মার মিলনান্দোৎসব।

ওগো প্রাণসখা! সংসারের মরণসুরে সুখ দুঃখ সকল কিছুর ভিতর এ কি সাম্য মঙ্গলসুর উদ্বোধিত? তোমার জগতে কেবলই চেতনলীলা। মৃত্যু নাই। যাহাকে মৃত্যু বলি—সে যে এক হইতে আর একে লইয়া যায়। সমগ্র বিশ্ব, ওগো বিশ্বপ্রাণ, তোমারই আত্মপ্রকাশ। তোমারই ঐ বুকেই কিন্তু আমারও জাগরণ। কেমন করিয়া তবে আর নিদ্রিত হইব? তুমি কি এই ক্ষণিক দোলায় দুলাইবে বলিয়া আমার বুকে এই চেতন-আলোকে অব্যক্ত জ্ঞানের মহিমায় অতৃপ্ত পিপাসার অনুভূতি দিলে? তা কেমন করিয়া হইবে? কেন বল তবে মৃত্যুর পরপারে শুদ্ধতার সুনির্ম্মল মঙ্গল-আলো জ্বালিয়া এস।

এই কথা ভাবিয়াই ত অন্তর জুড়াইল—আমি অনন্তের বুকে জাগিয়া আছি। এই চেতনাপুলকেই আমার পুলক-স্পন্দন, এই কথা ভাবিয়াই সব দুঃখ সহিয়া যাই। সকল

দুঃখ শোক আমাকে অমৃতের পথেই লইয়া চলিয়াছে। তাই ত বেদনার দান মাথা পাতিয়া লইতে পারি!

ওগো প্রেমসুন্দর! এস তবে আমি তোমাতেই মেশামিশি হইয়া থাকি। তোমার অনন্ত প্রবাহের ভিতরই যে জীবাত্মার অনন্ত গতি। আমায় এই অমরত্ব অধিকার লাভের যোগ্য কর। আমায় তবে ধূলিমুষ্টির ঊর্দ্ধে লইয়া চল। সকল অপরাধ ক্ষমা কর। তোমারই শুদ্ধ সত্তায় জাগিয়া উঠি—আমি যে তৃষিত ক্ষুধিত—ওগো আমায় তোমার গৌরবে গৌরবান্বিত কর, অমৃতধনে ধনী কর। আর কি বলিব? শান্তি শান্তি শান্তি।

(১৪)

কেন এ গোপন লীলা

ধূলি আমি ধূলির বেশেই
গড়্ছি কত আশা
অবল আমি, জানি হে নাথ
তোমার ভালবাসা।

ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যে যাই
প্রাণ জাগানো খেলা
তাইত দেখ মরণ ঢেউয়ে
ভাসে জীবন ভেলা।
জীবন দয়িত তুমি আমার
তোমার মাঝেই আমি
বুকের মাঝে ভূমানন্দ
ওগো আমার স্বামি।
মরণ নিল শরণ পথে
চেতন সুরে জাগি
বিশ্ব বুকে বাজ্‌ল বাঁশি
নব জীবন লাগি।
ফুরিয়ে যাবে ভাঙ্‌বে যবে
দুদিন গড়া ঘর
কোথায় যাবে সকল বাধা ?
দেবে অমর বর।
মরণ ভয়ে অন্ধ আঁখি
মিথ্যা মায়া বাঁধা
অমর সভা হাস্‌বে যবে
ঘুচবে যত ধাঁধা।

মরণধর্ম্মশীল মানব তাহার ভাগ্যলিপি পাঠ করে আর ভাবে কেন এ ভবিষ্যৎকুহেলী অন্ধ আবরণে আবৃত? তাহা না হইলে ত এমন করিয়া চলিতে হইত না। মনে করি, মৃত্যু যবনিকা তুলিয়া যদি একটুও সে বিচিত্র রহস্য জানিতে পারিতাম; যদি বিদেহীপুরের অজানা রহস্য দেহের ঘরেই উদ্ঘাটিত হইত; যদি সে অব্যক্ত আনন্দ ক্ষণিক দেহের ঘরেই উপলব্ধি হইত; তাহা হইলে ত আর এমন করিয়া ঘুরিতে হইত না। আমাদের এই দুদিনের খেলায় এমনতর ইচ্ছা ও প্রশ্ন স্বাভাবিক। এ অন্ধকুহেলী মোচন করিয়া মানবমন পরপারের সে বিচিত্র তত্ত্ব অবগত হইতে চাহে। অথচ হৃদয়ঘরে সত্য জ্ঞান, ধর্ম্মের পুণ্য আলো জ্বলিতেছে কই? কই সে সত্য অনুসন্ধিৎসা? এত অবশ্যম্ভাবী সত্য যেমন রাত্রির পর দিন তেমনই মৃত্যুর পর নবজীবন অপেক্ষা করিতেছে। তবু সন্দেহ তবু প্রশ্ন—তবু অনুসন্ধিৎসু শিশুর মত কেবলই প্রশ্নের জটিলতা। জানিয়াছে মানব তাহার জন্য একদিন অপেক্ষা করিতেছে। তবু কত ভবিষ্যৎ কল্পনা জল্পনা।

মানুষের অন্ধ অজ্ঞতা তবু অমৃতের গোপন দ্বারখানি মুক্ত করিতে চাহে। তাহাই কল্পনাপটে কত ছবি অঙ্কিত করে। কত ব্যর্থ কুহকজাল রচনা করে, ভূমা মহানের মঙ্গল ইচ্ছামহিমা খর্ব্ব করে।

হায়! হায়! ইন্দ্রিয়সুখলিপ্সু মানুষ মনে করে স্বর্গে যাইয়া তাহার না জানি কত সুখে সম্ভোগের আনন্দ আয়োজনে স্বর্গভোগ লাভ হইবে। কেহ ভাবে পৃথিবীর প্রলয়লীলা পর্য্যন্ত আত্মা কেবলই হয়ত মর্ত্ত্যে, হয়ত নরকে, হয়ত শূন্যে, হয়ত স্বর্গলোকে ঘুরিয়া ঘুরিয়াই মরিবে। এমনি কল্পনা জল্পনায় কত বিভীষিকা কত ভীতি কুহেলী, কত চিন্তা ধ্যান ধারণা; কিন্তু এ চিন্তার সীমা কোথায়?

কিজন্য সে গোপন কুহেলী মোচন করিতে চাহ? দেহমুক্ত প্রিয়ধনেরা যেখানে থাকেন তাহা যখন দৃষ্টির অন্তরালে গোপনসুন্দর চির প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন তখন কেমন করিয়া মানুষ তাহার সত্য সত্তা বুঝিতে পারিবে? যে যায় সে আর ফিরে না, আর ত তেমন করিয়া আদান প্রদান চলিবে না।

যত কিছু দেখি শুনি না কেন তাহার সত্য সাফল্য কোথায়? স্বপ্নঘোরে কত কিছু দেখি, তাহা কি আমার তপ্ত মস্তিষ্কেরই ক্ষণিক বিকার? হয় ত প্রিয় মুক্ত আত্মার দেহী স্বরূপ কল্পনা করিতেও ভয়ে চকিত হইয়া উঠি। কিছু বুঝি না, জানি মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানেই সমস্ত নিয়ন্ত্রিত তবে কেন এ সংশয় তিমির?

দেহাতীত আত্মার শান্ত স্বরূপের সুগম্ভীর পরিচয় কেমন করিয়া হইবে? বিশ্বাস করি প্রেমদাতা বিশ্বপাতা তিনি

যাহা করিবার তাহাই করিবেন। আমি কেবল সে ইচ্ছায় আপনাকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হই। তিনিই ঘন অন্ধকারে ধ্রুবতারা—যতই মানুষ জ্ঞানী গুণী হউন্ না কেন—জীবের দেহাতীত স্বরূপ কেমন করিয়া উদ্ঘাটিত করিবেন ?

তবে এই আশা মানুষের বুকে যে তাহার মৃত্যু নাই, অমৃতে তাহার আনন্দ জাগরণ। ভক্ত প্রাণের আনন্দ গাথা এ কথাই প্রচার করিতেছে। যিনি জীবনের নিয়ন্তা বিধাতা তিনিই মরণ ক্ষণের সঙ্গী ও সহায়। তাই মৃত্যুময় সংসারে বাস করিয়াই অমৃতলাভের জন্য প্রস্তুতিতেই স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মনিষ্ঠা সাধন আনন্দ আত্মচেতনায় জাগিয়া উঠে। ধন্য মানুষের পুণ্যনিষ্ঠ শুদ্ধ জীবন ! প্রতি কথা, প্রতি কর্ম্ম সাধনা পুণ্যগন্ধে আমোদিত। তাই আত্মপুরে পুণ্যজ্যোতি উদ্ভাসিত করিয়াছেন, তাই অনন্তে আহ্বান। এখানে স্রষ্টার বুকে বাস, দেহাতীত—লোকেও সে বুকে আমার াসস্থান। স্বর্গরাজ্য বাহিরে নহে, প্রতি অন্তরে অন্তরে, তাই প্রতি অন্তর লোকে নীরবে নীরবে মানবের শুভসাধনা। তাই অনন্ত পিপাসা—দৃশ্যের ভিতর অদৃশ্যের কাহিনী। কেন এ ব্যর্থ কুহেলী রচনা ? যদি বিধাতা ইচ্ছা করিতেন এ জটিল মরণ কুহেলী মোচন হইত। তাঁহার ইচ্ছাতেই এ তিমির মরণ যবনিকা। তবে আত্মজ্যোতিতে তিনি কল্যাণের

আলো প্রতিফলিত করিয়াছেন।—একদিন সব ব্যবধান চলিয়া যাইবে, সকল রহস্য ভেদ হইবে।

বিশ্বাসী ভগবদ্ভক্ত চিরশান্ত, কোথায় তাঁহার চঞ্চলতা? যে প্রেম অনাদিকাল বিকশিত জগতের বুকে বরণ করিয়া রক্ষা করে, পালন করে, সেই প্রেমই অনন্ত পথের সহায় হইবে। তাই তিনি নিশ্চিন্ত প্রশান্ত। এই দৃশ্য জগতেই ত কত কিছু অজানার গোপন তত্ত্ব জ্ঞানের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। যাহা শৈশবে অবোধ্য তাহা হয়ত যৌবনে জ্ঞানে সুপরিস্ফুট। যতই জ্ঞানের পরিণতি ততই পরিপূর্ণ প্রকাশ। যতদিন শিশু অজ্ঞান,—আছেন কি এমন জনক জননী যাঁহারা শিশুর কাছে জটিল জ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন? সময়ে সমস্তই সরল সহজবোধ্য হয়। তখন শিশুই জনক জননীর বন্ধুরূপে কত সহায় হন, কত আনন্দে বিনত হন।

তেমনি করিয়াই পরম পিতা একদিন সময়ে সব বুঝাইয়া দিবেন। একদিন মৃত্যু তার বিচিত্র গোপন রহস্য উদঘাটিত করিবেই করিবে। তখন হয়ত অজানার অব্যক্ত আনন্দ-পরিচয় লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি নিবেদন করিয়া ধন্য হইব। হায়! হায়! এ কি স্পর্দ্ধা! ক্ষুদ্র দুর্ব্বল মানুষ দুদিনের খেলায় অনন্তের কথা কেমন করিয়া জানিবে? তবে অন্তরে অন্তরে এ বিশ্বাস জাগাইয়াছেন ঠাকুর তাইত

অমৃতের আশা। অবিশ্বাসের অন্ধকারেই সকল দৈন্যকুহেলী-মেঘ জমিয়া উঠে।

যতই পরম নির্ভরে নির্ভরশীলতা ততই জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হইব, আর অব্যক্ত আনন্দ আরাম লাভ হইবে। সাধু জীবনের পুণ্য প্রভাব কোথায়? তাঁহাদের প্রাণময় আত্মনিবেদনে, পুণ্যনিষ্ঠা সাধনে ও নিত্য ভগবদপ্রসাদলাভে। এই শুদ্ধ সত্য সাধনার ভিতরই জীবাত্মার মুক্তির পরমানন্দ সম্ভোগ।

আমার যাহা কিছু তাহার সত্য স্বরূপ কোথায়? দুঃখী আমি, রিক্ত আমি আমার শূন্য ঝুলি কিসে ভরিবে? জগতে জয় প্রশংসায় কি আমার সার্থকতা? সুখ সুবিধা সম্ভোগের জন্যই কি আমার এত আয়োজন? আমার চরিত্রের মাধুর্য্য কি দশের প্রশংসাসাপেক্ষ? তাহা হইলে নির্ম্মল সুখ কোথায়? দুঃখ ত তবে অবশ্যম্ভাবী। নিঃস্বার্থ আপনভোলা প্রেম প্রেমময়ের চরণে পরম নিবেদনই আমার চরম সাধনা।

জননী স্নেহই বা কই—আমার প্রাণাধিক সন্তানকে অনুক্ষণ ঘিরিয়া থাকে? বিশ্বসন্তানকে বিশ্বপ্রেমে আহ্বান করিবার মত সে উদার প্রাণই বা কয় জনের? কই সে সত্য প্রেম? স্বার্থ বুদ্ধির জটিল দান প্রতিদানের ভিতর

কই সে নির্ম্মল প্রেমের পরম প্রকাশ? কই সে প্রেমের পুরস্কার?

জানি না সংকীর্ণ সংসারপথে কবে সে উদার মুক্ত প্রেমের দীক্ষা হইবে? কবে নীরবে প্রেমের সাধন-গান প্রাণকে মুগ্ধ করিয়া তুলিবে?—কোন কিছুর আশাতেই কি আমার জীবনের সাধনার উদ্বোধন? পূর্ণব্রহ্ম সর্ব্ব-শক্তিমান্ শিবসুন্দর বিশ্বকল্যাণদাতা তাঁহার শাশ্বত দৃষ্টিতে সমস্ত কল্যাণে জাগ্রত। তাঁর অসীম উদার প্রেম সকলকেই তাঁহার আনন্দময় বুকে আহ্বান করে, স্থান দেয়, মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে! পুরস্কারের জন্য নয়, সুখ সুবিধার জন্য নয়, আমাদের শুভসাধনা আমাদেরই কল্যাণের জন্য। যতই দেবগন্ধে আকুল চিত্ত, দেবমহিমায় মহিমান্বিত প্রাণ, ততই আত্মার নির্ম্মল আনন্দ ও মুক্তিলাভ।

নম্র সাধকের সাধনার প্রাণপ্রতিষ্ঠা কোথায়? ভবিষ্যতে আমার অনেক কিছু সুখ অট্টালিকা গড়িয়া উঠিবে—তাই কি আমার এ সাধনা? তবে নির্ম্মল সত্য সাধনা হইল কই? একেবারে আত্মহারা শুভসাধনায় প্রাণ সমর্পণ করিতে চাই। পাগলের মত দিশেহারা পথিকের মত আপনভোলা গীত-লহরীতে বিশ্বমহিমা উপলব্ধি করিতে চাই। ধন্য মঙ্গলময় বিধাতা! ভাগ্যে আমার ভবিষ্যৎ

চিরপ্রচ্ছন্ন রাখিলেন আমার সম্মুখে, তাইত সাধনার মন্ত্র-দীক্ষা, তাইত মুক্তির জাগরণ।

যদি বা ভবিষ্যৎকুহেলিকা মোচন হইয়া যায়, সাধ্য কোথায় তাহার মর্ম্ম অনুধাবন করি। দেহী দেহের বন্ধনে, সসীমের লীলা মহিমায় আবদ্ধ, ক্ষীণ শক্তি কেমন করিয়া দেহাতীত স্বরূপ সে বিচিত্র রহস্য ভেদ করিবে? কেমন করিয়া ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান অতীন্দ্রিয় লোক দর্শন করে? যতই কেন প্রকাশ করিতে চাই, দুর্ব্বল জড়ভাষার সাধ্য কোথায় তাহার সত্য ব্যাখ্যা দান করে।

যদি কোন মানুষ ভূমানন্দধনে ধনী হইয়া বিষয়াসক্ত মানুষের কাছে তার সে সুখের কাহিনী গদগদ হইয়া কীর্ত্তন করে, যে তাহা হৃদয়ঙ্গম করে নাই—যে লাভ করে নাই, সে কেমন করিয়া তাহার মূল্য দান করিবে? জন্মান্ধ জন কেমন করিয়া আমার দৃষ্টির আনন্দ মহিমার ভিতর প্রকৃতির মঙ্গল মাধুরী দর্শন করিবে—কেমন করিয়া নদনদী গিরিশিখর প্রভাতের আনন্দ বালার্কের উজ্জ্বল মাধুর্য্য উপলব্ধি করিবে? যে জগতের আলোক ধনে বঞ্চিত হইল তাহাকে কোন্ আলোকে মানব বিশ্বছবি তাহার কাছে প্রতিফলিত করিবে? জগতের শত কবির শত কবিত্ব প্রাণময় ইতিহাস সব ঘন তমসাচ্ছন্ন। বরং যতই সে শ্রবণ করে

ততই অব্যক্ত বেদনায় তাহার চিত্ত ব্যথিত হয়। কেবল আপনার ব্যর্থ দৈন্যে আপনি পীড়িত হয়।

ভবিষ্যতে কি আলো জ্বলিয়া উঠিবে অন্ধজনের মত এখন কেমন করিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করি? যে আলো মুক্ত আত্মারই দর্শনীয়, দেহী তাহা কেমন করিয়া ধারণা করিবে? যদি বা মুক্ত আত্মা আনন্দে তাহার আনন্দ-বারতা আমার নিকট জ্ঞাপন করে আমার সাধ্য কোথায় তাহা ধারণা করি? কেবল অক্ষমতার দীনতা, বুকফাটা ক্রন্দন—জানি না ভবিষ্যৎ গর্ভে কি আছে? জানি মঙ্গলে সব সুপ্রতিষ্ঠিত—তাই বিশ্বস্ত হই, শান্ত হই—মঙ্গলেই সব, মঙ্গলেই জন্ম মৃত্যু—যে দিন তাঁর ইচ্ছা হইবে সমস্ত সুস্পষ্ট হইবে। যদি সে ভবিষ্যতের অব্যক্ত আনন্দ এখন প্রকাশ পাইত, চাহিতাম কি আর এ ভবঘোরে ঘুরিতে কে চাহিত তবে দুর্ব্বিষহ বেদনার ভার বহিতে? দেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া কেমন করিয়া ছুটিতে চাহিতাম কে জানে?

যে ইচ্ছাতে রূপের দেশে আসিলাম সে ইচ্ছার ভিতরই নত হইয়া রক্তাক্ত হইয়াও লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে হইবে। কেন তবে এই দুয়ারটুকু পার হইতেই এত ঘোরতর সংশয়? কেন এত বিরহ বেদন; কেন এত মৃত্যু বিভীষিকা? অথচ নীরবে যে যার কর্ম্ম করিয়া যাইতেই হইবে।

ঘন অন্ধ তমসার ভিতরেই ঝঞ্ঝাপীড়িত যাত্রী তাহার প্রবল তরঙ্গায়িত জীবনসাগরে পাড়ি দিয়া চলিয়াছে। অবশেষে যখন খেলা শেষ হইয়া যাইবে—তাহার বড় সাধের নিত্যগৃহের শুভ আলো দূর হইতে হাসিয়া উঠিবে। ধন্য তখন সকল ঝঞ্ঝা! সমস্ত শান্ত, আশার আলো জ্বলিয়া উঠিল—হৃদয় উৎফুল্ল। এ কি হরিষে বিষাদ! এত আনন্দ! দুর্ব্বল হৃদ্‌পিণ্ড আনন্দে নৃত্য করে, বক্ষ স্পন্দিত—মুহূর্ত্তেরও দেরী আর সহে না। এই যে সব হারানো ধনেরা আজও আমার জন্য আনন্দে প্রতীক্ষা করিতেছেন এই যে প্রেমাস্পদ প্রেমবাহু প্রসারণ করিয়া আনন্দে বরণ করিতেছেন। উঃ কত দীর্ঘব্যবধান সমস্ত সার্থক প্রিয়সম্মিলনে। কে আর বাধা বিঘ্ন আনিবে সে মিলনপথে? কে আর নিন্দা গ্লানিতে ক্ষত বিক্ষত করিবে? ধন্য নীরস কঠোর সংগ্রাম সাধনা! ধন্য বুকফাটা আকুলতা! ধন্য মর্ম্মন্তুদ যাতনা! এবার আমার আনন্দগৃহে ছুটিয়া চলিয়াছি।

এই কি মরণধর্ম্মশীল মানবের ভাগ্যপরিণতি? এই মরণ-কুহেলীর পরপারে—শান্ত অরুণালোকে আমার নবগৃহের উজ্জ্বল স্বরূপ জাগিয়া উঠিবে। ধন্য মৃত্যুকুহেলিকা! কয় দিনের বিচ্ছেদ? একদিন এ মরণ-সাগর পারে আমার নিত্যগৃহের আলো জ্বলিয়া উঠিবে—আর আমার প্রিয়ের

বুকে স্থান হইবে। কে জানে কেমন করিয়া সকল বেদনার অবসানে আমার সত্য আরাম লাভ হইবে।

হে পরমাত্মন্! তবে ভাল করিয়া 'মাভৈঃ' বাণীতে আমায় আহ্বান কর। আমার আনন্দ আরাম-গৃহকুঞ্জ কোথায় বল? আমি একা নহি—এ কথা ভাল করিয়া বুকের ঘরে শোনাও। তোমারই বুকে সব—তোমাতেই অনন্ত প্রতীক্ষা! ধন্য আমার জীবন সংগ্রাম। বল সখা আমার প্রিয়ধনেরা কেমন করিয়া আমার জন্য মিলনমালা গাঁথিতেছেন? বল সখা ভাল করিয়া 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'। বল এস এস, আনন্দে এস, মৃত্যুর ভিতর জয়মুকুট পরিধান করিয়া এস।

(১৫)

মরণক্ষণে জয়োল্লাস।

ধূলার মাঝে ধূলি হব
তবুও দেখ হাসি;
সখার বুকে চেতনপুরে
আনন্দেতে ভাসি।

অমর কথা

পিতা পাতা পরিত্রাতা,
কোথায় আমার ভয় ?
শুদ্ধরূপে উঠ্ছি জেগে
নিত্য বরাভয় !
যখন আমি একলা হব,
সকল যাবে চ'লে,
স্বরগপুরে জাগ্‌ব গেয়ে,
ব্রহ্মনামের বলে।
মরণঘুম আস্‌বে যবে
আমার নয়ন পাশে,
জানি গো জানি উঠ্‌ব হেসে
ঐ যে সবাই হাসে।
বুকের ধন আস্‌ছে নেমে
প্রেম সোহাগে মেখে,
জুড়িয়ে গেল সকল জ্বালা
জ্যোতির রেখা দেখে।
নাই বা কেউ বেসেছে ভাল
এই ধরণীর বুকে,
নাই বা কেউ জান্‌লে মোরে
সকল গেছে চুকে।

নাই বা কেউ কাঁদ্‌লে আর
এ অভাগার তরে,
নাই বা কেউ ফেল্‌লে জল
এ সমাধির পরে।

প্রকৃতির বুকে সব ঝরিয়া পড়িতেছে—পশুপক্ষী তৃণলতা ফলপুষ্প সকলের কোথায় গতি! ধরণীর বুকে আনন্দে খেলা করিতে করিতেই কেবলই বিদায়ের গান বাজিতেছে—কোথায় যেন যাইতে হইবে। কে জানে কখন? হয়ত আজ প্রভাতেই, হয়ত বা কাল—তুদিন আগেই হউক আর পশ্চাতেই হউক, খেলা শেষ করিতেই হইবে। যাহা একবার চলিয়া গিয়াছে তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না—শিশুর কোমল তনু আর বৃদ্ধের জীর্ণ দেহ সকলেরই ধূলিতে পরিণতি। বংশপরম্পরা ধরিয়া চলিয়াছে এই অখণ্ড নিয়মধারা। কে কাহার গতি রোধ করে? সকলেরই একই গম্য পথ।

সকলেইত এ কথা ভাল করিয়াই জানি, তবে কেন ক্ষণিক ভীতির অন্ধ জড়তা? একদিন যাইতেই হইবে! প্রিয়-ধনদের মঙ্গল আবেষ্টনের ভিতর কেমন করিয়া আমার আনন্দে মহাপ্রয়াণ হইবে—কে জানে? কিন্তু একদিন শেষ হইবে এ কথা ধ্রুব সত্য। কি বিচিত্র ইন্দ্রজাল! কি মহাযাত্রার অব্যক্ত রহস্যপরিণাম! কেবলই ক্ষণে ক্ষণে

সাংসারিক আনন্দ-যাত্রায় বেদনার করুণ গান—কিন্তু কে জানে হয়ত ঐ বেদনার তিক্ত রসের ভিতরই, মরণগম্ভীর পরিচয়েই একদিন মিষ্টতার নিত্য সুধাধারা ঝরিতে থাকিবে। কই সে আনন্দ বাঁশি মরণসুরে সবাই শুনতে পাই—কই সে চিন্তা? আত্মীয় পরিবারের ঐহিক সুখের ব্যবস্থার জন্য জীবনব্যাপী মানুষ মূলধন সঞ্চয় করিতেছে। হয়ত সংসারে তাহার কত প্রতিষ্ঠা, কত আনন্দগরিমা। এই আনন্দই কি চরমানন্দ? প্রিয়জনের ভবিষ্যৎ কল্যাণ কি এই সঞ্চিত অর্থ দান করিবে? প্রতিজনের হিতসাধন, প্রতিজনের আত্মোৎকর্ষ, ভগবদ্‌প্রেম সাধনা সাপেক্ষ। জাগতিক ধনরত্ন সংসারসুখে মুগ্ধজনকে তৃপ্ত করে সত্য, কিন্তু চিরদিনের সত্য সুখ কোথায়?

আবার কত অসংখ্য যাত্রী ত্যাগের মহিমার ভিতর দিয়াই জীবন উৎসর্গ করিলেন, শত্রুকে ক্ষমার মন্ত্রে জয় করিলেন। রাগ হিংসা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা প্রতিহিংসা-পরায়ণ চিত্তের কিসে তৃপ্তি? সংসারপথে কত ক্লান্তি, কত নিষ্পীড়ন, কত বিবাদ বিসম্বাদ, কত মোহ পরমাদ—কিন্তু অন্তিম শয়ানে ও কি দৃশ্য? ভীত কাতর চিত্ত একবার শেষে ক্ষমার মন্ত্রে জাগিতে চাহে, সকলের কাছে শেষ ক্ষমাভিক্ষা করিতে আকুল হয়।

কত পরদুঃখকাতর প্রাণ দুঃখীর জন্য সর্ব্বস্ব দান করিয়া কত জনহিত প্রতিষ্ঠানে সমস্ত আহুতি দিয়া চিরযশস্বী হইলেন! যতই কেন দানের মহিমা প্রচারিত হউক না, একদিন মহাযাত্রার ভিতর অব্যক্ত করুণ সুর হৃদয়তন্ত্রীকে রণিত করিয়া তুলিবেই তুলিবে।

মহাযাত্রার মঙ্গল মুহূর্ত্তে আমার প্রিয়জনেরা কি আমার শয্যা পার্শ্বে দণ্ডায়মান? তাঁহাদের স্নেহ প্রেমবিগলিত অশ্রুধারায় কি আমার মরণক্ষণের সকল গ্লানির অবসান হইতেছে? মহাযাত্রার গম্ভীর স্বরূপে কে না ব্যথিত হয়? অতি বড় অপরিচিত জনের মৃত্যু সময়েও সমবেদনার করুণ ব্যথা হৃদয়কে ব্যথিত করে। যাহাদের সঙ্গে এত-খানি খেলা খেলিয়া আসিলাম যাহাদের বুকে এতদিন আনন্দে মস্তক রাখিয়া আসিলাম আজ তাঁহারা আমার মহাযাত্রা লীলায় শেষ গান গাহিতে আসিয়াছেন, তাই কি আমার পরিতৃপ্তি? আমার দেহত্যাগে জগতের কত জন ক্রন্দন করে এ কথা ভাবিতেও শান্তি। আবার কত শান্ত ভক্তপ্রাণ জগতের কঠোর বিচারে নিন্দা গ্লানির ভিতর মরণ ক্ষণেও বেদনার ঘাত প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইলেন। আজ হয়ত লক্ষপ্রাণ সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন করিতেছে।

কেমন করিয়া শেষ গানটী আনন্দে গাহিয়া যাইব? কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নির্ভয়ে আনন্দে আনন্দময়ের বুকে ঘুমাইয়া পড়িব? এম্‌নি করিয়া আনন্দে যদি উৎফুল্ল হইয়া থাকি, বাক্য চিন্তা আনন্দময়ের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে তবে কোথায় দুঃখ? যাঁহার জীবন ভগবৎ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ তিনিই আনন্দে শেষ গান গাহিয়া যান। বিধাতার বরপুত্র তিনি, যাঁহার প্রেমসুধা পানে স্নিগ্ধমধুর জীবন লাভ হইয়াছে।

জানি না কেহ আমার জন্য শোক করিবে কি না করিবে, নয়নের জল ফেলিবে কি না ফেলিবে, আমি আমার স্রষ্টা পাতা বিধাতার বুকে আছি, সেই বুকেই আমার মহাযাত্রা, চির অবলম্বন।

কি হইবে বহির্মুখীন স্মৃতিমাহাত্ম্যে? আমার সত্য ধন লাভ হইল কি সংসারে? আমি আনন্দে ভবপারাবারে চলিয়াছি কি? জানি না সে আনন্দের গান কে শুনিবে? কেমন করিয়া ভবিষ্যতের বুকে ধর্ম্ম প্রেরণা জাগিয়া উঠিবে? আমার জীবনখানি কি ধন দিয়া গেল সংসারে? সবত ভস্মে পরিণত হইল—দেবতার দান তাও কি লয় হইবে? দেব-আশীর্ব্বাদই আমার জীবনের সার্থকতা—সে কল্যাণ ইচ্ছায় আত্মনিবেদন—আহা! বিশ্ববুকে কি আনন্দ সমাধি!

যে বঞ্চিত হইল সে ধনে, কেমন করিয়া হইবে তাহার সে অনুভূতি? ধন্য সে সৌভাগ্যবান যাঁহার ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা বিশ্ব-মানবের বুকে ধর্ম্মের জয়গানে সুপ্রতিষ্ঠিত। ধন্য সে জয় সঙ্গীত। হয়ত কত জনের অভিশাপ, আবার হয়ত কত স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের সজল অর্ঘ্য আমার জন্য নিবেদিত হইতেছে!

নিঃসন্দেহ আমি একদিন যাইবই যাইব। হয়ত সে যাত্রায় আমার সকল মর্ম্ম-গ্লানির অবসান হইবে। আমার কিসের অপেক্ষা? কেন মৃত্যু-বিভীষিকা? জাগ্রত হউক সে আনন্দসাধনা যাহাতে আনন্দে ভবপারাবারে পার হইয়া যাইব। যদি কালই রাত্রে কি দুদিন পরেই আমি চলিয়া যাই—জানি না ত কখন যাত্রা—তাহাতেই বা কি? ঐহিক সম্ভোগ পরমানন্দে ভোগ করিতে করিতেই যদি এই মুহূর্ত্তে মরণ-গান বাজিয়া উঠে, আমি কি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠি? আমার কোনও অনুশোচনা নাই। আমি শুদ্ধ সুনির্ম্মল, আমার কোন হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, আমার বাক্য-বাণ কাহাকেও বিদ্ধ করে নাই, আমি সকল কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি, আমার কোথায়ও দ্বেষ নাই,—এমনি করিয়া নির্ম্মলতার ভিতর আমার চির শান্তি প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছে কি? তবে আর ক্ষোভ কেন?

যাইব ত নিশ্চয়, দেবতার বুকে আত্মনিবেদন—অন্তর্য্যামী শুদ্ধ সুন্দর, তাঁর অনিমেষ আঁখি সবই দেখিয়াছে জানিয়াছে—কই সে সুনির্ম্মল সুন্দর জীবন গড়িয়া উঠিল? এখনও কত ভাঙা চোরা, কত কলুষতা কত ফাঁকি—এখনও কত কিছুর সংশোধনের প্রয়োজন! তাইত আমার মহানন্দযাত্রায় এত দুঃখ এত বেদনা—যে পথ দিয়া চলি, যদি সকলকে সুখী করিতে পারিতাম কোথায় আমার দুঃখ? হায়! হায়! এখনও যে কত অনুশোচনার গ্লানিতে দগ্ধ বুক!

হে মঙ্গল বিধাতা! দাও সে নব দীক্ষা—কঠোর প্রতিজ্ঞা—আমি নিশ্চয়ই সুনির্ম্মল সুন্দর হইব। ভক্ত পদানুসরণ করিয়া শুদ্ধ হইব। ধন্য যাঁহারা তোমার হইয়া গিয়াছেন, ধন্য তাঁহাদের প্রাণময়ী সাধনা অগ্নিদীক্ষা!

(১৬)

প্রিয়জনের সমাধি চিন্তা

নিভে গেল প্রাণদীপ
ক্ষণিক আলো জ্বেলে,
জ্বলে ওঠে দিব্যবিভা,
হাসিল নয়ন মেলে।

কভু হাসি কভু কাঁদি,
কভু ছুটি কভু জাগি,
দুঃখের করুণ গানে
কি জানি কি ধন মাগি।
ব্যথার নিবিড় ঘোরে
কত যে উঠিল জমি,
মরণ দেবতা এল,
ধন্য দেব নমি নমি।
থেমে গেল সব খেলা,
ভাল মন্দ হেলা ফেলা,
জীবন সাগরে আজি
ভাসিল জীবন ভেলা।
দেববালা এল শেষে—
মধুর মোহন বুলি—
গায় কিবা চুপে চুপে
সকল বেদন ভুলি'।
দিলে ঢেলে প্রেম সুধা,
কি আনন্দ কি আরাম—
নিভে গেল সব আলো,
অনন্তে সে বিরাম।

থেমে গেল ধুক্ ধুক্,
জীবন বাহিনী খেলা—
এই কি মরণ সখা,
আনন্দ শরণ মেলা !
কোথা গেল ধরণীর
চাঁদের মোহন ছটা,
ওকি ও মোহন আলো—
ধন্য রে বিরাট ঘটা।
দেববালা গায় মরি,
আনন্দ অমিয় খেলে,
উড়ে যায় প্রাণ-পাখী—
আনন্দে পাখাটী মেলে।
সমাধি ! তোমার নাম
ধন্য তব জয় গান,
বেদন-আগুন-বাণ
বাড়ালো গো তব মান।

অমৃতলোকে আমার বাঞ্ছিতেরা বাস করেন, এ কথা ভাবিতেও যে আমার আরাম। আমার আকুল হৃদয় কেমন করিয়া তোমাদের বিস্মৃতি কল্পনা করিবে ? দেখ আমার কাতর প্রতীক্ষা ; দেখ তোমাদের জন্যই এ ধূলি-

কণাও স্বর্গে যাইতে চাহে। ওগো আমার ভালবাসার ধনেরা, তোমরাই ত দেবলোকে অক্ষয় যোগে যুক্ত রহিয়াছ। তোমাদের অম্লান স্নেহ আমায় মরণসাজে প্রস্তুত করে, এবং সকল ভীতির মোহ দূর করে। তোমাদের মিলন-চিন্তা সকল তুচ্ছ তরল আমোদের ঊর্দ্ধে সুখময় মধুময় ধর্ম্মসুধাপানে পিপাসিত করে। প্রিয়জনের সমাধিতে নিত্য অশ্রুভরা অর্ঘ্য নিবেদনের প্রাণতত্ত্ব কে বুঝিবে? এ যে ব্যথার-পূজা, এই ত প্রাণময় আনন্দ অধিকার বিরহীর জীবনে! ভক্ত অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি সকলের কারণ, তিনি কল্যাণ উৎস। সকলই তাঁহারই দান। যাহাকে মৃত্যু বলি, সে দেবলোকে লইয়া যাইবার আয়োজন। যিনি মরণ সখার কোমল স্নিগ্ধ মাধুরী দেখিতে পান্ না তাঁহার কাছে মৃত্যু ভয়াবহ! মৃত্যুর ভিতরই যে অমৃতের দিব্য আলো, পুণ্য ছবি ফুটিয়া উঠে, তাইত মরণদবেতার স্বরূপ-খানির বিচিত্র গাম্ভীর্য্য, পরম পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য, তাইত মৃত্যু-বাসরে পরমকল্যাণময়ের আশীষ বর্ষণ। এ যে সুনির্ম্মল আনন্দধামের অমৃত সোপান। তাই ত মরণগাথা এত বরণীয়, —কোথায় দুঃখ, কোথায় নৈরাশ্য? আশার গান গোপনে গোপনে মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া গাহিয়া যায়।

চির-বাঞ্ছিতের সমাধিবুকে যখন হৃদয়ের মর্ম্মকথা নিবেদন

করিতে চাই, কেন দুনয়ন অশ্রুজলে ভরিয়া উঠে? এ কি আমার অবিশ্বাসজনিত ভীতিব্যঞ্জক অশ্রুধারা? তাহা ত নয়! এ যে বুকভরা প্রেমের আকুল অব্যক্ত পরিচয়। এ যে আমার আকুল প্রতীক্ষার বুকফাটা নিবেদন। বুঝাইব কেমন করিয়া এই ব্যথার অশ্রুজলেই যে আমার বিরহানন্দ-ভোগ। থাকুক্ আমার এ বেদনার সম্ভোগ। এ ব্যথার গভীর ক্ষোভ থাকুক্ এই সাংসারিক আমোদ প্রমোদ-মুখরিত যাত্রাপথে। এ ব্যথার পরিচয় কে দেবে? কে শুন্‌বে তপ্ত-বুকের নিভৃতপুরে সে বেদনার করুণ ঝঙ্কার? সে কি শান্ত সুনির্ম্মল সমাবেশ।

হারানো ধনদের বুকে জনকজননীর শোকাবনত স্বরূপ-খানির কি মঙ্গল মাধুরী! প্রাণপুতলির স্মৃতি মঙ্গলবাসরে কি সুর বাজে? স্মৃতিগন্ধ বুকের গোপন কুঞ্জে কি সুবাস ছড়াইয়া দেয়? সন্তান চলে নম্র হৃদয়ে পিতামাতার স্মৃতিচিহ্ন লইয়া। অভাগিনী নারী চলিয়াছেন প্রাণপতির প্রেমোপহার বুকে ধরিয়া। কত ভাবে আত্মমিলনের যোগানন্দ প্রেমপুলক প্রকাশ। কত ছবিতে, লেখনী পরিচয়ে, কত সুরে সুরে তাহাকে জড়াইয়া রাখিতে চাহে। পতিহারা সতী জীবন প্রভাতে বিরহব্যথা বুকে লইয়া দিনরজনী নীরবতার মাঝখানে ব্যথার ঘন শ্বাসের ভিতরই চুপে চুপে

প্রিয়নাম জপ করিয়াই চলিয়াছে। সমাধিবুকে দর দর অশ্রুধারা! একি প্রেমের গম্ভীর মরণহীন পরিচয়ই দান করে না? বিরহ বেদনার ভিতরই স্বর্গের অব্যক্ত আনন্দ-জ্যোতিঃ। তাই ত এই বেদনার অসহ্য-তাপ বুকে বহন করা সম্ভব। ওগো আমার প্রিয়ধনেরা, তোমাদের কথা ভাবিয়াই তৃপ্তি। প্রেম উৎস সতত উৎসারিত—কই দুঃখ? জানি আমার প্রেম সঙ্কীর্ণ, তবুও তোমাদের উদার প্রেমেই উদ্বোধিত হইয়া চলিয়াছি। ধূলিমুষ্টি হইয়াও দীন উপচারে তোমাদের স্মৃতি পূজার অর্ঘ্য রচনা করিতে চাই। জানি, তোমরা উন্নত লোকে ভাগবতী তনু লাভ করিয়াছ। আর আমি জীর্ণ দেহ মন লইয়াই প্রেমের অর্ঘ্য হৃদয় নিভৃতে সজল নয়নে রচনা করি। ভালবাসার প্রতিদানেই ত প্রেমের নিবিড়তা। কে তিনি প্রেমময় যিনি এই উপগ্রহকে বিচিত্র আকর্ষণে বাঁধিয়াছেন আর আমার হৃদয়ের এই অন্তঃসলিলা স্নেহ প্রেম মন্দাকিনী ধারাই কি দেহান্তে লীন হইয়া যাবে? না গো না, এ বুকভরা ভালবাসা কখনও মরে না। সমাধির নীরব প্রহেলিকার ভিতরই যে প্রেমের মাখামাখি চলিয়াছে কেমন করিয়া তাহা ভুলিব বল? আমার রিক্ত কাতর হৃদয় কেবলই যে তোমাদের জন্য আকুল। দেখ আমার হৃদয় নিভৃতে গোপন প্রেমের নীরব উচ্ছ্বাস। তোমরা

দিব্যস্বরূপ লাভ করিয়াছ বলিয়া কি এ প্রেমের সাড়া দিবে না ?

ঝর ঝর অশ্রুধারা ঝরুক্ তবে দিন রজনী। রক্তাক্ত হৃদয়ে আমার প্রেমবিশ্বস্ত বুকে বাজুক্ শত বেদনার আঘাত। আমার প্রিয় বিরহ আর কি ধন দিবে আমায় ? আমারই বা আর কিছু কি আছে দেবার ? তাই দেবতার চরণে সুনির্ম্মল অশ্রুজল ঢালিয়া দিই প্রিয় স্মৃতিপূজায়। ঢাল ঢাল নয়ন জল ঢাল। ব্যথার ক্ষত গভীরতর হউক্। রক্ত ফাটিয়া পড়ুক্। এই নিবিড় ব্যথা আমার সকল ঐহিকতা দৈহিকতার বন্ধন মোচন করুক্। তোমাদের কথা ভাবিয়া ভাবিয়াই দেহাতীত হইয়া যাই। আত্মপুরে জ্যোতির্ম্ময় আলো জ্বলিয়া উঠুক্। যদি আমার ভাগ্যবিধাতা থাকেন তবে কেমন করিয়া মৃত্যু হইবে ? কেমন করিয়া অভিযোগ করিব ? জানি চির-সুন্দর নিত্য প্রেমের উদ্বোধনে চির-মিলন-বোধন সুর জাগাইয়া তুলিবেন।

(১৭)

অমর চিন্তা

রূপের পারে অমৃত ধাম—
তোমার বুকেই র'ব,
চুপে চুপেই মন গোপনে
প্রাণের কথা ক'ব।
শুদ্ধ হব কেমন ক'রে
দেখাও বিমল বিভা,
আকুল আমি, অন্ধ আমি,
দেখাও স্বরগ-নিভা।
দিলে যদি তোমার হ'তে
নিত্য নব নব,
বাজাও সখা মাভৈঃ বাণী—
তবেই সকল স'ব।
বুকের মাঝে বিপুল ব্যথা,
আকুল কর মোরে,
এস হে প্রিয় পরাণ সখা,
হৃদয় আলো ক'রে।

কবে আমার ফুট্‌বে আঁখি,
দেখব তোমার আলো,
কবে আমি চিন্‌ব সখা
কোন্‌টা আমার ভালো !
ভু'লে যাব ভবের চিন্তা
করুণ মধুর গানে
দেখ্‌ব শুধু স্বরগলীলা
ছুট্‌ব তোমার পানে।
সব কুহেলী যাবে স'রে
দেখায় যারা ভয়,
সফল হবে সকল খেলা—
জয় তোমারি জয়।
যবনিকা স'রে যাবে,
নিবিড় যত কালো,
এক নিমেষে উঠ্‌বে জ্বলে
সত্য পথের আলো।

এই ঐহিক বেদনা সংগ্রামের মাঝখানেই মানুষ চিরদিন বাস করিতে চায়,—যতই কেন দুঃখ কষ্ট আসুক্ না, যতই কেন অশ্রুজল পড়ুক্ না, তবু এখানেই তার সাধের নিকুঞ্জ রচনা করিতে চায়! তাই ত মৃত্যুভয়! মৃত্যুতেই

আপাততঃ মানবের সকল বেদনার সকল যাতনার অবসান হইবে, তবুও শেষ শ্বাসটী ফেলে যখন মানুষ তখনও কতই তাহার বাঁচিবার আশা !

প্রত্যেকের প্রাণখানির উপর কি নিবিড় মমতা ! তাই যেই মরণ সুরে চম্‌কিয়া উঠি, সঙ্গে সঙ্গেই অমৃতের আশা জাগিয়া ওঠে। প্রেমই এই ঐহিক বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত বন্ধনডোর রচনা করে। কে এ মঙ্গল প্রেম জাগাইল ? প্রেমসখার মঙ্গল রহস্যেই মানবের হৃদয় কাননে এ প্রেম কুসুম বিকসিত। তাই সকল দৈহিকতার পরপারেও এ প্রেম ছুটিতে চায়। যাকে অসভ্য বলি, অশিক্ষিত বলি, সেখানেও সেই অমর জীবন আশা। আবার ভক্তগাথার আনন্দগানেও সেই অমৃতের আলো উজ্জ্বলতর হইয়া ওঠে, অমৃতের বাণী বরাভয় গান শুনাইয়া যায়।

অতি বড় চঞ্চল চপল মানুষও এ কথা কই উপেক্ষা করিতে পারে ? যতই কেন উপেক্ষা করা হউক্ না, যতই কেন মানুষ রিপুর শত উত্তেজনার ক্ষুদ্র জড়তার মোহে বিশ্বরাজের মঙ্গল অস্তিত্বে সন্দিহান হউক্ না, যতই কেন মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করুক্ না, তবুত মঙ্গল মুহূর্ত্তে সময় সময় অজ্ঞাতসারেই কেমন তাহার প্রাণে অমরত্বের আভাস। তখন সেই অবিশ্বাসী প্রাণই ভয়ভাবনায় আকুল হইয়া উঠে।

এই জগৎ ত চিরদিনের লীলাঘর নয়,—তুদিনের জন্য খেলিতে আসা। অনন্ত উন্নত আনন্দধামে যাত্রা করিতে হইবেই, তাই ঐহিক জীবনের এ আনন্দ বিকাশ। তাইত যুগে যুগে, সকল দেশে সকল কালে, সকল জাতিতে, একই বাণী—ভগবদ্বিশ্বাস বিবেকের আনন্দ জাগরণ আর সত্য অনুভূতি, অনন্ত জীবনের পিপাসা। এই স্বতঃসিদ্ধ আকাঙ্ক্ষাই মানবজাতির পরম কল্যাণ—আদর্শ বিকশিত করিতেছে।

ভগবদ্বিশ্বাস, বিবেকের আনন্দ-জাগরণ, সত্য বিচার আর অমরত্ব—এ যদি মানব ইতিহাস হইতে উঠাইয়া দেওয়া যায়, তবে আর তার মনুষ্যত্বের মহিমা কোথায়? কে তবে তাহাকে ঐহিকতা দৈহিকতার ঊর্দ্ধে নিয়মিত করে? ভাবুক্ ত মানুষ একবার সেই মানব-সমাজ যেখানে ধর্ম্ম নাই, সত্যনিষ্ঠা নাই, ভগবানে বিশ্বাস নাই, ভাল মন্দর বিচার নাই, অমর জীবনের আশা নাই, আছে কেবল বাসনা, বিকার, মোহ মুগ্ধ-চঞ্চল স্বার্থসেবিত বিশৃঙ্খলিত জীবন। কে রক্ষা করিবে? কাহার নয়নের জলে কে সান্ত্বনার বাণী শুনাইবে? কে কাহাকে মমতাময় বুকে টানিয়া লইবে? কেবলই নির্ম্মম বিশৃঙ্খল নিষ্পীড়ন! কি মহা শ্মশানের তাণ্ডব প্রলয়!

জীবনের অনন্ত আশার বিশ্ববিজয়ী ইন্দ্রজালের প্রভাবেই

অশিক্ষিত দীন জীবনেও কত আশার আলো উজ্জ্বল হইয়া উঠে! অনন্তকাল এক মঙ্গলময় দেবতার বুকেই আছে সবাই—তাইত দুর্ব্বল মানুষেরও এই বিচিত্র অধিকার!

তবে মুখে অমর জীবনে বিশ্বাস করি বলি, কিন্তু তাহার জন্য আনন্দে প্রস্তুত হওয়া কই দৈনিক জীবনে? তাইত মৃত্যুর নামে বিষাদ বেদনার সৃষ্টি! কেন এমন হয়? এ কেমনতর অমরত্বে বিশ্বাস, যদি আমার বুকে আশার আলো জ্বলিয়া না ওঠে। আসুক না যে কোন মুহূর্ত্তে আমার মৃত্যু, দুঃখ কেন?

সত্যই কি অমৃতে আনন্দ আশা জাগে? সত্যই কি আনন্দে অমৃতধামে যাত্রা করিতেছি? সত্যই কি আনন্দে ভবপারাবার পার হইতে চাহি? তবে কি হইবে অমরত্বের কথায়? প্রতিদিনই ত মরণ গান বাজে সংসারে। ইচ্ছায় হউক্ আর অনিচ্ছায় হউক্, একদিন ত মরণ সখার সত্য স্বরূপখানি প্রকাশিত হইবেই হইবে। বন্ধুরূপে মরণ সখা এসেছেন কি? চলেছে ত অগণ্য যাত্রী সে পথে, কে মৃত্যু যবনিকা তুলিয়া অমৃতের আলো দেখাইবে? কে এ বিচিত্র রহস্য ভেদ করিবে? তবু অমৃতের আশা বুকে লইয়াই আত্মমন্দিরে জীবাত্মা অমর সভায় বসিতে চাহে। কে সে তত্ত্ব প্রচার করিবে? ক্ষুদ্র জ্ঞান এ দৃশ্য জগতেরই বা কি

বুঝিল? কি জানি কি বুঝি? কেন এ ঘন যবনিকা! কেন এ সমাধি পরিচয়? কে সে ব্যাখ্যা দান করিবে?

তবুও ত অমৃতের আশাই অমৃতময়ের বুকে লইয়া যায়। অমৃতময় আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যুগ যুগান্তর ধরিয়া সকল দুঃখে, অমৃতের বাণী মানবের তপ্ত বুকে সান্ত্বনার স্নিগ্ধ প্রলেপ দান করিতেছে। তাই ত জ্ঞান ও ধর্ম্মসাধন, তাই ত যোগানন্দ, তাই ত সত্যসাধনতৎপরতা। কি হবে ঐহিকতার ব্যর্থ ধন সম্পদ লাভে? সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রেরই এই বীজমন্ত্র। সকল ধর্ম্মোপদেশের এই মর্ম্মকথা। আত্মা পরমাত্মার বিমল সাধনায় সকল কর্ম্মে সকল অনুষ্ঠানে ভূমানন্দ যোগ। প্রতিদিন মহাযাত্রারই উদ্বোধন। শান্ত সাধনা, অমৃত সুধা পান! এ কি অধিকার! এ কি আনন্দ! এ কি শুভ্র সুবিমল সত্তা!

তাই বলিয়া কি আমার প্রিয়ধনের মহাযাত্রা আমায় আকুল করিবে না? প্রেম যে চাহে প্রেমাস্পদের দিকে ছুটিতে, প্রেমনদী যে মিলিতে চাহে মিলনানন্দ সাগরে। কেন তবে এ বুকফাটা ক্রন্দন? কেন তবে এ বিরহ গান? জানি কি সকল বিফলতার ভিতর পরম সার্থকতা কোথায়?

জানি অমর চিন্তা—মানবের জন্য দেবলোকের আনন্দের আভাস দান করিতেছে। দুদিনের ন্যস্ত ধন ভোগ করি,

তাহাও যে চিরসত্যে প্রতিষ্ঠিত, পূর্ণ আনন্দময় দেবতার দান, এই কথা স্মরণ করিয়া তৃপ্ত থাকিতে হইবে।

অমর চিন্তা কি তবে সংসার বিমুখীন করিবে মানুষকে? তাহার আনন্দবাজারে বিষাদকালিমা ঢালিয়া দিবে? তা কেন হবে? আনন্দে আনন্দ-নিলয়ে বাস করি। আবার আনন্দ-পুরেই আনন্দপ্রয়াণ। সে দিন কেন ভয়ের কথা? প্রাণ-সখা যুগ যুগান্তর ধরিয়া ধরণীর বুকে এ কি মঙ্গলমাধুরী—আনন্দসুষমা ফুটাইয়া তুলিলেন, আর মৃত্যুমাঝে কি সব ধূলিসাৎ? কখনই না। জানি কি অসীমের অসীম তত্ত্ব? ইচ্ছাময়ের মঙ্গলেই প্রাণ সমর্পণ করি।

ক্ষুদ্র মানুষ কেমন করিয়া কোথায় পরিণত হইবে কে জানে? ক্ষুদ্র অঙ্কুর হইতেই বিরাট্ বৃক্ষের পরম পরিণতি। কে জানে এই নশ্বর লোকেই শাশ্বত জীবনের কি মঙ্গলসূচনা? মৃত্যু যাহাকে বলি, সেইত অমৃতের সোপান হইয়া আসে। এ কথাও সত্য, আছে দুঃখ, আছে বেদনা, আছে কণ্টকাকীর্ণ পথ, তার মাঝখানেই তবু অনন্ত পথের যাত্রী কেমন অনন্তের গান গাহিতেছে! যখনই অবিশ্বাস তখনই আত্মবিনাশ। আসি নাই ধরার বুকে স্বইচ্ছায়, যাইও না স্বইচ্ছায়। বেদনা আসে, দুঃখ আসে, ব্যথা যে আর সহিতে পারি না, ব্যর্থ বোঝা যে আর বহিতে পারি না! ওগো

বেদনানাশন জীবনদেবতা! তোমারই ইচ্ছায় সব দূর-পরাহত। আমিত কিছু বুঝি না, তোমার ইচ্ছারই জয় হউক।

তবে আসুক্ সে জ্বলন্ত বিশ্বাস, পরিপূর্ণ নির্ভরতা। সকল সুখ দুঃখ পরীক্ষা দেবতার চরণে নিবেদন করি। যখন তাঁহার ইচ্ছা হইবে খেলা শেষ হইবে। ওগো মৃত্যুঞ্জয়! তোমার আনন্দময় অভয় বুকে সকল ভয়ের অবসান হউক্।

আমারই পরাণপাখী
গাহিল ও কোন্ সুরে,
মুক্ত আজি কোন্ বরে
চলেছে অমর পুরে?
তাই পাখী ওড়ে বুঝি—
মেলে দিয়ে পাখাখানি,
সখার মহিমা মাঝে
শোনরে তাঁহারি বাণী।
বসুধা জননী বুকে
চেতন মহিমা মোর,
ধূলি মাঝে ধূলি মেশে
খুলে গেল সব ডোর।
কোথা তবে জাগি আমি
অক্ষয় মহিমাময়

জ্যোতির সাগর মাঝে

ছুটে চলি দয়াময়।

বল আমি জাগি কেন,

কোথা যাব কোন দেশে,

কে নেবে সমাধিপুরে

চেতন মোহন বেশে।

দেবজ্যোতি ওঠে ফুটি

আমারই ধূলি রূপে

অঙ্গে অঙ্গে ভ'রে গেল

স্বরূপ মধুর ধূপে।

ক্ষুদ্র আজি প্রাণপাখী

অনন্ত জীবন পায়,

ব্রহ্মকৃপা নেয় বুকে,

আন মনে গান গায়।

রাজসিংহাসন তব

চরণ দেউলে আনে,

ঢেলে দিই দীন অর্ঘ্য—

তোমার মহিমা গানে।

সত্য তুমি, সত্য আমি,

সত্য লোকে উঠি ফুটে',

হেসে গাই গান খানি
সকল বাঁধন টুটে।
শত্রু মিত্র সব দেখি
তোমারি ঘরেতে জাগে,
সে কোন্ পুলক সুরে
সে সুধা অমিয় মাগে ?
মৃত্যু সুরে জয়ধ্বনি
বাজিল রূপের পারে,
ভস্মমুঠি নিয়ে এল
ত্রিদিব মন্দির দ্বারে।
আসা যাওয়া সব খেলা
তোমাতেই জেগে রাখা,
আনন্দ সঙ্গীত লোকে
প্রেমানন্দে মাখা মাখা.
দেবলোকে দেবগানে
ভরেছে পূজার ঘর,
তারই মাঝে ব'সে আছি
প্রেমময় হে সুন্দর !

(১৮)

অমৃতের ব্যাখ্যা

(ক)

পিতার বুকেই আনন্দে প্রয়াণ
গড়্‌লে আমায় কে গো তুমি
মাটির পুতুল ক'রে ?
তারই মাঝে চিন্তামণি
হাস্‌ল বুকের ঘরে।
ওগো সখা, ধন্য তোমার
অবিনাশী দান,
দুলে দুলে ভবের নাটে
চল্‌ছি গেয়ে গান।
জানি তোমার সত্য পথেই
ছুট্‌ছি দিবা যামি,
তোমার দানে বুক ভ'রেছে,
তোমার মাঝেই আমি
আত্মযোগে জাগিয়ে দেছ
অসীম মহাযোগ,

প্রেম পুলকে ভরিয়ে দেছ
পুণ্য সুধা ভোগ।
মরণ কোথা, মৃত্যু মাঝে
অমৃতধাম হাসে,
দ্বন্দ্ব দ্বিধা চ'লে যায়
আনন্দেতে ভাসে।
প্রেম গরবে উঠ্‌ছে জেগে
ধূলির বেশটী ছাড়ি,
প্রাণ-তুফানে যাচ্ছে ভেসে
দিচ্ছে সবে পাড়ি।
মর্‌ব আমি কোথায় বল ?—
তোমার বুকে লীন্‌,
বুকের ঘরে জাগন্‌ সুরে
উঠ্‌ল বেজে বীণ্‌।
জয়ের ভেরী ঐ রে বাজে,
পরাণ পাখী ধায়
চিদানন্দ আকাশেতে
নামটী গেয়ে যায়।

চতুর্দ্দিকেই মরণ ধর্ম্মশীল যাত্রাগান। তাহার মাঝখানেই কেমন করিয়া মানুষ তবে উদাসীন বধির হইয়া চলিবে?

আশৈশব কেবলই আসা যাওয়ার গান শুনিয়া চলিয়াছি। চলিয়াছেন প্রিয়ধনেরা বুক খালি করিয়া,—গৃহে গৃহে কেবলই মহাযাত্রার জয়রোল। ভস্মমুষ্টি বুকে করিয়া চলিয়াছে প্রিয়জন বুকফাটা বিলাপ গান গাহিয়া। তবু এমনই জীবনের মায়া, মানুষ সব ভুলিয়াই এ সংসারে আনন্দে বাস করিতে চাহে। অথচ নিমেষে নিমেষে কত আশা অট্টালিকা ধূলিসাৎ হইয়া যায়, অকালে মৃত্যু মলিন অন্ধকার সমস্ত বিষাদে আচ্ছন্ন করে। কত বিচ্ছেদ বেদনা!

কত জন তাই ভাবে, এই দুদিনের জীবন, তবে ঐহিক সুখই প্রাণ ভরিয়া ভোগ করি। মরণ সখার আনন্দ-আগমন কে আনন্দে বরণ করিবে? অথচ এই আনন্দ-আহ্বানের ভিতরই জীবাত্মার তপস্যার বিচিত্র মহিমা। কোথায় পরম কল্যাণ—প্রেয়ে না শ্রেয়ে? চাই যে ধর্ম্ম ধন, চাই যে আনন্দ তপস্যা। দুঃখ বেদনার হোমানলের ভিতরই মানুষ যোগাসন পাতিয়াছে, ক্ষতিপীড়িত লাঞ্ছিত মনও মানুষের ভূমানন্দের সন্ধানে দেব আশীর্ব্বাদে শান্ত সমাধি লাভ করিতে চাহিয়াছে।

জীবন পথের পথ প্রদর্শক জনক জননী চলিয়া যাইলেন। আশা ও আনন্দের আধার ভ্রাতা, আনন্দ-প্রতিমা ভগিনী চলিয়া গিয়াছেন, দুঃখিনী জননীর একমাত্র বুকের ধন ফুটন্ত

ফুল ঝরিয়া গেল, সতীর জীবনসর্ব্বস্ব বরণীয় দেবতা চলিয়া যাইলেন। তবু মৃত্যুর কালো স্বরূপের ভিতরই এখনও আনন্দ স্মৃতি-গন্ধ কেন পাগল করে? রক্তাক্ত বক্ষ, ক্ষুব্ধ ব্যথিত চিত্ত। কে বলে কালে সব বেদনার উপশম হইবে? কই শোকের আগুন নির্ব্বাণ হইল? কই তপ্ত বুকে শীতল প্রলেপ? কোথায় শান্তি? ওগো, এ বুক জুড়াইবে আর কিসে? তাই কি শান্তি-সুধা ধারা নামিয়া আসিল? ভগবৎপ্রেমের এ কি আনন্দ মহিমা! এ কি অব্যক্ত বুক জুড়ানো নামানন্দ দুঃখীর সকল দুঃখের অবসান করিয়া দিল!

আনন্দময় বিশ্বে মানুষ বেশ ত তার আনন্দ পসরা সাজাইয়া চলে! তবু ক্ষণে ক্ষণে ও কি হৃদয়াকাশ ঘন তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠে? কবে অনন্ত সুপ্তির ভিতর নিত্য শান্তি লাভ হইবে? ভক্ত বাণীর মাভৈঃ বাণী কেবলই শুনাইয়া যায়, এস ভূমানন্দ লোকে, এস প্রাণারাম আত্মারাম শিবলোকে, সকল দুঃখের অবসান হইবে, অমৃতের আলো জ্বলিয়া উঠিবে। ভক্ত প্রাণের এ কেমনতর আনন্দ উদ্বোধন, আনন্দ তপস্যা, বৈরাগ্যে আনন্দপ্রয়াণ? সকলই আনন্দময়, ভয় কোথায়? ওঁ নামে পিতার বরাভয় স্বরূপে আত্ম-নিবেদনেই মহা প্রয়াণ। কি আনন্দে—অভয়পদ বুকে করিয়া চলিয়াছেন অভয়যাত্রী। কোথায় মৃত্যু-বিভীষিকা?

কল্পনার কুহকঘোরেই কাল, করালরূপের ভীষণ স্বরূপ। কোথায় তাহার সত্য প্রতিষ্ঠা? আমার সাধের খেলা অকালে শেষ হইবে? তাই হয়ত ভয়ে আকুল হইয়া উঠি; সত্যই কি এ আনন্দখেলা ফুরাইয়া যাইবে? এই বিশ্বপুরই কি মৃত্যুময়? তবে বিশ্বসভার অন্তরালে কোথায় আমার গম্যস্থল? তবে কি ধ্বংসপথেই ছুটিয়া যাইব? অথচ ধরার বুকে ক্ষুদ্র ধূলিকণারও ত বিনাশ নাই সবই এক হইতে আর একে, নব সত্তার ভিতর, নিত্য নব নব ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। কে জানে এ ধূলিময় দেহের অন্তরালে কি অমৃতময় দেবতনু লাভ হইবে? কত কল্পনার ছবি—কখনও বা দেহমুক্ত আত্মার নবস্বরূপ চিন্তায় ভয় ও আনন্দে স্তব্ধ হইয়া থাকি—কেবলই ভীত চকিত যাত্রী! কেন ভয়? কার বিচিত্র ইঙ্গিতে এ আনন্দ বিকসিত ধরণীর বুকে জীবাত্মার আনন্দ প্রতিষ্ঠা? কেন তবে বৃথা কল্পনা জল্পনায়, ভয় ভাবনায়, আপন দুঃখ-নিগড় রচনা করি?

কখনও পঞ্চভূতে লীন দেহের চরম পরিণতির কথা ভাবিয়া, আর কখনও গলিত স্খলিত রক্তমাংসে পরিপূর্ণ দেহের চরম দশা, মনে করিয়া শিহরিত হই। কোথায় আমার জাগ্রত মহিমা? দেহের ঘরেই কি চৈতন্যের পরম সত্তা? তবে দেহের ঘরে থাকিতে থাকিতেই ত হয় ত

আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিচ্যুতি ঘটে। কিন্তু কই সেই সঙ্গে সঙ্গেও আমার চেতন মহিমার সর্ব্বাঙ্গ স্বরূপ ত বিলোপ হয় না, তখনও পূর্ণ চৈতন্য 'আমি' জাগ্রত।

তবে এ পার্থিব রূপখানি কি ? তবে কি জীবাত্মা পুরাতন বস্ত্রের মতনই ভগ্ন জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নব ভাবে জাগিয়া উঠিবেন ? প্রতিদিনই ত দেহের ঘরে কত পরিবর্ত্তন —সেজন্য ত কই অভিযোগ করিতে বা ভাবিতে বসি না ? বিজ্ঞানের বিচিত্র গবেষণায় বৈজ্ঞানিক যখন জীবদেহের অণু পরমাণুর নিত্য নব নব সমষ্টির কথা বলেন, তখন ত ভয়ে চমকিয়া উঠি না। শৈশবের কোন কিছুই রক্ত মাংস ত আজ আমার যৌবনের রূপমহিমায় প্রতিষ্ঠিত নয়, আবার বার্দ্ধক্যের ভিতরও ত এই তরুণ রূপের কোন চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিবে না ! কেমন করিয়া ধীরে ধীরে জীবদেহে এ পরিবর্ত্তন আসে যায় বুঝিতেও ত পারি না ! কোন্ অজানার গোপন খেলা আমার দেহমন্দিরে ? আর, আমিও অজানার বুকের ভিতর নব নবরূপে ফুটিয়া উঠি ; অথচ চৈতন্য নিত্য, 'আমি' একই স্বরূপে দেহের ঘরে আশৈশব বাস করিতেছি ! আমরা কি বুঝিতে পারি নিদ্রা জাগরণের সন্ধিক্ষণ ? কেমন করিয়া উন্মীলিত আঁখি নিদ্রার শান্ত অঞ্চলতলে নিমীলিত হইয়া যায়, অবাক্ হই। অমনি

করিয়াই সজ্ঞানে কত যাত্রী চলিয়াছেন মুহূর্ত্তে চকিতে ও-কি মৃত্যুর ভিতর নব স্বরূপ লাভ করিলেন! ধীরে ধীরে জীবাত্মা কেমন মুক্তলোকে যাত্রা করেন, কত ভাবে তাহার প্রকাশ! আমরা মরণ বাসরে বেদনার প্রকাশ দেখিয়া অধীর হইয়া উঠি, সেত ঐহিক, দৈহিক যাতনা। যেই মরণ-সখার কোমল পরশ, অমনি সকল জ্বালার অবসান। আকাশ কুসুমের মত ব্যর্থ কল্পনা জল্পনা মানুষের! সত্যই ত এই দেহখানি আমার জাগ্রত স্বরূপ নয়,—আত্মচৈতন্য আমি, অমরত্ব তার প্রাণস্বরূপ। তাই জীবাত্মার অনন্তে গতি, অনন্তে স্থিতি। যদি আত্মার এই অনন্ত আশা আকাঙ্ক্ষা মিথ্যা হয়, তবে সকলই মিথ্যা, তবে এ জগৎ মিথ্যা, এ জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড সকলই ভৌতিক কাণ্ড; হিতাহিত বিবেচনা, বিবেকের প্রাণময়ী বাণী, ধর্ম্ম কর্ম্ম ঈশ্বর সবই মিথ্যা!

সেই আদিম যুগে মানবের জ্ঞান যখন উন্মেষিত হয় নাই, যখন সভ্যতার আলোকে জগৎসভা আলোকিত হয় নাই, যখন দেশ মহাদেশ বিপুল বাণিজ্যের পণ্যভারে নব নব আবিষ্কারের ভিতর সুসজ্জিত হইয়া উঠে নাই, তখনও—সে অপরিস্ফুট জ্ঞান দেবতার অস্তিত্ব আর জীবাত্মার অমরত্ব বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। যুগের ইতিহাসে কত পরিবর্ত্তন,

কত রাজ্যের অভ্যুত্থান, কত পরাক্রমশালী নৃপতির প্রচণ্ড প্রতাপ, কত হাহাকার, ধ্বংসাবশেষ, কিন্তু সকল পরিবর্ত্তনের অন্তরালে মানব ইতিহাসের অপরিবর্ত্তনীয় সত্য বিশ্বাস—জীবাত্মা পরমাত্মার অখণ্ড যোগ, সমগ্র সাধনার সামগ্রী। যখনই সে অস্তিত্বে অবিশ্বাস, যখনই মানুষ আত্মার নশ্বরতা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে—তখনই তাহাকে সাধারণ মানব-পদবীর নিম্নে, বিকৃত মানব-গোষ্ঠীতে তার স্থান লাভ করিতে হইয়াছে।—কত দার্শনিক আসিলেন, কত কিছু ব্যাখ্যা দিলেন, তবু অমৃতে প্রাণ সমর্পণ, এ কথা মানুষ ভুলিতে পারিল না। ভাষা প্রকাশ করিতে পারিল না—তবু পরমাত্মায় আত্মনিবেদন। আমি আছি, তুমি আছ, আমরা আছি,—আত্মচৈতন্যের ভিতর এই যে চির জাগরণ কে অস্বীকার করে? এই আত্মচেতনার মহিমালোকেই সকল জ্ঞানলীলার মর্ম্ম নিহিত, সত্যপ্রতিষ্ঠিত অমৃতের আশ্বাস মানবের মর্ম্মস্থলকে এমনই আশ্বস্ত করিয়াছে যে, দেহের পরপারেও সে কেবলই জাগিয়া থাকিতে চাহে। এই আশ্বাস-বাণীই তাহাকে স্থির ভূমি দান করিয়াছে। তাই ভবিষ্যতের গোপন রহস্যদ্বার খুলিবার জন্য মানবপ্রকৃতির অনন্ত অনুসন্ধিৎসা, অমৃতময়ের ভালবাসার ভিতরই পারলৌকিক তত্ত্বের মর্ম্মকথা।

যতই কেন মানুষ বিশ্বজ্ঞানের অধিকারী হউক্ না, তবু মনে রাখিতে হয়, তার ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারা কতটুকুই বা সে জ্ঞান উপলব্ধি করিবে? বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে কে আমি অণু পরমাণু? কেমন করিয়া মুক্ত আত্মস্বরূপ রহস্য উপলব্ধি করি? জন্মান্ধ জন যদি আশার বাণী শ্রবণ করে যে তাহার দৃষ্টিশক্তি লাভ হইবে, কত কিছু সে আনন্দে কল্পনা করে। তেমনি জীবাত্মা দেহ মুক্ত হইয়া নব সত্তা লাভ করিবে এই আশ্বাস বাণীর ভিতরই দেহের ঘরে বসিয়াই দেহাতীত শুদ্ধস্বরূপ মহিমা উপলব্ধি করে, আর মরণ যবনিকা উধাও হইয়া যায়।

দেহমুক্তির অন্তরালে—আমার স্বরূপ কথা জানেন সৃষ্টি-কর্ত্তা বিধাতা। অমৃতময় দেবতা অমৃতের বাণী ঘোষণা করিয়াছেন—শুদ্ধ নির্ম্মল আত্মা কি অব্যক্ত মঙ্গল আশীষালোকে জাগিয়া উঠিবে, কে জানে? আবার, যে পাপী তাহাকে কি অনুতাপের অসহ্য বেদনা বহন করিতে হইবে, তাই বা কে জানে?

তবে এই ত পরম সান্ত্বনা যে, দেহের ঘরে বাস করিয়াই অমৃতের আভাস, দেবতার বরণীয় স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। যে প্রেম দিনরজনী রক্ষা করে, যে প্রেম প্রকৃতির বুকে অক্ষয় আনন্দ ধারা প্রবাহিত করিতেছে, যে প্রেম আমার অন্তরে বিশ্বের আনন্দ ছন্দ রণিত করে, সে প্রেম কি

আমায় পরিত্যাগ করিবে ? এ কি ক্ষণকালের জন্য ? অনন্ত পূর্ণ মঙ্গল দেবতার ঘরেই আছি, এ ত দুদিনের জন্য নয়, এ অনন্তকালের আয়োজন।

কেমন করিয়া অমৃতলোকে যাত্রা হইবে ? কেমন করিয়া অমৃতের উপলব্ধি হইবে ? সীমার ঘরে বাস করিয়া কতটুকু ধারণা করিতে পারি ? একমেবাদ্বিতীয়ম্ শিবসুন্দর লোকে জাগ্রত আমি, সে মহিমালোকেই এ জীবনপদ্ম হাসিয়া উঠিবে। সীমার মাঝে কালের বিচিত্র প্রবাহের ভিতরই অনন্তের ছবি সতত উদ্ভাসিত। যতই শান্ত হইয়া, তন্ময় হইয়া, রূপসভায় মানুষ রূপের ইতিহাস পাঠ করে, ততই অমৃতের আশ্বাসবাণী শুনিতে পায়।

বিশ্বাস করি, এ ধরণীর বুকে প্রেমময়ের বুকেই বাস করি। তবে কেন ঐহিক বিদায় বেলায় নয়নের জল ? তবু অশ্রুজলেই, অবিনশ্বর প্রেমের আনন্দ আভাসেই, আমার সকল দুঃখের শান্তি ; অমৃতের জয়ানন্দগানই আমার সকল আকাঙ্ক্ষার পরম সার্থকতা।

বিশ্বপুরে এ কি অনন্ত পরিচয়! কোটি কোটি জগৎ ছুটিয়াছে, গ্রহ উপগ্রহ কোটি চন্দ্র ভানুর নৃত্যলীলা কে সীমা করে ও শেষ করে ? অথচ সমস্তই কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত, সমস্ত এক কল্যাণভাবে উদ্বোধিত।

অনন্তবুকে এই জগৎরহস্য বা কত সামান্য! অসীমের মঙ্গল সঙ্গীত মানব বক্ষবীণায় ঝঙ্কৃত, তাইত দেবতার মহিমা! ফুলটী ফুটিয়া উঠে, ঝরিয়া যায়; কিন্তু যে প্রাণশক্তি তার মর্ম্মদল বিকসিত করিয়া তুলিল, কোথায় তাহার বিনাশ? সমস্ত বিশ্ব প্রাণময়ের প্রাণসাগরে ভাসমান। কেমন করিয়া বাষ্প মেঘে পরিণত হয়, আবার মেঘমালা ঘনীভূত হইয়া ঝর ঝর বারি ধারায় নব প্রাণ ধরণীর বুকে জাগায়, যেখানে উৎপত্তি সেখানেই আবার জলবিন্দুতেই পরিণতি। জগৎবুকে জীবদেহ অণু পরমাণুর ভিতর গড়িয়া উঠে, আবার অণু পরমাণুতেই বিলয়।

অজানা শক্তির বিচিত্র রহস্যের অন্তরালে সব গড়িয়া উঠিয়া, আবার তাহাতেই যেমন বিলীন হয় তেমনই জীবাত্মা আত্মচেতনার ভিতর জন্মলাভ করিয়াছে, আত্ম সুন্দরেই তাহার পরম গতি। এ অখণ্ড নিয়ম কে খণ্ডন করে? ধূলির দেহের ধূলিতেই লয়, আর চির চৈতন্যময় আত্মজ্যোতি জ্যোতির্ম্ময়ের আনন্দ আলোকেই উজ্জ্বলময়। সত্যি সত্যি কি বুঝি এ কথা? যুগে যুগে ভক্ত বুকে এ কথাই সকল কথার ভিতর সার সত্য হইয়া প্রকাশিত।

অমৃতের আশ্বাসবাণী যখন শুনিয়াছি, তখন প্রিয়ধনেরা কেমন করিয়া মরণ পথে ছুটিবেন? আমিও যাব সে অমৃত

নিকেতনে, নিত্য গৃহে। না জানি সে কি আনন্দ—না জানি সে কি আনন্দ সম্মিলন। তবে কেন আর নিরাশার ক্রন্দন বিলাপ—? ওগো পিতা পরিত্রাতা, যে করুণা আনিয়াছে; রাখিয়াছে, সেই করুণাই একমাত্র ভরসা। শান্ত হও মন, প্রতীক্ষা কর, অভয় পদ বুকে করিয়া ভবসাগর পার হইয়া যাইবে। কোথায়? কতদূর? তবু অমৃতের আশ্বাস আমার সকল কুহেলী মোচন করিয়া অনন্তের পথে আহ্বান করিতেছে। ধন্য প্রেমময়, তুমি ধন্য! কোথায় মৃত্যু? কোথায় বিরহ?

(খ)

পরজীবন

ভালে আমার জয়-বিন্দু
সখার দেওয়া দান,
বৃথা কি গো আছি আমি!—
চল্‌ছি গেয়ে গান।
সেই দানেতে বুক ভরেছে,
তাই ত আমি হাসি,

মন গোপনে উঠ্‌ছে ফুটে
পুষ্প রাশি রাশি।
সীমার মাঝে ক্ষুদ্র আঁখি
কত টুকুই দেখে!
অসীম মাঝে চল্‌ছি আমি
সুধা গন্ধ মেখে।
এই জানাটি জানিয়ে দেছ,
অজানারই সুরে,—
ভয় নাইক,—অভয় নামে
সকল গেল দূরে।—

(২)

বসুধা-জননী বুকে
হ'য়ে যাব ছাই,
নিমেষে উধাও হব—
নাই নাই নাই।
তবু ওকি জেগে থাকা
অনিমেষ আঁখি!
খাঁচা খুলে উড়ে গেল
পোষা প্রাণ পাখী।

চলার আনন্দে জাগে—

শুদ্ধ পুণ্যধাম,

অসীম আনন্দ-কোলে

গায় ব্রহ্ম নাম।

এ কি অমরত্ববোধ! মৃত্যুময় সংসারে বাস করিয়াই যুগ যুগান্তর ধরিয়া এই অমৃতের সাধনা। প্রাচ্যে প্রতীচ্যে, সভ্যতায় অসভ্যতায় সকল কালে, সকল ধর্ম্মে, এই অমৃতময়ী বাণী। সৃষ্টির আদিকাল হইতে অমৃতের সন্তান অমৃতের ভিখারী হইয়া চলিয়াছেন। অমৃতে জন্ম, তাইত অমৃতের আকাঙ্ক্ষা। কেন বিশ্বরাজ এ প্রেমপিপাসা মানবের বুকে সঞ্চার করিলেন? এ কি তবে ক্ষণিক মায়া জাল? তাহাও ত নয়।

জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার পরম কল্যাণোৎকর্ষ কি বৈজ্ঞানিক জগতে কি আত্মপুরে নিত্য নব নব সত্যে ফুটিয়া উঠিতেছে। কখনও ভাবে, বুঝি বা মৃত্যুর পরপারে কোন্ জ্যোতিষ্কলোকে জীবাত্মার নব বসতির আয়োজন হইবে, কখনও মনে করে, কে জানে কোন্ ভীষণ নরককুণ্ড পাপীর শাস্তির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যতই জ্ঞানালোক হৃদয় ঘর আলোকিত হইয়া উঠিতেছে ততই এ অন্ধ সংস্কার দূর পরাহত।

কেবলই জটিল প্রশ্নের সমাধান। কখনও প্রশ্ন জাগে, আমার এ আত্ম চেতনা কি দেহান্তেই লয় হইবে? তবে আমার এ চেতন মহিমার প্রাণ সত্তা কোথায়? কেন এ সব কল্পনা জল্পনা? অল্পদর্শী সসীম দৃষ্টি কতটুকু দেখে আর কতটুকু বোঝে? সসীম ঘরে বাস করে, তাইত পুণ্যস্বরূপ উপলব্ধি হয় না। মুক্ত আত্মার সচ্চিদানন্দে আনন্দে বিহার কেমন করিয়া তবে উপলব্ধি করি?

মৃত্যুর সঙ্গে নিদ্রাবস্থার তুলনা করা হয়। অথচ নিদ্রা কাহাকে বলে, আর অচেতন হওয়াই বা কাহাকে বলে, তাহা কি বলিতে পারি? নিদ্রার সঙ্গে সঙ্গে বহিরিন্দ্রিয়ের কর্ম্মতৎপরতা শিথিল হইয়া যায়; অথচ অন্তর্জগতে চেতনার ক্রিয়াশীল ধর্ম্ম ত স্তব্ধ হইয়া যায় না! নিদ্রার সময় ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, বহির্জগতের সত্তা আর চিত্ত মুকুরে প্রতিফলিত হয় না, অথচ জীবাত্মার জাগরণ ত তখনও বর্ত্তমান স্বপ্নঘোরে আত্মচেতনার ভিতর কেমন ঘুরিয়া বেড়ায় মানুষ, কত কিছু দর্শন করে, অথচ বাহিরের জগতের সঙ্গে ত ইন্দ্রিয় জ্ঞানের কোন প্রক্রিয়া চলে না! নিদ্রাবেশের ভিতরও ত আমাদের সত্তা উপলব্ধি করি।

মরণপথের যাত্রীরও হয়ত এমনি করিয়াই দেহমুক্তির পরেও চেতনক্রিয়া জাগ্রত থাকে। তবে ধীরে ধীরে

ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগতের প্রতিচ্ছবিও উধাও হইয়া যায়।

তাই অমৃত ধামের যাত্রীর তখন শাশ্বত জ্ঞানে সকল ভয় বিভীষিকা তিরোহিত হইয়া যায়। চেতন ধর্ম্মশীল আত্মা নবজাগরণের সঙ্গে আবার নব ভাবে নব যাত্রা আরম্ভ করে। কোথায় মৃত্যু তবে? কে জানে কোন্ নবতর সমস্যার ভিতর জীবাত্মার নবতর গৌরব লাভ হইবে? জানি, চেতন সুন্দরের চেতন মহিমার ভিতরই জীবাত্মার নবসত্তা।

ভূমা মহানের অব্যক্ত অনন্ত শক্তি কে জানে? মরণশীল দুর্ব্বল মানুষ সসীম ঘরে অসীমের মহিমা বর্ণন করিতে চাহে। বিশ্ব স্বরূপে বিশ্বমঙ্গল জ্যোতি জ্যোতিষ্মান—কোথায় ব্যর্থতা, ক্ষুণ্ণতা, দীনতা? সমস্ত মহামহিমালোকে আনন্দে মাধুর্য্যে উদ্ভাসিত। মৃত্যুও সেই মহিমাময়ে মহিমান্বিত, জীবাত্মার উজ্জ্বল নির্ম্মল জ্যোতি সত্তালাভেই মৃত্যুর মহিমা।

যেদিন দেহ মুক্ত হইয়া যাইবে, সকল দৈহিকতার আবরণ ছিন্ন হইবে, সেদিনই সকল জটিল তর্কের সমাধান। ভূমা মহানের অখণ্ড শক্তি কে ধারণা করে? যত ভাবেই অপূর্ণ ক্ষুদ্র বদ্ধ মুগ্ধ আমি মুক্ত আত্মার স্বরূপ চিন্তা করি না কেন, সাধ্য কোথায় তার সত্য নির্ম্মল সত্তা অনুভব করি?

অনন্তের অনন্ত লীলা জানি কি কিছু? জীবাত্মার মুক্ত শুদ্ধ সত্তা বুঝি কি? সে মুক্ত স্বরূপের ভিতর আত্মার বিমল আনন্দের অভিজ্ঞতা কেমন করিয়া হইবে—আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানরাজ্যে? ক্ষুদ্র মানবজ্ঞান এই দৃশ্য জগতের লীলা-রহস্যই কতটুকু বা ভেদ করিতে পারিল? তবে মরণধর্ম্মশীল মানবের বুকেই যে আবার অমৃতের বীজ রোপিত হইয়াছে; তাইত ক্ষুদ্র বুকেই তাহার অমৃতের আশ্বাসবাণী। অমরত্বের বিচিত্র সত্তা, কালাতীত ধর্ম্মে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অনুপ্রাণিত; বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের খণ্ড প্রকাশের ভিতর অখণ্ড প্রকাশ; সীমার ঘরে বাস করিয়াই অসীমের জ্ঞান, মৃত্যুর মঙ্গলমহিমার ভিতরই অমৃতের আলোক ছটা।

আমি এ বিশ্ববুকে দেহের ঘরে বাস করি, আর আমার হারানো প্রিয়ধনেরা তবে কোথায়? তাঁরাও ত সেই একমেবাদ্বিতীয়ং স্বরূপেই অবস্থিত। না জানি তাঁরা কি মুক্ত স্বরূপে মনোমোহন সাজে আরও কি অপূর্ব্ব আনন্দ-লোকে বাস করেন। দেহের ঘরে কত ভুল বোঝা, কত বন্ধন, কত বিকার, আর দেহাতীত স্বরূপের কি শুদ্ধ মুক্ত বিহার! যাহাকে মৃত্যু বলি, সেই মৃত্যুই ত অমৃতের বুকে স্থান দান করে! তবে কেন মৃত্যুর এ কালো রূপ? এ ত বিনাশ লীলা নয়, এ যে চির জাগরণের উদ্বোধন

মাত্র। প্রিয়ধনদের জন্য ক্রন্দন করি, অথচ সব ত সেই শাশ্বত বুকে—বিচ্ছেদ কোথায়? কালের ব্যবধান কোথায়? অনন্ত বুকে অনন্ত কালেই সকলের আনন্দ আরাম। তাহারা যে আমার, আমিও তাহাদের। সংশয় অন্ধকারে সজল নয়নে আমার দিন যামিনী কাটে আর আমার প্রিয়ধনেরা বিমল স্বরূপে নবমিলন মঙ্গল প্রতীক্ষায় না জানি কি আনন্দে বাস করেন! আমার অন্ধ আঁখি দেখে না, কেমন করিয়া তাঁহাদের মুক্ত আত্মা আনন্দে মিলনগান গাহিয়া যায়। কেন আমার এ নিবিড় বেদনা? ওগো আমি যে তাঁহাদের প্রিয় সঙ্গে বঞ্চিত, কি করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ উপলব্ধি করি! হায়! হায়! যখন দেহের ঘরে ছিলেন সবাই, তখনও ত কাছে কাছে রাখিতে পারি নাই, তখনও কত বিচ্ছেদ,—বিদেশে গিয়াছেন—কত বিরহকাতর প্রাণ। তবুত সে বিচ্ছেদে ত এমনতর নৈরাশ্যের ঘন ব্যথার মেঘ বুকে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে নাই। তখন যে আশার ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিত,—আমি ফিরিয়া পাইব আমার বাঞ্ছিত ধনদের! এখনও কেন তেমনি করিয়া আশা জাগে না? এও ত নবতর উন্নতলোকে মহাযাত্রার আনন্দ ঘোষণা। সকলে ভিন্ন গৃহে বাস করি—অথচ পরম পিতার কল্যাণ স্বরূপেই জাগিয়া আছি, তাইত হৃদয়ের যোগ ফুরায় না।

তবে কেন ক্রন্দন? আমার প্রিয়ধনেরা বড় আনন্দে বড় সুখে আছেন। কত নির্ম্মলতর আনন্দ, প্রেমময়ের প্রেমান্ন সম্ভোগে কি নবশক্তি লাভ করিয়াছেন! কি আনন্দ বলিহারি! সংসারের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের ভিতর কোথায় সে নির্ম্মল আনন্দসম্ভোগ? নবতর স্বরূপে জীবাত্মার নব আনন্দ সম্ভোগের কাছে এ সাংসারিক ক্ষুদ্র কামনা বাসনা কি তুচ্ছরূপেই পরিগণিত হয়।

জীবাত্মার সার্থকতা আত্মজ্ঞানে। যখন জ্ঞান-স্বরূপের ভিতর তার প্রকৃত সত্য লাভ হয়, সে কি অব্যক্ত অনুভূতি! জীবাত্মার কত স্বরূপ তাহা কি বুঝি? যেদিন আত্মস্বরূপের উপলব্ধি হয়, সেদিন ত এই পার্থিব ধন ঐশ্বর্য্য কত তুচ্ছ হইয়া যায়! এই ইহলোকেই বর্ত্তমান অবস্থাকেই হয়ত মূল্যবান্ মনে করি। যা কিছু জীবনের অভিজ্ঞতা তার মধ্যে অধিকাংশ হয়ত কত অসার কত ক্ষুদ্র, তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত ভুলিতে চাহি। সে সব মনের ঘর হইতে ধুইয়া মুছিয়া শুদ্ধ হইতে চাহি। মুক্ত আত্মারও হয়ত এমনিতর অনুভূতি জাগে, তার দেহের ঘরের অপূর্ণ অবস্থা ব্যর্থতা সকলই অসার মনে হয় তার জ্যোতির্ম্ময় পুণ্য প্রতিষ্ঠার ভিতর। যদি হীনতর অবস্থা পাই, তাহা হইলে কি ব্যথিত হই না? দেবলোকে যাহার

উন্নত লোকে গতি, তাহার কি আর সীমার ঘরে ক্ষুদ্র বিকৃত জীবনের পিপাসা জাগিতে পারে? তবুও যেমন বার্দ্ধক্যে নানা নূতন সঙ্গীলাভের ভিতরও সেই যৌবনের বাল্যের স্মৃতি বাল্য বন্ধুদের সত্য প্রণয় ভুলিতে পারে না মানুষ, তেমনি মুক্ত আত্মা উন্নতলোকে বাস করিয়াও প্রিয় স্মৃতি কেমন করিয়া ভুলিবেন?

প্রেমযোগে মর ধর্ম্মের ভিতরই অমরত্ব! আত্মার সত্যস্বরূপ প্রেমধর্ম্মেই পরম প্রেমময়ের প্রেমেই পবিত্র বিশ্বভুবনে এই মঙ্গল বাণী শুনিয়াছে মানুষ। দেহের মিলন যোগে যে প্রেমের জন্ম সে ত ক্ষণস্থায়ী, তাহাতে কত বিকৃতি কত ভ্রান্তি! আহা! অনন্ত ভূমা মহানের যে অক্ষয় উদার প্রেম তাহা ত সকলকেই বেষ্টন করিয়া আছে! এই প্রেম সকলকেই আহ্বান করিতেছে। হৃদয়ে হৃদয়ে প্রীতির মঙ্গল ধারা প্রবাহিত, তাইত দেবগন্ধ জীবনে জীবনে। তাহা না হইলে কে পাইত এই দেব উপাদান? যাহা দেবধর্ম্ম তাইত অমৃত। যতই দীন হই না কেন ঐহিক জীবনে আমাদের সত্য প্রভাব, স্নেহ প্রেম ভক্তি তাহা ত উপেক্ষিত নয়। সহস্র সহস্র স্মৃতি ধূলির ঘরে ধূলিসাৎ হইবে কিন্তু প্রীতিধারা অনন্তকাল মানব বুকে প্রবাহিত হইয়া যাইবে। আত্মায় আত্মায় আনন্দ যোগের

ভিতর পরমাত্মা অমৃতের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন। ইহা ত বিচ্ছেদ সাধনের জন্য নয়; ক্ষুদ্র মানুষ পারিল না তাহার প্রেমকে উপেক্ষা করিতে, আর প্রেমসুন্দর প্রেমকে বিনষ্ট করিবেন, এ কি সম্ভব? বিশ্বভুবনে প্রেমের তুলি বুলাইয়া দিয়া কি মঙ্গল সুষমা দান করিলেন! আর হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমযোগের শুদ্ধ মন্ত্র যখন পাঠ করা হইয়া গেল, তখনই অনন্ত যোগ প্রতিষ্ঠিত হইল। বিনাশের কথাও প্রেম শুনে না, বুকভরা প্রেম যে প্রেমময়ের প্রেমেই সার্থকতা লাভ করিতে চাহে!

যতক্ষণ হৃৎপিণ্ডে শোণিতধারার আনন্দ নৃত্য, ততক্ষণ আমার প্রেমধারা ত নৃত্য করিয়াই চলিবে। কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব? ঈশ্বর প্রেমময়, ঐ আশাতেই নিত্য প্রেমের অর্ঘ্য রচনা করি। জানি আমার দৈহিক জড়তা ও উত্তেজনার ভিতর সে শুদ্ধ সুনির্ম্মল মুক্ত প্রেমের জন্ম হয় নাই, তবুও অশ্রুজলেই প্রেমের মালা দিন রজনী গাঁথিতে চাহি। আমার সজল নয়ন আকুল উদাস হইয়া নক্ষত্র লোকে—কোথায় কে জানে কোন উর্দ্ধলোকে—তোমাদের সন্ধানেই উধাও হইয়া যায়। তোমরা হয়ত আমার অন্ধ খেলায় হাসিতেছ, হয়ত আমার ব্যর্থ বেদনার কাহিনী ও আমার প্রতি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের যখন স্মরণ

করি, হয়ত তোমরা গোপনে তাহা শুনিয়াছ আর ভাবিতেছ একি আমাদের মিথ্যা অবসাদ !

প্রেমযোগে অনন্তযোগ, সাম্যের ভিতর—সাম্যধর্ম্মের ভিতর প্রেম শুদ্ধতা লাভ করে। যাহা দৈহিক তাহার দেহান্তে অবসান, আর যা দেবসত্তা তার অনন্ত স্থিতি কে বিনাশ করিবে? দেহাতীত পুণ্য আত্মযোগ ত দেহের ঘরে কল্পনাও করিতে পারি না! কেমন করিয়া বিদেহী আত্মা কর্ম্মযোগ সাধন করে? যত কিছু পারত্রিক অবস্থা ভাবি, সবই আমার দৈহিকতার ভিতরই জড়াইয়া ফেলি। এই মাত্র বুঝি পিপাসিত প্রেমমুগ্ধ আত্মা আকুল হইয়া আছে, তার হৃদয়-পাত্র বিচ্ছেদ বেদনায় পরিপূর্ণ, তবু জানি আছেন সুখে সকলে নবতর আনন্দলোকে। তাই শত বেদনার ভিতরও সান্ত্বনার আনন্দ। যাহার একবার চেতন সত্তা লাভ হইয়াছে তাহার অক্ষয় অমর অধিকার।

কোথায় আমি? এই পৃথিবী গ্রহে সীমার ঘরে বাস করি সত্য, কিন্তু সসীম ভুবনখানি যে অসীমেরই আনন্দ মেলা। বিশ্বপাতা বিধাতা আমিত তোমারই। যেদিন দেহের ব্যবধান চলিয়া যাইবে সেদিন সে-কি আনন্দ, সে কি নব চেতনা, নব উপলব্ধি। এ পৃথিবী, এও যে পবিত্র দেবালয়। এই দেবালয়ে বাস করিয়াই ত্রিদিব মন্দির

দ্বার দর্শন করি। আমার সকল সংশয় সংগ্রাম, সকল চেষ্টা ধন্য। এ সমস্তই দেবশক্তি জাগরণের আনন্দ সাধনা।

তবে দূরে যাউক্ আমার ঘোর সংশয়, ক্ষুদ্র বাসনা কামনা। পুণ্যময় দেবতারই আমি। ওগো আনন্দময়! এ জীবনকে তোমারই পুণ্য চরণদেউলে উৎসর্গ করি। কি আনন্দ! আমি তোমার হইলাম। আমি তোমার আমার প্রিয়ধনেরাও তোমার। পুণ্যময়! তাঁহারাও যে তোমারই পুণ্যপথে আহ্বান করিতেছেন।

(গ)

শাস্তি ও পুরস্কার।

ভুলে যাও পাপ তাপ,
ফেলে দাও দীন সাজ,
থাকুক্ দুখের গান—
হাসে আজি হৃদিরাজ।
মঙ্গল শাসন দণ্ড
যেচে নেবে প্রাণঘরে,
কেন তবে ভয়ে ভয়ে
আঁখি জল সদা ঝরে?

রুদ্ররূপে আসিবে কি

প্রচণ্ড আঘাতে তুমি ?

তবু আমি বুকে নেব

তোমারি চরণ চুমি' ।

জয় ঘণ্টা বেজে ওঠে,

কোথা গেল ফোটা তারা

তবু বাজে ঘন ঘন

আকুল আনন্দ হারা ।

ধুলি মুঠি ফেলে দিয়ে

সমাধি বুকের 'পরে

কম্পিত আকুল প্রাণ

যেতে চায় নিজ ঘরে ।

(২)

ঝঙ্কার প্রবল বায়ু

ব'য়ে গেল মোর ঘরে,

তাহারি হুঙ্কার সুরে

ডেকে নিল কোন্ বরে ?

গরজি গরজি ডাকে,

শৈল বুকে হানা হানি,

তারি মাঝে চুপে চুপে

ক'য়ে যায় কাণাকাণি

মঙ্গল আসিবে নামি

তারি তরে এত ঘটা,

শাসন-বিচিত্র-বিধি

তাই হাসে দেব-ছটা।

যে চরণ বুকে ধ'রে

ত্রিদিব উঠিল জাগি',

প্রলয় আসিছে নামি'

তাঁহারি করুণা মাগি'।

ধ্বংসের বিচিত্র গান

বসুধা-জননী বুকে,

তারই মাঝে জাগি আমি

তাই গেল সব চুকে।

নিয়তি মানিয়া চলে,

গেয়ে যায় গান তার,

অনন্ত সাগরে ছোটে,

নাহি তার পারাবার।

একদিন চকিত নয়নে যখন শোকের ঘনজাল হৃদয়া-কাশকে আচ্ছন্ন করে, যখন প্রিয়বিরহাকুল মন আর কিছুতে

সান্ত্বনা পায় না, তখন মানবপ্রাণ স্বতঃই অমৃতের পিপাসু হইয়া ছুটিতে চাহে—তখন একবার সত্যপ্রকাশ অনন্ত-জীবনের রহস্য ভেদ করিতে চাহে। একবার দেহমুক্ত আত্মার সন্ধান পাইতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। কিন্তু যে হৃদয় স্বতঃই অমৃতপিপাসু, তাহার অমৃতের পিপাসা, অমৃতের সন্ধান সর্ব্বকালের জন্য। হয়ত আবার কতজন দেহের পরপারে আত্মার নিত্য বসতি কল্পনাও করিতে পারেন না, তাই সংশয়ে উপহাসে সমস্ত অগ্রাহ্য করেন।

কতজন হয়ত অনন্তজীবন সম্বন্ধে জানিতে চান্, সংশয় সন্দেহের ভিতরেই তার সত্য প্রমাণ ভাল করিয়া বুঝিতে চাহেন; কিন্তু কেমন করিয়া তাহা সপ্রমাণ হইবে? আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানলব্ধ অনুভূতি কেমন করিয়া সে ইন্দ্রিয়াতীত স্বরূপতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিবে? অমর জীবনের শাশ্বত প্রমাণ আত্মজ্ঞান সাপেক্ষ। যে মানুষ দেহমুক্ত হইয়া যাইতেছে, সে তখনও জানিতেছে 'আমি আছি, আমি থাকিব', এবং ঠিক সেই আত্মজ্ঞান দেহের ঘরেও জাগ্রত। যেমন ভবিষ্যৎ আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের ভিতরই অনুমেয়, সেই আনুমানিক তত্ত্বজ্ঞানই সত্যরূপে পরিস্ফুট হয়। যাহা ভবিষ্যৎ তাহা যখন জীবনে সত্য হইয়া আসিল, তখন বর্ত্তমানেই তাহা জাগিয়া উঠিল।

আত্মজ্ঞানকে কেমন করিয়া প্রমাণ করিয়া ধরিয়া ছুঁইয়া বোঝান যাইবে; দেখান যাইবে? 'আমি আছি' এই অস্তিত্বের মর্য্যাদার ভিতরই প্রতি মানুষ চিরজাগ্রত; অথচ এ অনুভূতিকে কে প্রমাণ দ্বারা বুঝাইবে? অথচ কে আপন অস্তিত্বের অস্বীকার করিবে? সবাই জানে 'আমি করিতেছি', 'আমি ভাবিতেছি', 'আমি দেখিতেছি'—তেমনই 'পরমাত্মা আছেন' এ কথাই বা কেমন করিয়া বুঝাইবে—অথচ আত্মদর্পণেই পরমাত্মার বিমল জ্যোতিঃ। তেমনি আমি জীবাত্মা আমার নিত্যস্বরূপ আত্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন্ যুক্তি পরীক্ষায় তাহা প্রমাণিত হইবে? ইহা ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান নয়, ইহা ত লৌকিক মত নয়। ইহা ত কোন কিছু বিশ্বাস করিয়া মানিয়া লওয়া নহে যে, ইচ্ছামত স্বীকার করিলাম আর অস্বীকার করিলাম; ইহা ত স্বভাবগত আত্মপ্রত্যয়, আত্মজ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য এ কথা সত্য, এ সহজ জ্ঞান সকল জীবনে পরিস্ফুট হইয়া উঠে নি। তাই কত মানুষ পরমাত্মার অস্তিত্ব কি জানে না, সে জন্যই তাঁহাতেই যে জীবাত্মার প্রাণ প্রতিষ্ঠা, সে কথাও উপলব্ধি করিতে পারে না। অসংখ্য মানুষ যেমন স্বাস্থ্য সম্ভোগ করে অথচ স্বাস্থ্য কি তাহা সে জানে না, তেমনিই পরমাত্মায় আত্মার নিত্য জাগরণ, এ জ্ঞান মানুষ বুঝিতে শেখে নাই,

চিন্তা করিতে শেখে নাই, তাই পরমাত্মা আর জীবাত্মার সত্য প্রকাশ উপলব্ধি হয় না। যেমন পীড়িত হইয়াই মানুষ স্বাস্থ্যের মূল্য বোঝে, তেমনই মন যখন শোকে দুঃখে পীড়িত, তখনই সে জীবনের গভীর রহস্য জাল মোচন করিয়া সত্য ভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে চাহে। পরমাত্মাই জীবাত্মার প্রাণ,—এই সত্য প্রতিষ্ঠার ভিতরই জীবাত্মার শাশ্বত স্বরূপ বিকশিত; তাই দেহের ঘরে বাস করিয়াই আত্মজ্ঞানে তাহার নিত্য স্বরূপখানি উপলব্ধি করে। তাই বিশ্বরূপেই দেশকালাতীত সত্য মাধুরীজ্যোতি দর্শন করি, তাইত এ আনন্দ যোগের আনন্দ সাধনা।

অনেকে হয়ত ভূমা মহানের অখণ্ড শক্তি জড় জগতের কার্য্য কারণ-শক্তিরূপে ভাবিতে পারে, অথচ তাঁহাকে চৈতন্যময় জ্ঞানময় ইচ্ছাময় প্রেমময় বলিয়া বুঝিতে পারে না। হয়ত মানুষ তাহার চেতনার প্রাণসত্তা অনন্ত চৈতন্যময়ে উপলব্ধি করে, কিন্তু তিনি যে ইচ্ছাময় মহান্ পুরুষ, তাঁহার এই বিশেষ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না; তাই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনাই হউক, কি মহা মহীয়ান ব্যাপারই সম্পন্ন হউক না কেন, সব কিছুর ভিতরই সেই এক ইচ্ছাময় শিব সুন্দরের মঙ্গল জ্যোতিপ্রকাশ তেমন করিয়া ধারণা করিতে পারে না।

যাঁহারা এমনি করিয়া কার্য্য কারণের ভিতর দিয়া সমস্ত মানিয়া যান, তাঁহারা ত বেশ নিশ্চিন্ত। সকলে বিশ্ব চরাচরে এই কার্য্য আর এই কারণপরম্পরা অনুসন্ধান করে, অথচ এই সংসারে সাধু এবং অসাধু কর্ম্মের ভবিষ্যৎ ফল ত অবশ্যম্ভাবী, এ কথা বিশ্বাস করিতে চাহে না কেন?

সংশয়বাদীদের জীবনেও এমন মুহূর্ত্ত আসে, যাহা তাহার সকল অবিশ্বাসকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয়। যখন তাহার বুকের ধনকে মৃত্যু আসিয়া কাড়িয়া লইয়া বুক খালি করিয়া দিয়া যায়, তখন নাস্তিক সংশয়বাদীর কাছে ত আর কিছু ধরিবার ছুঁইবার থাকে না,—তখন সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত শূন্যময়, কেবল হাহাকার, কেবল নৈরাশ্য। বিধাতা মানব বুকে এত স্নেহ এত প্রেম কেন ঢালিয়া দিলেন; কেন প্রাণে প্রাণে অনন্ত মিলনের পিপাসা? কেন এক হৃদয়-তন্ত্রী অপরের জন্য বাজিয়া উঠে? এই প্রেমতত্ত্বের ভিতরই জীবাত্মা পরমাত্মার অক্ষয় যোগ সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই মানব ইতিহাসে মানব জ্ঞানের উষাকাল হইতেই পরমাত্মার অস্তিত্ব মানুষ নানাভাবে স্বীকার করিয়া আসিতেছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই ভাল মন্দ স্বাতন্ত্র্য অস্তিত্বের ভিতরই মানুষ নরক ও স্বর্গের ছবি কল্পনা করিয়াছে। সকল ধর্ম্ম যুগ যুগান্তর ধরিয়া মঙ্গলকেই বরণীয় জ্ঞান করিয়াছে।

পরমাত্মার অক্ষয় বুকেই জীবাত্মার প্রাণাধার, অথচ অমরত্ব ব্যতীত পরমাত্মার নিত্য-সত্তারই বা কি মূল্য ? উভয় উভয়ের যোগে যোগযুক্ত।

তাই এই জগৎ সংসারে নানা রহস্যের কার্য্যকারণ বুঝিতে না পারিয়া মানুষ পরজীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চায়। এ জগতের ব্যর্থ সংগ্রাম, ধর্ম্মাধর্ম্মের জয় পরাজয়, সমস্ত ভবিষ্যতের কল্যাণ বিচারের আশা করে। একদিন সত্য মঙ্গলের জয় হইবেই হইবে, সে কথাই সকল শাস্ত্র বেদ পুরাণ প্রচার করিয়াছে। ধ্রুব সত্য ভবিষ্যৎ কল্যাণেই পরিস্ফুট।

এই বিশ্বচরাচরও সেই অনন্ত গতির কথা প্রচার করে। এখন যাহা অন্ধকুহেলি আচ্ছন্ন, একদিন তাহাই কত সত্যরূপে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে! এই প্রকৃতির বুকে, এই নশ্বর সংসারেও, যত কিছু বিধি ব্যবস্থা, যত কিছু নিয়ম ও মত যত কিছু ক্রিয়াকলাপ, যত কিছু অবশ্যম্ভাবী অক্ষয় সত্য দর্শন করি, সমস্তই সেই অনন্ত গতির কথাই প্রচার করে, সবই দেহমুক্ত আত্মার অমরত্বের কথা ইঙ্গিতে বলিয়া যায়। বিশ্বসৃষ্টি, আমাদের সমগ্র জীবনখানি, অনন্তে সুপ্রতিষ্ঠিত,— বিশ্ববুকে সকলই চিরস্থায়ী। আমি থাকি আর না থাকি, সে চিরদিনই থাকিবে, তেমনই একদিন যাহার আত্মপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে সে নিশ্চয়ই আবহমানকাল জাগিয়া থাকিবে।

যখনই নিয়মের ভঙ্গ তখনই ধ্বংসের আবির্ভাব। যাহা কিছু সুনিয়মিত সে সকলই কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত। যাহা কিছু ব্যবস্থা সকলই পূর্ব্বাপর ঘটনা-নিয়ন্ত্রিত, যাহা কিছু বিচিত্র রূপ সব নিত্য স্বরূপে জগতের বুকে চির-প্রতিষ্ঠিত। যদিও ঠিক সূক্ষ্মভাবে তাহার কারণপরম্পরা আমরা ধারণা করিতে পারি না, তবু এ কথা ধ্রুব সত্য যে, এ সংসারে এমন কিছু ঘটনার আয়োজন হইবে না, যাহার প্রাণবীজ আজও বিশ্ববুকে সঞ্চার হয় নাই। যাহাকে আকস্মিক ঘটনা মনে করি, তাহাও অজানার সূক্ষ্ম বিধানেই নিয়ন্ত্রিত, ক্ষুদ্র জ্ঞান মানুষের, তাই তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। ঘটনা পরম্পরা কার্য্যকারণ আমরা উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারি, কিন্তু বিশ্বকল্যাণ দাতা একদিন তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলদান করিবেনই করিবেন। তাই বিচিত্র লীলার ভিতরই কখনও রুদ্ররূপে বজ্রশাসন, কখনও আনন্দ উপহার, আনন্দ গৌরব দান।

যদি আমাদের জীবনের অতি সূক্ষ্ম ঘটনাটিকেও বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করি, তবে দেখা যায় সব ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়ারই এক এক অবশ্যম্ভাবী ফলভোগ। যেমন ভাল কর্ম্মের ফল ভাল, মন্দ কর্ম্মেরও মন্দ ফল। যখন সকল কর্ম্মেই একই নিয়ম লক্ষ্য করি; তখন মনে করি আমার

আত্ম-স্বরূপই কি কেবল এই জ্ঞানক্ষেত্রের বহির্ভূত? ধর্ম্ম, যাহা আমার চেতনময় আত্মার প্রাণধর্ম্ম, সেই কি কেবল এ নিয়ম হইতে মুক্তি পাইবে? চির সত্য চির জাগ্রত দেবতার সর্ব্বত্র একই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। দেবের ঘরে আমার জ্যোতিসত্তা, তাই তাহার এই চেতনময়ী লীলা, তাই সে অমৃতের পথে অগ্রসর হইতে চাহে, এ যে দেবতার দান! তাই ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় জ্ঞানাতীত সত্য জ্ঞান, পুণ্যলাভে মঙ্গলে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এ কথা কে বিশ্বাস করিবে যে, যিনি হৃদয়ে আত্মোন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগাইলেন, তিনি কখনও উদ্দেশ্যবিহীন কিছু করিয়াছেন? প্রাণময় সংযম, কঠোর সাধনা, নিত্য আত্মোন্নতি লাভের জন্য প্রাণপাত প্রচেষ্টা, এ সব তবে কি লক্ষ্যহীন? তাই কি উদাসীন ভাবে, দেবভাব লাভ হইল কি না হইল—অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যাইব? এ দেব-সাধনার কি কোন সার্থকতাই নাই?

ওগো মানুষ! এ অমরত্ব সাধনা কি নিরপেক্ষ আয়োজন? আবার যতই কেন আত্মোৎসর্গ করুক্ না মানুষ, পূর্ণতা-লাভের পক্ষে ক্ষুদ্র জীবন ত যথেষ্ট নয়। কত সময় ব্যর্থ নষ্ট হইয়াছে হয়ত কত অজ্ঞাত কারণে জরাজীর্ণ দেহ মানুষের অকালে করালকবলে পতিত হইতেছে। শক্তিহীন দেহমন,

অথচ এ কি চিরজাগ্রত স্বভাব মানুষের কেবলই তাহাকে অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য আকুল করে।

এ লোকে অমরত্বের পূর্ণাঙ্গ উন্নতিসাধন হইয়া উঠে কই? অসংখ্য মানুষ ত চলিয়াছে—বেশ আনন্দেই অধর্ম্মের পথে! চলিয়াছে ত কত মানুষ—অসত্য-দীন-প্রতারণার ভিতরই প্রতি দিনের যাত্রা-পথে!

অগণ্য পশু চলিয়াছে, আত্মার কোন অনুপ্রেরণা নাই; তবু তাহারা দৈহিক ক্ষণিক ভোগের ভিতরই কেমন পরিতৃপ্ত। হায়! হায়! সত্য বটে এই পার্থিব জীবন কোন রকমে ভোগসুখে কাটিয়া যায়, ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই; কিন্তু আত্ম-জগতে কোথায় তাহার প্রতিষ্ঠা? ধর্ম্মজীবন এ লোকের জন্য যদি বল প্রয়োজন নাই, ও লোকের জন্য না হইলে কি চলিবে? অমৃত ধামের জন্য ধর্ম্মধনই ত একমাত্র পাথেয়। এ কথা সত্য, এক দিকে আত্মধর্ম্ম—অন্য দিকে সাংসারিকতা, ঐহিকতা, দৈহিকতা। এ দুইয়ের গতি বিভিন্নমুখী। যাহা হয়ত আত্মার আনন্দ আরাম শান্তি; তাহাই হয়ত দেহজগতে কত দুঃখ ও বেদনাকর।

হয়ত কত জীবনে এমনও হইয়াছে বা হইতে পারে, একটী অসত্য অন্যায় অনুষ্ঠানের ভিতরই সংসারের কত ধন যশ মান হইল! সে কর্ম্মের জন্য হয়ত আত্মা হৃদয়ের

নিভৃতে গোপনে গোপনে লজ্জিত ও শিহরিত হইয়া উঠে। কেন তাহার বিবেকের ঘরে আত্মদৈন্যের জন্য এ লাঞ্ছনা, এ অবমাননা, এ আত্মতিরস্কার? আবার এমনও কত হইয়াছে আবার হয়ত কত হইবে, কত সাধুপ্রাণ কর্ত্তব্য সাধনে কি কঠোর সংগ্রাম করিয়াছেন! দেহের বিন্দু বিন্দু রক্ত দান করিয়াছেন, কত প্রিয়জন কত সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেশের জন্য বিসর্জ্জন করিয়াছেন। কেন অগণ্য মানুষ তাহার ব্যর্থ অযোগ্য জীবনে পরিতৃপ্ত নয়? কি গোপন রহস্য মানবজ্ঞানের অন্তরালে লুক্কায়িত, যে জন্য ঐহিক জীবনের অতীত আরও কিছু বিশেষ সৌন্দর্য্য লাভ করিতে চাহে? তোমরা কি বলিতে চাও, মানুষের সাধনলব্ধ উজ্জ্বল চরিত্র, শোভন সুন্দর হৃদয় বৃথাই বিনাশের পথে অবসান হইল? এ যদি কেউ মনে করেন; তবে তাঁহার কাছে স্বার্থ সাধনই চরম ধর্ম্ম, সাধুতা তাঁহার কাছে বাতুলের কথা; অমররাজ্য তাঁহার কাছে অর্থবিহীন। না গো না, তা কখনই হইবে না; একজন বিধাতা আছেন। অমর ধর্ম্ম: অমরত্বের ভিতরই অবস্থিতি; এই ত দেবধাম। এখানে ন্যায়বান বিধাতা আছেন, এখানেই সত্য ও সততার পুরস্কার।

মানবাত্মা স্বীয় ইচ্ছা সাধনার বলে পশুত্বের উপর জয়-লাভ করে, সকল প্রলোভন রাগ দ্বেষ লাভ প্রতিহিংসা

প্রভৃতি ক্ষুদ্র বাসনা কামনার উর্দ্ধে সংযত মহান্ মুক্ত জীবন লাভ করে। এই সাধননিষ্ঠাই অমরত্ব লাভ। এই অমৃত জীবনই মৃত্যুর পরপারে আরও সুন্দর পরিণত দেবশক্তি দান করে; আর অনন্ত উন্নতির চরম গম্যপথে অগ্রসর হয়। লক্ষপতি হউক্ না কেন মানুষ, তাহাতে কি সার্থকতা? মহত্ত্ব, দেবত্ব পূর্ণতালাভই আত্মার পরম সার্থকতা, ইহারই নাম ত স্বর্গ।

আবার, মানুষ হইয়াও যে দেবশক্তি, দেব অনুভূতি, দেব-সাধনার প্রভাব অগ্রাহ্য করিয়া দৈহিকতা ক্ষুদ্রতা মোহ দ্বন্দ্ব জড়তার পথে অগ্রসর হয়, সে মানব পদবীর নিম্নস্তরে পাশব জীবন প্রাপ্ত হয়। যে মানুষ অনবরত বিবেকের মঙ্গলবাণী অগ্রাহ্য করিয়া অন্ধ প্রবৃত্তির দাস হইয়াই চলিয়াছে, মৃত্যুর পরপারে তাহাকে তেমনই অপরিণত খঞ্জ আতুরের মত শক্তিহীন হইয়াই আধ্যাত্মিক রাজ্যে বাস করিতে হয়। সে নিজেই নিজের দৈন্য আনয়ন করিয়াছে। যেখানে কত মুক্ত আত্মা অব্যক্ত আনন্দ সম্ভোগের ভিতর গৌরবান্বিত, সেখানে ক্ষুদ্র অবনত আত্মার কি শোচনীয় পরিণাম! এই ভীষণ আত্মদৈন্যের নামই ত বিনাশ—এই ত নরক।

• নীতিহীন ইন্দ্রিয়াসক্ত পাশবিক জীবনের গর্ব্ব কোথায়?

শত শত জনের দুঃখ বেদনা ভুলিয়া ব্যর্থ অর্থলোলুপ চিত্তের ক্ষণিক সম্ভোগেই তাহার কি গর্ব্ব! কেমন মানুষকে ফাঁকি দিতে পারি, কেমন অসত্যের পথে কৃতিত্ব লাভ করি, : কত আমার স্বার্থ কলুষিত ধূর্ত্ততা, চাতুরী, কত আবার সে জন্য বাহাদুরি আস্ফালন! আমার আনন্দ-অট্টালিকা গড়িয়া তুলি, কত আমার শক্তি! হায় মন! এই কি হইল আমার চরম সার্থকতা? আত্মার জয় গৌরব ভুলিয়া যাইলে? আত্মার বিশ্বভোলা ঔদার্য্য মহত্ত্ব সাধুতা উপলব্ধি করিতে পারিলে না? তবে আর তোমার কাছে অমৃতধামের কথা কেন? তবে আর কেন অমর জীবনের সত্য পুণ্য পুরস্কারের ব্যাখ্যা?

প্রতিদিনের প্রতিষ্ঠার উপরই আগামী দিবসের সত্তা। তেমনই অনন্ত জীবনের ইতিহাসও দৈনিক জীবনের উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহলোকে সত্যানন্দ লাভই জীবাত্মার পরম সাধনার ধন। এই ত স্বর্গলাভ! কোথায় যাইব? গতি কি হইবে? শুধু শুধু ব্যর্থ জটিল হিসাব নিকাশের কথা কেন? ইন্দ্রিয়লুব্ধ মানুষ দৈহিকতারই প্রাধান্য বুঝে, ইন্দ্রিয়াতীত লোকের ধারণা করিতেও তাই দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় অক্ষম। তবুও কে বিধাতার অফুরন্ত দানের সীমা করিতে পারিয়াছে? কেন আর তবে ভবিষ্যৎ নরক ভোগের কল্পনা?

আমাদের হিতাহিত বুদ্ধি প্রকৃতিগত সত্তা, এ কথা বেশ বুঝিয়াছে যে তাহার প্রাণসত্তা এই দেহজগতেই অবসিত নয়। যেমন প্রকৃতিবুকে সবই নিয়ম সূত্রে নিয়মিত; তেমনই একদিন যে কোন মুহূর্তে রোগ-শয্যায় শায়িত হইয়াই হউক, কি সংগ্রাম সাজেই হউক্, প্রাণপাখী চকিতে মুক্ত হইয়া নব লোকে নব সত্তা লাভ করিবে—তাহারই গুপ্ত কাহিনী এই ঐহিক জীবনখানির উপর ব্যক্ত।

এ জীবন ত বিধাতার অভিশাপ নয়! সাধনার ফলে উন্নত লোকে অগ্রসর হইব, ইহাই ত প্রেমময়ের মঙ্গল রহস্য। আমি কত আকুলভাবে স্বপ্নলোকে কত আশার মালা গাঁথি, তাই নিমেষে সব ম্লানিমায় ঢাকিয়া যায়। তবুও ত সখার অফুরন্ত দান! কত ক্ষুদ্রতা জড়তা অপবিত্রতা নিমেষে হোমানলে দগ্ধ হইয়া যায়! 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', 'সত্যমেব জয়তে' বাণীই বুকের ঘরে রণিত হইয়া উঠে। এ কি রহস্য! এ কি ব্যবস্থা!

হে বিধাতা ন্যায়বান ভগবান! এ কি তোমার অফুরন্ত দান! আমার পাপ পুণ্যের বিচারপতি! একদিন ত ফলাফল ভোগ করিতেই হইবে। তবে কেন আর ভয়? কেন আর বিনাশের পথে ছুটি? এক দিন ত খেলা শেষ হইয়া যাইবে, বিস্মৃতির অতলতলে ডুবিয়া যাইব। তবু ত তোমারই

আমি। তোমার অজানা রহস্যের ভিতরে ত আমারও জন্ম-মৃত্যুর বিচিত্র গান, যতই প্রিয়ধনেরা বুক খালি করিয়া চলিয়া যায়, যতই সকলের উপেক্ষা পাই ; ভালবাসায় বঞ্চিত হই ; কত আশার ঘর ধূলিসাৎ হইয়া যায়, তবুও ত আমার জাগরণ ফুরায় না ! বিশ্ববুকে মহাপ্রাণে জাগিয়া আছি, দেহের খেলা ফুরাইয়া আসে, তবুও যে ওগো ক্ষুদ্রাদপি অধম আমি তবুও ত তোমারই।

মৃত্যুর কালো ছায়ায় আমার ধরণীর আনন্দ আলোক খেলা কোথায় শেষ হয় ; চমকিয়া উঠি। ওগো কোথায় আনন্দ, কোথায় অমৃতধাম, আত্মার আনন্দলোক ! ওগো আনন্দ, আমি যে তোমারই ; তুমি ভালবাস তাই ত আমার গৌরব ! ওগো তুমি যে আমায় চাও গৌরবান্বিত করিতে তোমার নামে ! অথচ দেখ আমি অবহেলায়, পার্থিব সুখ-সম্ভোগের পথে, আমার নিজ হাতে গড়া আত্মদৈন্য অবসাদ জমাইয়া তুলিয়াছি ! দেখ আমার ব্যর্থ ক্ষুদ্র জীবন, তবুও তোমারই বুকে আমার স্থান !

ওগো দয়াময় ! তোমার অনন্ত করুণা, তাই ত আমার এই শুষ্ক বুকেও মন্দাকিনী-ধারা উৎসারিত হইবে। তাই ত আমার বুকেও তোমার পুণ্যপীযূষ ধারা নামিয়া আসিবে, ধন্য হইব আমি।

(ঘ)

পুনর্মিলন

তুমি দিলে তুমি নিলে,
তবে কেন কাঁদি আমি ?
দুখের শয়ন রচি ?
কেন জাগি দিন যামি ?
বেদনার গানে কি গো
ত্যাগের সুরটি বাজে,
ন্যায়দাতা প্রাণসখা,
তোমারি করুণা সাজে ?
আমার আমার যত
সবই ত তোমারই ব'লে
দেছ সখা মিশে যেতে
অনন্ত সিন্ধুর কোলে।
কে বলেছে শেষ হোলো
মরণ মধুর রূপে,
জননীর ব্যথা সব
ভুলে যাব চুপে চুপে ?

অনিমেষ আঁখি জাগে

বেদন পুলক-সাজে

খুলে যায় গান খানি

সে কোন্ মুরলী বাজে ?

স্তব্ধ নিবিড় তান

প্রেমের পুলক দান,

ভ'রে ওঠে কোন্ সুরে

কাহার মধুর গান ?

জানি কি বা কেন বঁধু

ভেঙ্গে দিল রূপখানি

স্বরগ আশীষ ধারে

কি জানি কি দিবে আনি !

কেমনে কাড়িবে সখা

দিলে যা আমার ক'রে ?

রাখ বুকে ক্ষতি নাই,

তোমারি প্রেমের ঘরে।

মোর ধন তোমা কাছে,

এতো নয় কেড়ে নেওয়া—

অনন্ত উদার দান

একেবারে সঁপে দেওয়া !

আঁখি ভাসে জলধারে
আপন আবেগ ভরে,
উৎসারিত প্রেমসিন্ধু
ছুটে যায় কার তরে ?
তবু সে সলিল মাঝে
কি বেদন-তীর্থ হাসে,
অফুরন্ত ভালবাসা
তোমারি স্বরগ বাসে।
মিলন মন্দির গড়ে
প্রেমের মহিমা-বরে,
দেখা হবে, মিলে যাব,
প্রাণে প্রাণে এক ক'রে।
মরণ ছিঁড়েছে ডোর—
ক্ষণিক দেহের বাঁধ—
খুলেছে তাহারি সনে
যত কিছু মোহ ফাঁদ।
অনন্ত অসীম প্রেমে
কোথা হায় শেষ তার !
তোমারি মহিমা মাঝে
পরেছে অমৃত হার।

হৃদয়-রক্ত-রঞ্জিত অসহ্য ব্যথার ক্ষত গভীর হইতে গভীর-তর হউক। ছুটুক্ রক্তধারা নিত্য নূতন করিয়া। গাই আমার অব্যক্ত গোপন ব্যথার কাতর গানখানি নিত্য নূতন করিয়া। ওগো আমার ভালবাসার ধনেরা কোথায় তোমরা? আজ নীরবে বিরহের বেদনাগান বুকের তারে ভাল করিয়া রণিত কর। যখন রূপের গৃহে ছিলে, কত স্নেহ প্রেমের আনন্দ প্রকাশ কত ছন্দে, কত সুরে, কত প্রেম-সোহাগ-চুম্বনে, কত আনন্দ উচ্ছ্বাসে! আজ ত সব শেষ, ভস্মমুষ্টি বুকে করিয়া কি কথা বলি বল ত? এখন কেবল নয়নের জলেই, ঘন দীর্ঘশ্বাসের অব্যক্ত হা হুতাশের ভিতরই, আমার স্নেহ প্রেমের বুক ফাটা নিবেদন। এখন ব্যথার পূজার ভিতরই নিত্য স্মৃতির অর্ঘ্যনিবেদন। আমার নিঃসঙ্গ যাত্রা-পথে কোথায় সে আনন্দময় রূপখানির নিত্য সাহচর্য্যের ভিতর পুলক স্পন্দন? চলিয়াছি শূন্য হাতে, রিক্ত কাতর হৃদয়ে, নিবিড়তম বেদনায় কেবলই ব্যথিত পীড়িত হইয়া। আজ নয়ন জলে নীরবে উদাস পলকে কেবলই ঊর্দ্ধে দৃষ্টি উধাও হইয়া যায়, আর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়া উঠে প্রাণ। অন্তরতম অন্তস্থল হইতে বলিয়া উঠি, ওগো ভগবান্ অন্তর্য্যামী বিধাতা, আমার এ কি করিলে? কেন আমার হৃদয়-গৃহকে প্রেমালোকে আলোকিত করিয়া আবার এমন

ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে? কেন জীবন-প্রভাতেই প্রিয়ধনদের আমার বুক খালি করিয়া ডাকিয়া লইলে? কেন তবে এত ভালবাসা—এত আনন্দলীলা? কেন আমার আনন্দকুঞ্জ নিত্য নূতন মাধুরীতে ভরাইয়া দিলে? তবে কেন আরও নিবিড়তম আনন্দ ঢালিয়া দিলে না? কেন মৃত্যুর কালো ছায়ায় চকিতে সে প্রেমানন্দবিকসিত উজ্জ্বল স্বরূপখানি চিরদিনের মত নীরব করিয়া দিলে?

এ ক্লান্ত যাত্রাপথে কত নূতন বন্ধু আসিলেন! কিন্তু কই আমার শূন্যবুকে তাঁহাদের সে স্থান? আমার যাহা কিছু সবই ব্যর্থ দীনতার দৈন্যে অবসন্ন। আমার প্রার্থনা ব্যর্থ, আমার প্রতীক্ষাও ব্যর্থ, সবই বিফলে অবসান। এখনও হয়ত সকলে ভালবাসেন, কিন্তু হারান ধনের সে শূন্য স্থান ত কেউ পূর্ণ করিতে পারিল না! হৃদয়গৃহে একবার যেখানে যাঁহার আসন পাতা হইয়াছে, সেত শূন্য পড়িয়া রহিল—সে আসনে কে বসিবে? কে সে অভাব মিটাইবে? তাই ত ব্যথার ঘন অবসাদের ভিতর আমার প্রেমপূজার নিত্য নীরব সাধনা। তাইত বুকের ঘরে প্রিয়সখার মরণ বেদিতলে আমার বিরহকাতর প্রেমমুগ্ধ বিশ্বস্ত হৃদয়ের নিত্য নীরব পূজার অর্ঘ্য রচনা। যে দিন আমার জীবন সমাপিত, সেই দিন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হৃদয়ে এ কাতর প্রতীক্ষার

আকুল জাগরণের পালা চলিবে। তারপর জানি না সে কি অব্যক্ত মিলনানন্দের অনুভূতি।

কেন তোমরা আমায় সান্ত্বনার কথা বল? তোমরা কি আমার প্রিয়কে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে? কালে আমার গভীর ব্যথার বহির্মুখীন প্রকাশ হয়ত জগৎ আর দেখিতে পাইবে না, কিন্তু অন্তঃপুরে হৃদয়নিভৃতে দিনরজনী আমার যে আকুল প্রতীক্ষা, সেত চিরদিন জাগ্রত হইয়া রহিল। আমি যতই কেন জগতের কাছে তাহা গোপন রাখিতে চাহি না, আমার কাতর প্রতীক্ষা ত ফুরাইবে না! তবে কেন আর সান্ত্বনার কথা?

বল ঠাকুর! তবে কেন আমার কাতর প্রার্থনা বিফল হইয়া গেল? দয়া কি নাই তোমার? যা করিবার তাই করিলে, আমার বুকের ধনেরা সব স্তব্ধ হইয়া গেলেন, হৃদয়-স্পন্দন থামিয়া গেল, সর্ব্বশক্তিমানের ইচ্ছারই জয় হইল। দেহমুক্ত আত্মা কে জানে কেমন করিয়া নব যাত্রাপথে আনন্দ মহিমালোকে অগ্রসর হইলেন।

তোমরা আমায় কি সান্ত্বনার বাণী শুনাইবে বল ত! তোমরা বল; 'কেন কাঁদ জননী, তোমার সন্তান যে বড় সুখে আছেন,' হয়ত বল 'তোমার সাধ্য নাই তাহাকে সেই মুক্ত দিব্যধামের মহানন্দযাত্রা হইতে ফিরাইয়া আন, যিনি

সকল দুঃখের পর পারে জয়গৌরব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে আর কেন এ বেদনা সম্ভোগের দেশে পুনরাহ্বান ? ওগো এ কি দীন আশ্বাসবাণী ! জানি ত আমার প্রাণের পুতলি সুখে আছেন, আরামে আছেন, তাহাতে আমার রিক্ত কাঙাল প্রাণের ক্ষুধা মেটে কই ? আমি যে কাঙাল, রিক্ত, প্রেমধনে বঞ্চিত লাঞ্ছিত, আমার আশা আনন্দ আরাম কোথায় ? আমার প্রিয়ধনের দিব্যালোকে আনন্দ সমাধির ভিতর সকল কামনার অবসান হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমার ক্ষতি-পীড়িত রিক্ত জীবনের শান্তি কোথায় ? কোথায় আমার প্রাণের আনন্দ-প্রতিমা ?

হায়, অভাগা মানব, কোথায় তোমার জন্য দয়া ? ওগো দয়াময় ! কোথায় দয়া ? দেখ নিরাশ কাতর হৃদয়ের কত দীন অভিযোগ ! বল দয়াময়, রোগশয্যায় ভীষণ ব্যাধির অব্যক্ত যাতনার ভিতরও কি তুমি আছ ? তোমার প্রেমাবেষ্টনে তখনও কি নিবিড় করিয়া ধরিয়া আছ ? ওগো তুমি যে প্রেমের ঠাকুর, যখন মানুষ আর সহ্য করিতে পারে না, তখনই তাহাকে সংজ্ঞাহীন করিয়া দাও, তাহার দৈহিক বেদনার আর অনুভূতি থাকে না। অথচ আমি ত আমার প্রিয়ের সংজ্ঞাহীন দেহের সংগ্রাম দেখিতে পারি না। ভয়ে ভীত চঞ্চল হইয়া উঠি। দৈহিক মানসিক বেদনায়

অধীর হইয়া যাই। ওগো পিতা! দেখ তোমার দুর্ব্বল সন্তানের অধীর আকুলতা। কেন তোমার এ দেওয়া, আবার কেন তুলিয়া লওয়া, তুমিই জান।

কেন লইলে বল ত ভগবান্! আমি কি অপরাধ করিয়াছি? আমি ভালবাসার মোহে মুগ্ধ, তাই কি এ কঠোর বিধান? আমি কি নিবিড় শান্ত যোগের অযোগ্য, তাই এ অমোঘ বজ্রপাত! সত্যই ঠাকুর, স্বীকার করি—অন্ধ আমি, মুগ্ধ আমি, ভালবাসার ধনদের বুকে জড়াইয়া ধরিতে চাই, আঁখির পলকে পলকে রাখিতে চাই;—সমস্ত হৃদয়মন ঢালিয়া দিয়াও ক্ষুধা মেটে না, সহিতে পারি না ক্ষণিক ব্যবধান, মনে করি যে রত্নের সন্ধান পাইলাম, তাহা বুঝি আমার চির দিনের।

অজানা ভাগ্য বিধাতা! এ কথাত জানাইয়াছ—এ পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নহে, জানি ত একজন না একজনকে অগ্রগামী হইতেই হইবে। তাই যখন প্রথম প্রিয় সখার হাতখানা চাপিয়া ধরি, নিত্য সঙ্গী মনে করি, সেই মুহূর্ত্তেই ত একদিন বিচ্ছেদ সম্ভাবনা, এই ভবিষ্যদ্বাণী কাণে কাণে বলা হইয়া যায়! যখন অপত্য স্নেহে গদগদ হইয়া প্রাণ পুতলির আনন্দস্বরূপ মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সে বদন সুন্দর স্নেহচুম্বনে সোহাগে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলি, তখনই ত গোপনে গোপনে

জানাইয়া দিয়া যাও যে, একদিন হয়ত এ ধন হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। তাই সেই মুহূর্ত্ত হইতে প্রস্তুত হওয়ার কথা —একদিন বিশ্বরাজের, আনন্দময়ের, আনন্দবেদীতলে তাঁহার আনন্দদান তাঁহাকেই নিবেদন করিতে হইবে।

হায় রে হায়! এ কি মোহ! ভুলিয়া যাই সত্য স্বরূপ, ভুলিয়া যাই বিচ্ছেদ বেদনার কথা ক্ষণিক আনন্দসম্ভোগের ভিতর, তাইত বিনামেঘে বজ্রাঘাতের আয়োজন হয়, তাইত চম্‌কিয়া উঠি, তাইত গভীর মর্ম্মন্তুদ বেদনায় ছট্ ফট্ করি।

ওগো পরম পিতা! তোমার জগতে অফুরন্ত দান, অফুরন্ত সম্ভোগের বস্তু, অথচ কোন কিছুতেই একবারে মুগ্ধ হইয়া, আসক্ত হইয়া থাকিতে দিবে না। এখানে ত চিরদিন থাকিব না, তাইত নিত্যানন্দসম্ভোগের এ জগতে চিরদিন রাখ নাই। এ কি তোমার বিচিত্র লীলা বিচিত্র বিধান। এ জীবন যে অনন্তজীবনেরই মঙ্গলপ্রভাত। আত্মলোকে পুণ্য পবিত্র ধামের প্রথম ভিত্তি স্থাপন এই ক্ষণিক চেতন লীলায়। তাই সর্ব্বদাই শিক্ষা দান করিতেছ ঐহিক ক্ষণিক সম্ভোগে নিত্য সুখ নাই, সত্য জীবন লাভেই অনন্ত পথের নিত্য পাথেয়। ওগো ঠাকুর! এ সংসারে যা কিছু সবই ত তোমার—আমার কোন্‌টা বল? হায় রে মোহমুগ্ধ মন! জীবনের চরম গতি ভুলিয়া এ কি ব্যথার মোহঘন জঞ্জাল!

জনক জননীর মৃত্যু মলিন হিম কঠোর রূপখানির ও কি স্বরূপ মাহাত্ম্য! যে জনক জননীর স্নেহ রস ধারায় এ জীবন নিত্য নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে—যাঁহাদের বরাভয় আশ্রয় সন্তানকে সকল দুঃখ ঝঞ্ঝার ভিতরও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছে—যাঁহাদের স্নেহ কাতর প্রাণ সন্তানের কল্যাণ কামনা করিয়াছে আজ প্রাণ চাহে সেই জনক জননীর চরণ দুইখানি বুকে জড়াইয়া নয়নের জলে হৃদয়ের ভক্তি-ধারায় ধুইয়া দিতে।

মায়ের চক্ষে প্রাণপুতলির মহানিদ্রাবেশেও সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে। কত দিন যামিনী দেহ মন পাত করিয়া ও কি মায়ের আশার মালা গাঁথা! মৃত্যুমলিন বদনকমলেও সন্তানের কি দিব্য জ্যোতিঃ। কি শান্ত বিমল পুণ্যবিভা! বুকের স্তব্ধ স্পন্দনের ভিতরেও ও কি নিবিড় স্নেহের পরিচয়! চিরবিদায়ের গান গাহিয়া যায়, আমার বাছা যে একেবারে নীরব হইয়া গেল, তবু ওকি স্বরূপ! এ কি বিরহ! উঃ শোকাতুরা জননী হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনার সান্ত্বনা কোথায়? কেবলই চিরনীরবতা অনন্ত সমাধি!

হায়! হায়! অভাগিনী পতিবিরহবিধুরা সতীর আজ কি আলুলায়িত কেশ স্খলিত বেশ! পতির শবদেহ বুকে করিয়া মরি কি বিচিত্র স্বরূপ! অবলুণ্ঠিতা শোকাবনতা স্তব্ধ

নারী মহিমা! কাঁদ কাঁদ অভাগিনী আজ ঢাল ভাল করিয়া অশ্রুজল সে—পুণ্য সলিল ধারায় প্রেমাস্পদের চরণ যুগল ধৌত করিয়া দাও। আজ অব্যক্ত বুকফাটা মর্ম্ম বেদনা কে বুঝিবে? ওগো কেন এ বিরহ গান, কেন এ অভাগিনীর নিঃসঙ্গ ব্যর্থ জীবন যাত্রা?

কত আর বলি বল? ভাই ভগিনীর মৃত্যুমলিন রূপখানিরই বা কি গম্ভীর সত্তা! এ কি পরীক্ষা। কেন হৃদয় নিভৃতে এ স্নেহ প্রেমের উৎস ধারা? কেন হৃদয়ের কোমল ভাবরাশির এ বিচিত্র স্পন্দন রহস্য? কেন এ ব্যাধির নির্ম্মম পীড়ন? কেন এ বিরহ তাপ, অসহ্য বেদন জ্বালা? আমার সাধ্য কি এ বিচিত্র রহস্য ভেদ করি! যতই ভাবিতে যাই, ততই ক্ষুদ্র বুদ্ধি পরাস্ত হয়, স্তব্ধ হয়।

ওগো পুণ্যময় মঙ্গল দেবতা! আমি শোকাকুল হৃদয়ে কত অভিযোগ করি, কিন্তু আমি কি জানি কিসে পরম কল্যাণ? এই চঞ্চল ক্ষণভঙ্গুর সংসারের কেন এ বিচিত্র অভিজ্ঞতা দান, তুমি জান ঠাকুর। তবে শান্ত হই, তবে তোমার সত্য বাণী শুনিয়া চলিবার শক্তি দাও। যদি দুঃখ বেদনা আমায় নবতর অভিজ্ঞতা দান করে, নবতর সত্য শুদ্ধ জ্ঞান শিক্ষা দেয়, তবে দাও ঠাকুর, নিত্য নব চেতনা নিত্য নব বেদনার দানে। মানিয়া চলিব তোমার আদেশ, শিবতত্ত্বে

সমস্ত উৎসর্গ করি। কেন ব্যর্থ অভিযোগ? পরম কল্যাণময় তাঁহার ইচ্ছারই জয় হউক। আমার সসীম দৃষ্টি অসীমের মহিমাতত্ত্ব কি বুঝিবে, কত ভুল, কত ভ্রান্তি আমার!

বিধাতার মহিয়সী ইচ্ছার ভিতরই সকলের মহাযাত্রা। যিনি অগ্রগামী তিনি কেন গেলেন আমি কি জানি? জানি কি? কি মঙ্গল, কি লক্ষ্যসাধনা প্রতি জীবনের প্রথম শুভ মুহূর্ত্তেই তার সূচনা চলিয়াছে আর তাই কালে বিকসিত হইয়া উঠিতেছে। আবার মরণ সখার আহ্বানে চলিয়াছেন সকলে, সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের সকল বিজ্ঞান পরাস্ত। জীবন আলোক সহসা নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। সকল চিকিৎসা চেষ্টা যত্ন বিফল হয়, বিধাতার ইচ্ছারই জয়। ক্ষুদ্র মানুষ সে ভূমা মহানের অগম্য অপার লীলা কেমন করিয়া বুঝিবে, তাঁহার ইচ্ছাতেই প্রিয়তমের মহাপ্রয়াণ। তাঁহার দেওয়া নয়ন জলে আমার এ বেদনার গান।

ওগো প্রেমময়! একবার প্রেমবন্ধনে হৃদয়ের যে অনন্ত যোগ বিধান করিয়াছ তাহা আর কেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন হইবে? কে বলে আমার প্রিয় হারাইয়া গিয়াছেন? যাহা বিধাতার দান তাহা কেমন করিয়া হারাইবে? ইহকাল পরকাল সবই একই বিশ্বপাতার আনন্দ বুকে। জানি সকলে

আছে, আমার প্রেমমুগ্ধ হৃদয় দেখ কত আকুল, প্রেম কেমন করিয়া ফুরাইবে ওগো প্রেমময় ?

নব আনন্দলোকে তোমার শুদ্ধ পূর্ণ মঙ্গলসত্তা লাভ করিব। আমার যখন নয়নজলে বুক ভাসে, না জানি দিব্যধামবাসী তোমরা তখন কি শাশ্বত আনন্দ সম্ভোগে নিমগ্ন। যখন আমি কম্পিতকণ্ঠে তোমাদের নাম করি, না জানি তখন তোমরা কি আনন্দ সম্ভোগে নিমগ্ন! তখন তোমরা কি আনন্দে আমার নব যাত্রার কথা মনে কর! ধন্য মহিমাময়ী আত্মা। আমার দেহের ঘরে সে বিদেহীর আনন্দ উপলব্ধি কেমন করিয়া ধারণা করি? হয়ত তুমি আমার যাত্রাপথে এখনও দিব্যপথের সহায় ও সাথী হইয়া আমাকে কল্যাণের পথেই আহ্বান করিতেছ।

না গো না, বিচ্ছেদ নাই, বিশ্বভুবন একেরই লীলা। এ ধরণীর বুকে তাহারই আনন্দ ছায়া, অনন্তের পরিচয়। আমি এ লোকে আনন্দ সম্ভোগ করি, ও লোকেও অনন্ত আনন্দ উপলব্ধি করিব। আমার সকলেই একের বুকে। আমি কি জানি কেন এখনও আমার দেহের লীলা? জানি কি কি জন্য আছি এ সংসারে? জানেন ইচ্ছাময়, তাঁহার কি ইচ্ছা পূর্ণ হইবে আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে। একদিন ত যাবই, আজই হউক কি এক বৎসর পরে, কবে কে জানে? একদিন সে

নবপ্রভাত উদয় হইবেই হইবে। প্রভাতালোকে ব্যর্থ স্বপ্ন কোথায় মিলাইয়া যায়! সেই নব প্রভাতে কেমন করিয়া জাগিয়া উঠিব কে জানে? আবার পুনর্ম্মিলন, আবার প্রেম সম্মিলন, সেইজন্য এতদিন ক্রন্দন করিয়াছিলাম? তবে প্রাণে প্রাণে নিত্য যোগের অব্যক্ত আনন্দে যোগযুক্ত হইয়া থাকি। ধন্য যোগানন্দ! ওগো যোগসুন্দর নত হই, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণত হই। পুনর্মিলন! এ কি সম্ভব? কেমন করিয়া তাহা আশা করি; কোথা হইতে তাহা সম্ভব হইবে?

ওগো বিধাতা, তুমি আমার আত্মাকে শুদ্ধলোকে জন্মদান করিয়াছ, কত আশার কথা শুনাইয়াছ। কত ভক্তজীবনে সে মহীয়সী ইচ্ছার জয়লীলা সংসারে। যে জন্য কাঁদিয়া মরি তা ত ক্ষণিক, একদিন সব কিছুর অবসান হইবে। এমন কি, ধূলিময় সংসারেও কেবলই মিলনের গান। অণু পরমাণু সবই মিলনের পথে ছুটিয়াছে। চেতন অচেতন সব কিছুরই গতি একই মিলনমঙ্গলযজ্ঞে। সবই আকর্ষণের শক্তিতে আকৃষ্ট। এই মিলনমন্ত্রের ভিতরেই জগতের পরম সৌন্দর্য্য, পরম শৃঙ্খলা।

আলোকে আলোকে মিলন, ধূলিতে ধূলিতেই মিলন। জলবিন্দু নদনদী সমুদ্রগর্ভ হইতে বাষ্পরূপে উধাও হয়, আবার জলবিন্দুতেই পরিণত হয়। এক স্বভাববিশিষ্ট যত

কিছু সব মিলিত ভাবে একেরই মাহাত্ম্য প্রচার করে। মঙ্গলবিধাতা পরম প্রেমময় মানববুকে যে প্রেমধারা উৎসারিত করিয়াছেন, প্রেমধর্ম্মের, শুদ্ধ পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপের ভিতরই তাহা সার্থকতা লাভ করিবে।

যে রূপখানির ভিতর আমার প্রিয়ধনদের পরিচয় হইয়াছিল, তাহা ধূলিতে মিশিয়াছে, কিন্তু সে সত্য স্বরূপ প্রেমস্বরূপ প্রেমের উৎসখনি আত্মপুরে জন্মলাভ করিয়াছে, সে ত অমর অক্ষয়। এই নশ্বর দেহখানির প্রতি আকর্ষণ হবেই ত। এ যে আমার প্রিয়ধনেদের আবাসগৃহ, তাইত এত ভালবাসি। একদিন এ আবরণ উন্মোচন হইয়া যাইবে। কে জানে সে বিদেহী আত্মার সহিত কেমন করিয়া পরিচয় লাভ হইবে? কত সন্দেহ সংশয় কুহেলী জমিয়া উঠে। কেন এ বৃথা কল্পনা জল্পনা? দেবশক্তি, দেবমহিমাতত্ত্ব আমরা কি বুঝি? অণু পরমাণুর সমষ্টির ভিতরই বা আমার চেতনময়ী আত্মার পরিচয় কি করিয়া পাই তাহা কি আমরা জানি।

এ কি ঐন্দ্রজালিক শক্তি কেমন করিয়া নব বসন্তাগমে উদ্ভিদ জগতে ফলে ফুলে নব ছন্দলীলা জাগিয়া উঠে, কেমন করিয়া বিচিত্র বিভিন্ন অস্তিত্বের স্বরূপ লাভ করে? কেমন করিয়া পরাগপুঞ্জ বিচিত্র লক্ষ্য সাধনে অসংখ্য ফুলদলে

ছড়াইয়া পড়ে, নব প্রাণের সূচনা করে, নিত্য নূতন সৌন্দর্য্যের ভিতর বনে উপবনে কুঞ্জ কাননে কত মনোহর মঙ্গল শোভা বিকসিত হইয়া উঠে। কেমন করিয়া হয়, কি করিয়া হয় কে বলিতে পারে সেই বিচিত্র রহস্য ? এ জগতের অব্যক্ত রহস্য লীলার ভিতরই অনন্তের পরিচয় দান। যে অনন্ত শক্তিতে ক্ষুদ্র রেণুকণাটী বিচিত্র শক্তি লাভে চেতনা শক্তির ভিতর নব নব বৃক্ষের জন্ম ইতিহাস বহন করে, সেই সর্ব্বশক্তিমানের মঙ্গলরহস্যের ভিতরই অনন্ত জীবন অপেক্ষা করে। তাইত মৃত্যুর পরপারে অমৃতধাম, মিলন নিকেতন। তাই ওগো প্রিয়ধন! অনন্তে জাগরণ, এ লোকে ও লোকে অনন্তযোগ। যেখানেই থাক সুখে থাক। তোমাদের অবর্ত্তমানে আমার দুঃখ বেদনা চির জাগ্রত হইয়া থাকুক্। যেদিন মঙ্গল আবাহনে আহ্বান করিবে সেই দিনই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার জয় হইবে। আমি জানি সে ইচ্ছা আমাকে কল্যাণের পথেই আহ্বান করিবে, তাই কঠোর নীরস কর্ত্তব্য সাধনার ভিতরই চলিয়াছি আমার গান গাহিয়া। পাপ, অপরাধ দেখ আমায় দূরে লইয়া যায়, আর তোমাদের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করে।

তোমাদের মৃত্যু বেদনায় আমি নিষ্পেষিত পীড়িত, কিন্তু আত্মায় আনন্দ অনুভূতির তুলনা নাই। তোমরা আত্মযোগে

যুক্ত হইয়া আছ? তোমাদের ভালবাসা এ ধরণীকেই দেবলোকে পরিণত করিয়াছে।

ওগো দিব্য পিতা! তুমি আমাদের সকলের পিতা। একদিন প্রিয়বিচ্ছেদে আকুল হইয়া নয়নের জলে অভিযোগ করিয়াছিলাম, 'ওগো আমার ভাগ্যবিধাতা! একি করিলে? এখন দেহান্তে তেম্‌নি করিয়া হাত তুলিয়া ধন্যবাদ দিই। ভালই করিয়াছ সখা, সকলকে লইয়াছ তাই আনন্দে চলিয়াছি ভবপারাবারে। প্রিয়বিরহ আমার দেহমনকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, তাইত সততা সাধুতার জন্মদান করিয়াছ এ নীরস তপ্তবুকে। তাইত তোমার নৈকট্য সম্ভোগ আমার জীবনে সম্ভব হইয়াছে। তাইত পার্থিব সম্ভোগে অতৃপ্ত হইয়া তোমার নিত্য সঙ্গ সম্ভোগে ছুটিয়াছি, নিত্য বন্ধন যোগ স্থাপিত হইয়াছে। আমি আর শুধু পার্থিব ধূলিকণা নহে, আমি নিত্য দিব্য লোকবাসীর সহিত অক্ষয় যোগে যুক্ত। ধন্য তোমার দেওয়া লওয়া।

এক সময় মৃত্যুবিভীষিকায় আমার প্রাণ চমকিয়া উঠিত। কেমন করিয়া মরণ সখার স্বরূপখানি আমি ভালবাসিতে শিখিলাম? তোমারই মঙ্গল বিধানে সব মধুময় হইয়া গেল, সমস্ত পুণ্য আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিল।

• আজ সমস্ত আশার আলোকে আলোকিত। আজ ঐ

মৃত্যুর পরপারে আমার নিত্য গৃহপ্রদীপখানি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আজ আমার জীবনে সত্য লক্ষ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ পৃথিবীর মৃত্যু অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ম্ময় শাশ্বত লোক উজ্জ্বল হইয়া আসিতেছে। ধন্য তুমি প্রেমময় তোমার প্রেমে আমার সকল সন্দেহ কুহেলী উধাও হইয়া যা'ক্। তোমার আদেশ মানিয়া চলি। তোমারই প্রেম এ লোকে ও লোকে দ্যুলোকে ভূলোকে। তুমিই আত্মার আনন্দ ধাম!

(৬)

মৃত্যুমধুর বাসর শয়ানে
দেখ কি গো মরি হিমের সাজ,
বিদায় কঠোর গানের মাঝারে
হেসে আসে মোর হৃদয়-রাজ।
ভাঙন গানের কাঁদন পালাতে
আশীষ কণিকা মহিমা ধার,
অসীম জীবন আনন্দালোকে
ছুটেছে মরণসাগর পার।

উঠিল বাজিয়া শতেক রণনী,

কত প্রিয় মধু কণ্ঠ বাণী,

দিবস শেষেতে মিলন গানেতে

ধন্য হে সখা, ধন্য মানি।

অবল অবোধ সসীম খেলাতে

খেলিয়াছি যত ভুলের খেলা,

অসীম বুকেতে এবার সুখেতে

পাতিব নবীন মধুর মেলা।

সত্য শুদ্ধ পুণ্য গন্ধে—

ফুটিবে বুকেতে দিব্য লেখা,

আশীষ মধুর ত্রিদিব আলোকে

উঠিবে জ্বলিয়া জ্যোতির রেখা।

প্রেমের কলিকা ধরার বুকেতে

জনম যত গো লভেছে হেথা,

দেবতার বরে আশীষ মাঝারে

স্বরগ সুবাসে ফুটিবে সেথা।

ওরে আমার আত্মারাম! জীবনসংগ্রামের মাঝখানেই মুক্তির আনন্দে জাগ্রত হও। দুঃখের ব্যর্থ বোঝা ফেলিয়া দিয়া নিরাময় শান্তি সুখের আশায় ছুটিয়া চল। শত আমোদ প্রমোদ-প্রবাহের ভিতরই জীবনের চরম গম্য-স্থান খুঁজিয়া লও।

অনন্ত সাগরে এই নশ্বর জীবন যেন জলবিন্দুকণা। যা কিছু ক্ষণিক স্বপ্ন দুদিনে ফুরাইয়া যাইবে, নিত্য জাগরণে একদিন হাসিয়া উঠিবে। অমৃতধামের অক্ষয় দরবারে এই দীন আঁখি না জানি কি শাশ্বত শোভায় মুগ্ধ হইয়া যাইবে। কোথায় তখন সংসারের সুখ ঐশ্বর্য্যের মর্য্যাদা? দীন আলোকে আমার সাধের ধূলিময় গৃহ আলোকিত করিতে চাহি, অথচ অনন্ত আলোকে বিশ্বচরাচরে কি জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ উদ্ভাসিত তাহা বুঝি না।

অনন্তপথে চলিয়াছি সকলে। কি সুখী, কি দুঃখী, কি ধনী, কি নির্ধন, কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞান, কি ক্লান্ত শীর্ণ জীর্ণ বৃদ্ধ, কি আনন্দে উৎফুল্ল সুকুমার শিশু সকলেই অনন্ত পথের পথিক। তাই ত প্রতিজনের প্রাণযোগে আমার প্রাণেরও অনন্ত মুক্তি, শুদ্ধ নির্ম্মল প্রকাশ। ঐহিক সুখের সে নির্ম্মল স্বরূপ কই? সকল সুখের পশ্চাতেই দুঃখ, তাই ক্ষণে ক্ষণেই বেদনা, সংসারপথ কণ্টকময়।

তাই ত ধর্ম্মধন পরম বরণীয়, অনন্ত সুখ শান্তির উৎস। অমৃতধামের কথা শুনিয়া পাপী চমকিয়া উঠে, নাস্তিক সন্দেহদোলায় দুলিতে থাকে, অথচ প্রেমময় দেবতার ন্যায় বিচার শাসনের ভিতরই অফুরন্ত স্নেহ প্রেম ভক্ত জীবনে কি আনন্দ আরাম ঢালিয়া দেয়!

যখন আমার দুর্দ্দিনে ঘন অন্ধকারে হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন, তখনও নয়নের জলেই মঙ্গলের আশা করিয়া থাকি। যখন আমার জীবনের প্রাণময় আদর্শ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, তখনও ঐ আশাতেই চলিয়াছি। যখন মৃত্যু আসিয়া হৃদয় শূন্য করিয়া সব লইয়া যায়, তখনও ঐ ভরসা। জানি একদিন আমারও দুঃখের অবসান হইবে, একদিন আমিও ভবপারাবারে চলিয়া যাইব।

হে অনন্ত! আমার আশা ও আনন্দ! কত ভক্তের জীবনছন্দে তোমারই আনন্দ লীলা! আমার সকল দুঃখের ভিতর তুমি অমৃতের সন্ধান দিবে। তবে কেন ক্ষতি পীড়িত চিত্ত শঙ্কিত চকিত? সকল ঝঞ্ঝার ভিতর ফুলদল হাসিয়া উঠিবে—আমার আশার মালিকা ছিন্ন করিয়া সে জীবন পুষ্প তোমাতেই বিকসিত, তবে কেন আর তোমায় ভয় করি? যাহা কিছু হারাইয়াছে সবই তোমাতে সুপ্রতিষ্ঠিত। কি আশা আনন্দই ফুটিয়া উঠে; যখন মনে হয় কোনও কিছু ব্যর্থ নয়, সবই তোমাতে আবার ফিরিয়া পাইব। ওগো আমার পিতা মাতা! ওগো আমার জীবনের বন্ধু সুহৃৎ! তোমাদের সঙ্গে আমার রক্তের যোগ, স্নেহের বন্ধন, আমার অশ্রুজল, নীরব প্রার্থনা একদিন অমৃতের পথেই আহ্বান করিবে। না জানি সে কি আনন্দ, কি মিলন!

আমার হৃদয় স্বর্গের বিমল আনন্দে উচ্ছ্বসিত, আমার হৃদয় আজ ধর্ম্মের বিচিত্র আলোকে, প্রার্থনার বিমল প্রভাবে কোথায় উধাও হইয়া যায়। আনন্দাশ্রু দর দর ধারে প্রবাহিত, আমার জন্য কি ত্রিদিবের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল! এই অমৃত-ধামে অমৃতময়ের আনন্দ ক্রোড়ে যে আমার সকল প্রিয় অমর হইয়া আছেন। আমি এখন দৈহিক পার্থিব কারাগারে বদ্ধ জীব, আর তোমরা মুক্ত উন্নত-ধামবাসী। আমি এখনও দুর্ব্বল অপূর্ণ। আমার কাছে তাই এই অন্ধকার, এই আলো। তোমরা নিত্য দিব্য আলোকে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল। ওগো তোমরা কি আমার হৃদয়ের এ আকুলতা, এ প্রতীক্ষার করুণ অধীরতা উপলব্ধি করিতে পার? আমি তোমাদের আমার দৈনিক প্রার্থনার ভিতর আহ্বান করি, প্রেমের অর্ঘ্য নিবেদন করি। ওগো প্রেমময়! তোমারই কৃপাতে আমরা আবার পুনর্মিলন সম্ভোগ করিব। অমৃতধাম! এ কি স্বপ্ন? এ কি মায়া? ভক্তের জীবন যে অমৃতের বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন, মানবের সংসার দোলায় নশ্বর লীলাখেলায় ভক্তজীবন মৃত্যুর তিমির অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ম্ময় ধামের কথাই শিখাইয়া দিয়া যাইতেছেন তাই ত মৃত্যুর আহ্বানে আনন্দে চলিয়াছে সব যাত্রী পিতার বুকে দুঃখ কোথায়? সবই চলিয়াছে জীবন হইতে নব-জীবনে।

ওগো সংশয়বাদী, তোমরা কি বলিতেছ কেমন করিয়া বিদেহীদের সঙ্গে যোগ হইবে, দেখা হইবে? আত্মারাম আনন্দে বাস করেন কোথায়? যে রূপখানির মধ্য দিয়া পরস্পরের পরিচয় সে ত ধূলিসাৎ হইয়া যায়, তবে আর কেমন করিয়া পরস্পরকে চিনিতে পারিবে? এ কথা সত্য, এই ধূলিমুষ্টি ধূলিতেই পরিণত হয়। আবার এও সত্য, এই যে ভালবাসার আদান প্রদান, এ ত ধূলিতেই আবদ্ধ নয়—কেন একটী প্রাণ অপর প্রাণে যুক্ত হইয়া থাকে? কই সেখানে রূপের কথা? সত্যই তোমরা এ বিচিত্র অক্ষয় অস্তিত্ব বুঝিতে পার না, তাই এ সংশয় কুহেলী-জাল রচনা কর। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতার অখণ্ড রহস্য কে তুমি সসীম জ্ঞান লইয়া ধারণা করিতে পারিবে? মৃত্যুর পরপারে দেহমুক্ত আত্মার স্বরূপ মানুষ জানিতে পারে না, তাই ত তাহার সংশয়। হায়! হায়! যদি সেই শক্তিই থাকিবে, যদি মৃত্যুর পরপারের সে জটিল তত্ত্ব ভেদ করিবার অধিকারই থাকিবে, তবেত আমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া যাই! কিন্তু আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের সে শক্তি নাই। অসীম জ্ঞানময় ইচ্ছা রহস্যের ভিতরই আমার সসীম জ্ঞান। আমার জ্ঞানের বিচিত্র শক্তির ভিতরই অনন্ত আশা। এই দিব্য জ্ঞানই দেবতার বাণী। তাইত মানব পশুত্বের উপরে জয়লাভ করে।

যখনই এই জ্ঞান প্রভাবে বুঝিতে পারি কিসের জন্য কি, কিসের জন্য অনন্ত যোগ, তখনই দেখি, পূর্ণ সত্তার ভিতর সব বিরাজিত।

সংশয়বাদী বলিয়া যান তাঁর সংশয়কুহেলীর ভিতর মৃত্যুই অনন্ত বিচ্ছেদ আনয়ন করে, অথচ মৃত্যুর পরপারে আমার অস্তিত্ব আর বিদেহীজনদের সঙ্গে পুনর্মিলন যে সম্ভব নয়, একথা যুক্তি তর্ক দিয়া তেমন সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই।

তাঁর সংশয়ের বাণী সেও ত কল্পনা-প্রসূত। যা জড় প্রকৃতি তাহাও ত দেখি এক অজানা নিয়ম সূত্রের ভিতরই, পরস্পর এক অব্যক্ত শক্তির ভিতরই নিয়ন্ত্রিত। যখন দেখি, ধূলিকণা ধূলিতে গিয়া মিশে, তখন একথা বা কেমন করিয়া ভাবি—যে চেতনময়ী আমি এক চেতনময়ী সত্তার ভিতর গিয়া মিলিব না? এ কোন্ বিচিত্র রহস্য লীলা? কাহার অঙ্গুলি ইঙ্গিতে কুসুমপরাগ সুন্দর, সে কোন্ লক্ষ্য সাধনে ফুলবালার বুকের ভিতর হইতে মুক্ত হইয়া ছুটিয়া যায়, আর কেমন করিয়া সে শত শত কুসুমরাশির ভিতর আপন স্বভাব প্রিয়ার সন্ধান পাইয়া মিলিয়া যায় বীজাণুতে বীজাণুতে, আর নব প্রাণের অঙ্কুর মহিমা নব রসে ও ছন্দে ভরিয়া উঠে। ওগো জড়তত্ত্ববাদী—সংশয়ী মানুষ, এই বিচিত্র অজ্ঞেয় রহস্য তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে পার কি? তাইত বলিতে পারি,

আমার অনন্ত প্রেমপিপাসু হৃদয় চেতন-আলোকে আত্মজ্ঞান মহিমায় একদিন প্রিয়ধনদের সন্ধান খুঁজিয়া লইবেই লইবে।

মানুষ! তুমি কি মানবের বুকে এ অফুরন্ত ভালবাসার উৎস উৎসারিত করিয়াছ? কে এ অনন্ত প্রেমধর্ম্মনিয়ম আমার অদৃষ্টে নিয়মিত করিয়াছে? মানুষ কি স্বতই প্রেমের বিচিত্র স্বরূপ অনন্ত প্রেমের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করে? ওগো এ যে প্রেমময় অনন্ত প্রেমের খনি প্রাণে প্রাণে এক করিয়া অনন্তমিলনের ক্ষুধা জাগাইয়া দেন। কে এই ক্ষণিক কালসূত্রে আমায় অনন্ত কোমল প্রেমবন্ধনডোরে বাঁধিয়া দিল? প্রেমের ঠাকুর যিনি তিনি আবার কেমন করিয়া এ বন্ধন ছিন্ন করিবেন? তিনি ত নিষ্ঠুর কঠোর নহেন। তিনি যে পবিত্র সুন্দর। আমার হৃদয়ের পবিত্র প্রেমকুসুমকে কেমন করিয়া মৃত্যুকালিমায় ছাইয়া দিবেন? যিনি ভালবাসিতে বলিয়াছেন তিনি কেমন করিয়া আমার এ নিরাশকাতর হৃদয়ের শোচনীয় পরিণাম দেখিবেন?

এ নীরস কঠোর বাণী, এ ব্যর্থ কথা আর পারি না শুনিতে। আমি পরিপূর্ণ শিবসুন্দরে বিশ্বাস করি, এই আশাতে শান্ত হই, তিনি কল্যাণ মহিমা দান করিবেনই করিবেন। যা পরিপূর্ণ শিব তাই যে আনন্দময় অমৃতময়। প্রেমে প্রেমে আত্মমিলন, এ-যে অমৃতময় আনন্দধাম!

৫

অমর কথা

বিধাতা আছেন তাই সকলে আছি, তাই আমার মিলন-গীতি। যিনি স্রষ্টাপাতা বিধাতা তিনিই প্রেমময়। অনন্ত প্রেমের ক্ষুধা যে বুকে বুকে জাগিয়া রহিল, এ কে মিটাইবে?

যদি আমার চিরজাগ্রত জ্ঞান মহিমাই নিদ্রিত হন, তবে আর অমরত্বের কথা কেন? আমার আত্মপুরে পবিত্র প্রেমের স্নিগ্ধ সুবাস আর ধর্ম্মের আনন্দ আলোকেই ত সমস্ত উজ্জ্বল করে; নইলে আমার অস্তিত্ব ধর্ম্মের স্বরূপ মহিমা কোথায়?

আমার অস্তিত্ব রহিল, অথচ আমার অতীত বর্ত্তমান সব জ্ঞান ফুরাইয়া যাইল, তবে আমার জাগরণ কোথায়? আমি অনন্তের বুকে জন্মলাভ করিব, অথচ জ্ঞান হারাইয়া যাইবে? যদি এ আত্মজ্ঞান মহিমাধারা—অনন্ত প্রবাহে না ছুটিয়া চলে, তবে অনন্ত অস্তিত্বের সার্থকতা কোথায়?

না গো না, তিনি আছেন, আমিও আছি, সবাই আছে; তাই আমার আত্মশক্তি, আমার ধর্ম্মপ্রেরণা, আমার প্রেম পূর্ণ জাগ্রত লোকে নবজন্ম দান করে। তাই নিদ্রার অবসানে জাগরণ গানে আমার যা কিছু পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠে। ওগো সংশয়বাদি! বল বল কেমন করিয়া প্রতিদিন নিশাবসানে নব প্রভাতে জাগরণের পালা আরম্ভ হয়? কেমন করিয়া আবার প্রেমের ঘরে আনন্দবাঁশি বাজিয়া

উঠে, কেমন করিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমের নিত্য নবীন ছন্দ গানে গানে সমস্ত গানময় করিয়া দেয়, কেমন করিয়া প্রেম-সোহাগ পরিচয় মিলনগীতি কাব্য অনন্ত পরিচয় পত্র দান করে ?

এত ভালবাসার, এত প্রতীক্ষার এই কি পরিণাম হইবে ? সব কিছুরই কি ব্যর্থতায় অবসান ? তা যদি হয় তবে আর অমর ধামের কথা কেন ? তবে কেন বুকে বুকে মর্ম্ম কোণে পুণ্যস্মৃতি পূজা ? তবে কেন আকুল বুকফাটা বেদনাযোগ ? তবে কেন আমার এ দীন লাঞ্ছিত নিঃসঙ্গ যাত্রা ? তাহা যদি হয়, ওগো কে আমার বুকে এ প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত করিল ? কোথায় কে তুমি ? একেবারে নিঃশেষে তবে সব কিছু শেষ করিয়া দাও। কেবল এ ব্যর্থ বেদনার ভার সহিব কেন ? কে আমার বুকে নিত্য নূতন ভাবকুসুম বিকসিত কর ? সমস্ত শেষ করিয়া দাও। সমস্ত স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি আনন্দ-লীলাকাহিনী একেবারে থামাইয়া দাও। না গো না, নিরাশার কথা, সংশয়ের কথা, আর বলিও না ! আমি যে আর সহিতে পারি না। বল ভক্তবাণী আশ্বাসবাণী—বিশ্ব-বুকের প্রাণকেন্দ্র কোথায় ? প্রকৃতির বুকে সব কিছুর ভিতরই যে পূর্ণ মঙ্গলের অনন্ত সুষমা ! তাঁর সৃষ্টি বিধান ত অসম্পূর্ণ নয়।

অনন্ত ধর্ম্মশীল মানবের বুকে অনন্ত ধর্ম্ম প্রেরণা অনন্ত প্রেম ক্ষুধা, সব যে অনন্তের বুকে মিলাইয়া যাইব বলিয়া রূপের গৃহে এ নিত্য লীলা। যে লক্ষ্যপথে ছুটিয়াছে মানুষ এ-সসীম লীলা ঘরে, কই তাহার সে চরম প্রাপ্তি? সাধু জীবনে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কঠোর নিষ্পেষণ লাঞ্ছনা পীড়ন সহিয়া গেলেন—কোথায় ধরণীর বুকে তাঁহার সাধুতার জয়? তবে কি এ সব কেবলই কল্পনা আর মায়া!

ধর্ম্মের জয়, সত্যের জয়, তাইত অনন্তের জীবন মহিমা, তাইত আমার নিঃসঙ্গ যাত্রাপথে সকল দুঃখ আমি নীরবে সহিতে প্রস্তুত। মৃত্যু যদি জীবন প্রভাতেই সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা দলিত করিয়া সব শেষ করিয়া দেয়, তবে কেন নিত্য নূতন দুঃখের বোঝা বহন করি? আমার মন ত এ কথায় সায় দেয় না।

কতদিন হইল প্রিয়ধনেরা চলিয়া গিয়াছেন, সবাই ভুলিল কিন্তু ওগো প্রিয়! আমার বুকে প্রেমের ঘরে—তুমি জাগিয়া রহিলে! এখনও যে তোমাদের স্মরণে মননে আমার বুক স্পন্দিত হইয়া উঠে, এখনও যে সে বিদায়ের করুণ গাথায় আমার দুনয়ন অশ্রুজলে ভাসিয়া যায়। হয়ত আমারই মত তোমরাও আনন্দলোকে আমায় স্মরণ করিতেছ। হে প্রিয়বঁধু! স্মৃতি চন্দনে এ কেমনতর গভীর

ছাপ আমার বুকে ? এ জীবনেও যে আমার আর আকর্ষণ নাই। তোমাদের বিরহে আমার কোথায় আরাম, কোথায় আনন্দ ? আমার প্রতি আকাঙ্ক্ষা সেই মঙ্গললোকে তোমাদের দিকে উধাও হইয়া যায়। ভাগ্যবান ভাগ্যবতী তোমরা, হয়ত আমাদের পুনর্মিলনের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে দেখিয়া তোমরা আনন্দে পুলকিত। এ লোকে এ কি আমার দুঃখবিলাপ ? অথচ ওগো প্রেমাস্পদ ! তুমি হয়ত বিমল আনন্দে আমার জন্য অগ্রগামী হইয়া আসিয়াছ।

কখন সে শুভালিঙ্গনের আয়োজন হইবে ? কখন আমার দীর্ঘ নিশ্বাসের আকুল স্পন্দন থামিয়া যাইবে ? কবে আমি নিত্য মিলনানন্দে বিধাতার অক্ষয় আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া সত্য স্বরূপের জয় ঘোষণা করিব ? এ লোকের স্মৃতি তখন আমাদের আরও কত আনন্দিত করিয়া তুলিবে। রূপের আনন্দ-বন্ধন এ লোকে আর ও লোকে, আত্মায় আত্মায় আত্মসম্মিলন। ধন্য আত্মারাম প্রাণারাম।

ওগো প্রেমময়! তবে কেন এত ক্রন্দন ? তোমার কাছেই সব। যদি তোমার স্নেহে প্রেমে বিশ্বাস থাকে তবে আমার প্রতীক্ষার বেদনাতেও আনন্দ। আমি শান্ত হইয়া নীরবে সে শুভ মুহূর্ত্তের জন্য প্রতীক্ষা করিব। আমি অব্যক্ত

আনন্দের আশায় ঊর্দ্ধমুখে করপুটে সে সব আনন্দের জন্য প্রতীক্ষা করিয়াই থাকি। মঙ্গলবিধাতা, তোমারই জয় হউক।

(চ)

ধ্যান

এ নয় স্বপন, এ নয় কুহেলী
বিশ্ব বুকেতে ঘুমের খেলা,
সীমার মাঝারে মরণ পাথারে
ভেসে চলে যাওয়া জীবন ভেলা।
সবই বেজে ওঠে অসীম সুরেতে,
পাগল গোপন হৃদয় তন্ত্রে,
ভ'রে ওঠে প্রাণ, গেয়ে চলে গান,
জাগায় নবীন জীবন মন্ত্রে।
ধরণীর বুকে যত ভালবাসা
জাগিবে আপন চেতন পুরেতে,
তাঁহাদেরি মাঝে জাগিব হে সুখে,
ছুটিব স্বরগ মোহন সুরেতে।

ধন্য কর দান খানি
তোমারি মহিমা মাঝে,
ধীরে ধীরে উঠি ফুটে
আমারি জীবন সাঁঝে।
সমাধির মৌন বুকে
বেদনার গান খানি,
অশ্রুজলে রচে শত
তোমারি মহিমা মানি।
ধেয়ান মহিমালোকে
যত কিছু ওঠে হেসে,
তোমারি অনন্ত-গান
সবে হাসে নব বেশে।
বিশ্বাস আনন্দ লোকে
মরণ সাগর পারে,
ত্রিদিবের গান খানি
বেজে ওঠে মন তারে।

যুগে যুগে ভক্তবাণীর আনন্দ ঘোষণায়, অতীতের মঙ্গল পুরে, শত সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রকৃতির বুকে ক্ষুদ্র বালুকণা হইতে ঐ গগন মণ্ডলে জ্যোতিষ্কসভায়, আর মানবের মর্ম্মগুহায়, বিবেকের আনন্দ সাড়ায়, ঐ একই কথা—

দেবতা আছেন। ভূমা মহান্ অগম্য অপার বিভু পুণ্য পবিত্র সুন্দর বিশ্ববুকে চেতন অচেতন সকলকে এক বিচিত্র মঙ্গলসাম্য সুষমায় সুশোভিত করিয়াছেন। অণু পরমাণু কিছুই ত হারায় না, আর চেতনময় আত্মসুন্দরেরই লয় হইবে ?

যখনই বলা হইয়াছে 'দেবতা আছেন' তখনই স্বীকার করা হইয়াছে মানবের অমরত্ব। অমর হইলাম যখন, তখন জ্ঞানও ত ফুরাইবে না। আত্মজ্ঞান যদি জাগিয়া না রহিলেন, তবে আমার জীবন হইতে নব জীবনেরই বা মূল্য কোথায় ? ধ্বংস ও জীবনের অস্তিত্ব সবইত সমান। মৃত্যুর পরপারেও মানব চেতনার এই মঙ্গলধারার ভিতরই প্রাণময় উৎসর্গ লীলার অনন্ত প্রবাহ চলিবে। যদি স্মৃতির আনন্দ বুকে বুকে সব জাগিয়াই না থাকিবে, তবে আর পাপপুণ্যের ভেদাভেদ কোথায় ? তবে আর ধর্ম্ম অধর্ম্মের জয় পরাজয়ের সার্থকতা রহিল কই ? যদি ইহ-পরজীবনের ধারাবাহিক জ্ঞানযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তবে আর পূর্ণতার সাধনা কেন ? অনন্ত জাগরণে পরিপূর্ণ শিবসুন্দরের পুণ্য জ্যোতিঃ সত্তার ভিতরই অনন্ত জীবনজোতিঃ।

এই অনন্ত যোগই ইহপরকালের মিলনভূমি। কে জানে কেমন করিয়া এই দুর্ব্বল দেহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া প্রাণপাখী তাহার মহিমাময়ী সত্তার ভিতর নবশক্তি নবদীক্ষা

লাভ করিবে? জীবন সন্ধ্যায় কত রজনীর শান্ত সুষুপ্তি লীলার ভিতর শৈশবের ও যৌবনের কত বিস্মৃত আনন্দ ছবি জীবনপটে অঙ্কিত হইয়া উঠে; আর তাহার মধুর ঝঙ্কারে প্রাণমন রণিত হয়। একি স্মৃতির মঙ্গল গন্ধ বাল্যে যৌবনে বার্দ্ধক্যে চলিয়াছে! কত আনন্দ লীলা তরঙ্গ।—একি যোগানন্দ অমৃত সুধাপান!

এম্‌নি করিয়াই ত ভূত ভবিষ্যতের প্রাণময় মিলন ছন্দঃ! এম্‌নি করিয়াই ত যুগ যুগান্তরের কর্ম্ম সাধনা বিশ্ব-বুকে চির সঞ্চিত। স্মৃতির জয় গৌরবেই ইহপরকালে যুগ যুগান্তরের আনন্দ মিলন।—এম্‌নি করিয়াই ত পাপ পুণ্যের কর্ম্ম ফলাফল।

পার্থিব জ্ঞান ধারণা করিতে পারে না সে দেহাতীত লোক, অতীন্দ্রিয় স্বরূপ। জানি না সে কেমনতর অহেতুকী প্রেমভক্তির আদান প্রদান। অজ্ঞানতার দীন অন্ধকারে দৃষ্টি আচ্ছন্ন অথচ কত উন্নত ঋষিপ্রাণ ধ্যানালোকে আত্ম-জ্যোতিপ্রভাবে, লক্ষ যোজন দূরে থাকিয়াও প্রাণযোগের গভীর সত্তা উপলব্ধি করেন। আমার ক্ষুদ্র সসীম জ্ঞান যে সে বোঝে না সে গভীর তত্ত্বকথা।

হৃদয়ের নিবিড় যোগ অনন্ত যোগ।—এ যোগ তখনই ছিন্ন হইতে পারে যখন পরমদেবতার অনন্ত অস্তিত্ব সংসার

হইতে লোপ পাইয়া যায়। আমি ক্ষুদ্র অপরিপূর্ণ দীন, আমি জানি না আমার ভবিষ্যৎ; কিন্তু বুঝি আমার অজানা ভাগ্যবিধাতা আমার জন্য কল্যাণই করিয়াছেন। শিশুর মত দুর্ব্বল অবোধ ভালমন্দ কিছু বুঝি না, তবু মায়ের বুকে বুক রাখিয়া নিশ্চিন্ত হই। ক্ষুদ্র দীন ভাষার সাধ্য কি তা প্রকাশ করে।

অমর কথা, অমরচিন্তা বুকের ঘরে নিত্য মিলনানন্দের আশা জাগায়। কেন প্রাণ মৃত্যু যবনিকা ভেদ করিয়া অমর ধামে উধাও হইয়া যাইতে চাহে? কেন এ দুর্ব্বল হৃদয়ে এ অফুরন্ত আশা ভালবাসা? কে যেন বাক্যহীন বাণীতে একদিন পাপপুণ্যের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল ভোগ করিতে হইবে এ কথা মর্ম্মকোণে নিরন্তর গোপনে গোপনে জানাইতেছেন। তাইত মানুষের খেলাধূলায় নিত্য পুণ্যের সাধনা, তাইত নিরন্তর এ বক্ষপুরে দেবাসুরের নিত্য হানাহানি আর জাগরণ উদ্বোধন।

অনন্ত মিলনেই প্রেমের প্রাণ প্রতিষ্ঠা—এই মিলন গানেই মানবের চরিত্রের নৈতিক জীবনের বিচিত্র দুর্জ্জয় শক্তি। মানুষ সে আনন্দ আলোক, সে অনন্ত মিলন, বুঝিতে না পারিয়া পরাজয়ের অনন্ত বিনাশের কথা মনে করে। ব্যর্থ সংশয় কুহেলী ঘোরে—দৃষ্টি যখন অন্ধ, তখন হায়!

হায়! মানুষ জটিল তর্কে দেবতার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ জ্ঞান পুণ্য প্রেম অক্ষয়ধনে বঞ্চিত হইয়া এ কি অনর্থের পথে ছুটিয়া চলে!

মানুষ ইচ্ছা করুক্, আর নাই করুক্ চিরকালের দেবতা যিনি তোমার আমার সকলের জন্য যাহা কল্যাণ রাখিয়াছেন অনন্তবুকে, তাহা আর কে খণ্ডন করে? যাঁর শিবলীলায় বিশ্ব বুকে আনন্দবিকাশ, সেই শিবসুন্দরের ইচ্ছালীলাতেই জীবাত্মার বুকে পুণ্যপ্রভার আনন্দ জ্যোতিতত্ত্ব, আর অখণ্ড শাসন বিধি—রুদ্র স্বরূপ মহিমা।

ঐ শোন ভীম বজ্রবাণী। কে তুমি প্রগল্‌ভা জননী! কে তুমি সত্যবিমুখ পিতা! শিশুর কোমল বুকে তুচ্ছ অবহেলায় কত অসত্য অজ্ঞানের অন্ধকারে জটিল কুহেলী জমাইয়া তুলিতেছ। সাবধান! একদিন এজন্য হিসাব দিতে হইবেই তোমার। এ উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম অবহেলিত জীবনের বিষময় ফল কে ভোগ করে? তোমার তরল আমোদ প্রমোদ একদিন কোন অশুভক্ষণে শিশুর হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে কে জানে? আজ তাহার অবনত জীবন, অসত্য ঘৃণিত পথের যে অবশ্যম্ভাবী চরম পরিণতি, আজ তাহার মরণ সন্ধিক্ষণে বল কে সে জন্য দায়ী? কোমল সুন্দর তরুণ জীবনকমলদল কেন হায় আজ এ ঘোর

অসত্যের কালিমায় কলঙ্কিত ? এ কি অকাল কীটদষ্ট ছিন্ন জীবন শতদল !

স্বার্থসাধনে বেশ ত চলিয়াছ ধরণীবুকে আনন্দ ও গর্ব্বে ! যেন তুমিই তোমার মালিক ! এ বিশ্বভুবন যেন তোমারই হাতের গড়া। সবাইকে তুচ্ছ করিয়া আপনার অভীষ্টসিদ্ধ লাভেই ছুটি, কেবা আপন, কেবা পর, কোথায় কি জানি না, জানি না ইহকাল পরকাল। কোথায় স্বর্গ-লোক কে জানে ? তবে কাহার বুকে আমি অনন্তকাল থাকিব বলত ? এমনি করিয়াই যাহার দিন ব্যর্থ কাটিয়া গেল, তবে কাহার বুকের ঘরে, কাহার প্রেমের আলোকে নিত্য পুলক স্পন্দনে নিত্যস্মৃতি পূজা হইবে ? আর যে খাটিয়া চলিল দশের জন্য, সে যে জাগিয়া রহিল দশের বুকে, সকল হৃদয় মন্দিরে, তার মৃত্যু কোথায় ? আর যে জন রহিল আপনার সুখ দুঃখ লইয়াই, ভুলিয়া গেল দশের কথা, তার যে মরণ সাগর পারেও একা একাই বিদেশীর মত সহানুভূতি শূন্য ও প্রেমশূন্য জীবন লইয়া একাকীত্বের ভিতর জাগিতে হইবে না কি ? চলিয়াছি ভব-পারাবারে, কই আমার ত কেউ ভালবাসার ধন নাই সংসারে ! আমিত কাহাকেও ভালবাসি নাই, আমিত কাহারও বেদনায় বুকভরা প্রেম ঢালিয়া দিই নাই, তবে

আমি কেন আশা করিব? যদি বা দিয়াছি এক মুষ্টি ভিক্ষা, যদি বা সাধারণের মঙ্গল যজ্ঞে আমার অর্থভাণ্ডার খুলিয়াছি কোন দিন, সেও আমারই জন্য। আমি সংসারে প্রতিষ্ঠা যশ মান লাভ করিব তাহারই জন্য। তাইত দেহের খেলা যেদিন ফুরাইয়া যাইবে, সে দেবলোকের আনন্দ উৎসবেও আমি সেই একাকীত্বের দীনতায় দীন হীন,—আমার সার্থকতা কোথায়?

একদিন কিন্তু সে অমরলোকে মিলিতেই হইবে সকলকে। দুর্দ্দান্ত হৃদয়হীন প্রতারক! হয়ত কত অনাথার সর্ব্বনাশ করিয়াছ, কত অনাথ সন্তানকে পথের ভিখারী করিয়াছ, হয়ত পিতা, পিতামহের কত বাঞ্ছিত ধন ব্যর্থ বিলাসপ্রমোদে নষ্ট করিয়াছ, কিন্তু মনে রাখিও ওগো নির্ম্মম নিষ্পেষিত ব্যথিত বক্ষের প্রতি দীর্ঘশ্বাস,—প্রতি ব্যাকুল বেদনার করুণ নিবেদন দেবতার বুকে জাগ্রত। মনে রাখিও কত দুঃখী তাপীর বুকফাটা শোকোচ্ছ্বাস, হাহাকার, বিলাপ, নীরবে গোপনে দেবতার চরণে নিত্য নিবেদিত হইতেছে। ব্যর্থ নহে তাহা, শুনিয়াছেন জানিয়াছেন অন্তর্য্যামী দেবতা। একদিন সকলের সঙ্গে মিলিতে হইবে দেহাতীত লোকে, তোমার আমার যাহা কিছু ক্ষুদ্রতা, যাহা কিছু পাপ, যাহা কিছু মিথ্যা সব সত্যের আলোকে সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া

উঠিবে। এ লোকে সকলের চোখে ধূলি দিয়া যাইলাম,—আমাকেও ভুলাইলাম, কিন্তু যে দিন দেহের দীন আবরণ উন্মুক্ত হয়, সেদিন যে সব লুকোচুরি—সব চাতুরী—অন্তর্হিত হইয়া গেল। তখন কোথায় আমার ঢাকা-ঢাকি? তাই যদি বলিতে চাহ, ওসব কিছু নাই, পরকালও নাই, ঈশ্বরও নাই, অনন্ত জীবনও নাই, অনন্ত মিলনও নাই, সবই শূন্যময়; তবে আবার ও কি হইল? তবু কেন বুকের ঘরে ক্ষণে ক্ষণে চকিত শিহরণ! তবে কেন ক্ষণে ক্ষণে হৃদয় নিভৃতে মর্ম্মকোণে—ভয়ের বিভীষিকা? যতই কেন তুমি চতুর হও না, তোমার পাপ তাপ অস্বীকার কর না, যাহা সত্য তাহার বিনাশ নাই। একদিন সে সত্য স্বরূপে প্রকাশিত হইবেই হইবে।

ওগো দেবতা! ওগো পরম গুরু, পরম সত্য বিচারক! সত্যি কি আবার দেহাতীত লোকে সব ধরা পড়িয়া যাইবে? সত্যি কি আমার সব লুকোচুরি খেলা ফুরাইয়া যাইবে? মনে করিতেও যে লজ্জায় চমকিয়া উঠি। ওগো শোন দুঃখীতাপী জন! লাঞ্ছিত পদদলিত ব্যথিত জন! একদিন সবাই সত্যরূপে জাগিয়া উঠিব। একদিন আবার আমার সকল কর্ম্মের হিসাব, সকল জবাবদিহি দিতেই হইবে। একদিন পাপ পুণ্যের ফলাফল ভোগ করিতেই হইবে।

কে দেবে আমায় সান্ত্বনা! অদৃষ্টের ফল—স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে।

যে অপরাধী, যে পাপী, তাহারই তাই মরণান্তে জাগিয়া উঠিবার ভয়। যে পুণ্যবান্ মৃত্যু ত তাহার কাছে শুভ আবাহন। তাহার কত আনন্দ আশা, নয়নে বদনে কত হাসি! তখন শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত জীবাত্মার কি আনন্দযাত্রা! তখন তাঁর সকল দুঃখের অবসান। তাইত তিনি ইহলোকে জীবন সংগ্রামে ভীত নহেন। মৃত্যুর কালো রূপের ভিতরই তিনি কি আনন্দ আলোকেই হাসিয়া উঠেন, আর বদন-কমলে দিব্য জ্যোতি-বিভা!

কে তুমি বৃদ্ধ! ধর্ম্মপথে, সত্যপথে চলিতে যাইয়া রক্তাক্ত, ব্যথিত, গৃহহীন, ক্লান্ত শ্রান্ত—তোমার বদনকমলে তবুও ওকি দিব্য লেখা? মহাযাত্রার আনন্দ গানে তাই আর দুঃখ নাই, ক্লান্তি নাই, সংগ্রাম নাই,—মহানন্দ যাত্রায় সব কিছুর অবসান হইবে। তোমার উদার ত্যাগের সত্য মহিমা এবার প্রকাশিত হইবে।

তোমার জীর্ণ তনু রুগ্ন ভগ্ন,—আর পারে না—কর্ম্মপথে চলিতে, জীবাত্মা আর পারেন না দেহযন্ত্রে তাঁর কর্ম্মলীলা সাধন করিতে! ঐ যে প্রাচীন বৃক্ষের মত সকল সার শক্তি ফুরাইয়া আসিয়াছে, নিত্য নূতন ফল ফুল বিতরণ জগতের

বুকে ফুরাইয়া গিয়াছে। তোমার জীবন প্রভাতের আনন্দ সঙ্গী সব চলিয়া গিয়াছেন। একে একে সকলে চলিয়াছেন—এখন তুমি অপরিচিতের মত চলিয়াছ একা একা সংসারে দিনের কাজে, হয়ত চলিয়াছ সভায় ধীর পদে একাকীত্বের দৈন্যে, কিন্তু ভয় নাই, তুমিও ত শীঘ্রই চলিবে সে অমৃত পথে।

ঐ মরণ সাগর পারে তোমার নিত্যগৃহ, ঐ যে প্রিয়জন মিলন ধাম! ঐ যে দেববালাগণের আনন্দলীলা! যে আঁখি ক্ষীণ দৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল নয়নের জলে জলে, আজ তাহার একি সত্য দৃষ্টিলাভ? এ কি অব্যক্ত আনন্দ প্রকাশ! এ কি আমার শক্তিলীলা! ধন্য আমি! ধন্য আমার নীরস জীবন সংগ্রাম! ধন্য আমার দেবতার সত্য ভালবাসা!

আবার মিলিতে হইবে, ওগো বালক বৃদ্ধ যুবা! ধার্ম্মিক পিতামাতার সাধুসন্তান সন্ততি, সবাই আবার জাগ্রত হইব। কত দুঃখে চলি সংসারে, কত ক্লান্তি, ভারের ভার আর বহিতে পারি না। বুঝিয়াছেন পিতা আমার ক্লান্ত সংগ্রাম, বুঝিয়াছেন জননী দীনসন্তানের মর্ম্মব্যথা—আছেন সকলে অনন্ত ধামে, একদিন সকল রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে।

এই যে অমৃত পথ অনন্ত প্রসারিত। হয়ত সেখানে কত

দুঃখ, কত কণ্টকাকীর্ণ, দুরারোহ, তবুও কিন্তু চলিয়াছে সকলে সত্যলোকে সত্যপথের পথিকদলের দেবতাবাঞ্ছিত পথে, অমৃতপথে! তাই বলি সাবধান! অসত্যের পথে কেন আর? সত্য পথে চল মন।

হায়! হায়! আমার কত দুর্দ্দম বাসনা, কত রিপুর ভীষণ তাড়না, ব্যর্থ প্রগল্‌ভতার কত জটিল স্বরূপ, কত মত্ত লালসা, তার কত আপাতমধুর মোহন প্রকাশ। নিমেষে, ক্ষণিক চঞ্চল দোলায় কোথায় দুলাইয়া দেয়। ভুলে যাই মঙ্গল, বুঝিও না কেমন করিয়া কখন আমার বাসনালুব্ধ মন প্রলোভনের পথে সর্ব্বনাশের আয়োজনে ছুটিয়া চলে। ক্ষণে ক্ষণে আমার কত ভুল, হয়ত আমিও বুঝিনা আমার সে ভ্রম। তুমি জানিয়াছ চিরকল্যাণ! তুমি মনে রাখিয়াছ আমার ভুল ত্রুটী মোহপরমাদ। সেই চির জাগরণের দেশে কেমন করিয়া এ ভুলের অপরাধ লইয়া তোমার সম্মুখীন হইব বল? আমার মঙ্গল বিবেকবাণী যে আমার লুব্ধ চিত্তের ক্ষণিক উত্তেজনার ব্যর্থ পিপাসা চরিতার্থতার কাছে যে ক্ষণে ক্ষণে হারিয়া যায়। দেখ অন্তর্য্যামী! আমার প্রেম বিহীন মলিন হৃদয়, দেখ কত স্থৈর্য্য ধৈর্য্যহীন। কই সে দীনতা, কই সে দেবত্ব মানবত্ব?

• ভবিষ্যৎ মিলনের আনন্দ আশায় মনে রাখিও প্রিয়

ধনদের। তোমার প্রতিদিনের প্রার্থনায় তাঁহাদের স্মরণ কর।
মনে রাখিও দিবসের আনন্দ সম্ভোগে, কর্ম্মদোলায়।
মনে রাখিও দুর্দ্দিনে, ঘনতমসাচ্ছন্ন রজনীতে, ঝড় বাদলে।
ভুলিও না সে চিরবাঞ্ছিত স্মৃতিপূজা। প্রেমই মঙ্গল বন্ধন,
প্রেমই দেহের পরপারে লইয়া যায় উন্নতলোকে। প্রেমেই
স্বর্গমর্ত্ত একাকার করে, প্রেমেই প্রেমময়ের বিশ্বলীলা,
প্রেমেই জগৎবুকে আনন্দস্বরূপ ফুটিয়া উঠে।

যখনই তোমার হাতখানি শুভকর্ম্মে অগ্রসর হইয়া যাইবে,
যখনই শত্রুকে মিত্র বলিতে পারিবে, যখনই নিন্দুকের বাক্য
বাণেও তাহাকে ক্ষমার আনন্দ মহিমায় বরণ করিবে, যখনই
দুঃখী তাপীর সঙ্গে সহানুভূতিভরা অশ্রু ঢালিয়া দিবে ; যখনই
জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হইবে, তখনই মনে রাখিও প্রিয়স্মৃতি !
হৃদয় মন্দিরে স্মৃতিপূজার মঙ্গল অর্ঘ্য সাজাইয়া লইয়া চল,
তবেইত বুঝিতে পারিবে কেমন করিয়া অমৃতের দ্বার তোমার
কাছে খুলিয়া যাইবে। তবেইত জানিতে পারিবে কেমন
করিয়া বিদেহীজন এখনও তোমার সত্য সাধনায়, সত্য
পুণ্যব্রতে প্রসন্ন হইয়া আনন্দে আশীর্ব্বাদ করেন।

নিত্যমিলন অবশ্যম্ভাবী। মুছিয়া ফেল অশ্রুজল। ওগো
অভাগা জনক জননি ! কে কাঁদ দিনরজনী সন্তানের বিরহ
বেদনায় ? কে তুমি দুঃখিনী পতিব্রতা সতি ! নীরবে নয়নের

জলে প্রেমাস্পদের সমাধিবুক নিত্য ধৌত করিয়া চল? কে তুমি ভাই ভগিনি! প্রিয় বন্ধু! হৃদয়ের নির্ম্মাল্য স্মৃতি অর্ঘ্যরূপে নিবেদন কর? একদিন ব্যথার পূজার সমাধান হইবে। কোমল বুকে যত কিছু বেদনার আঘাত সব উপশম হইবে। মৃত জন জাগ্রত; চিরবিচ্ছেদ নাই জগতে; সকলের জন্য মিলন উৎসব প্রতীক্ষা করিতেছে।

সত্য দেবত্ব আমার সান্ত্বনার সহায় হউন। যখন ভালবাসিয়াছি একদিন জানিত দেহের বিরহ বেদনা সহিতেই হইবে। একদিন যে অব্যক্ত আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছি। আজ সমাধির মৌননিকুঞ্জে তাইত নীরবে নীরবে একা একা আমার বেদনা গান গাহিয়া যাই। ওগো কি বল তোমরা আমার সব কিছু ঐ সমাধির বুকে ধূলি ধূসরে? না গো না, তা কি করিয়া হইবে? আমি কি ঐ ধূলিময় দেহেই কেবল আমার প্রেম প্রতিষ্ঠা করিয়াছি? নয়নে নয়নে পলকে পলকে যে প্রেমপুলক স্পন্দন প্রেমসোহাগে, মননে বচনে, হৃদয় স্পন্দনে, হাসির লহরী তরঙ্গে, সব কি ধূলিময়? ও যে চৈতন্যের প্রেমলীলা—জীবাত্মায় জীবাত্মায় পরম প্রেম অভিব্যক্তি। আর জীবাত্মা যে পরমাত্মার বুকে চির জাগ্রত। একি দেবতার দান! ঐ মঙ্গললোকে প্রিয়ধনদের প্রাণপুরে যে আমার স্থান এখন চিরবিরাজিত। এখনত আর

স্বার্থের কোলাহল নাই, এখন কেবল শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত প্রেম—আরও কত পবিত্র, আরও কত মহত্তর।

ওগো আমার প্রিয় জনেরা আমার অশ্রুজলে সমাধির চিরমৌন বুকেই এস! কোন্ সমাধি প্রেমের ঘরে ব্যবধান আনিবে? বিধাতার দান প্রেমমঙ্গল বন্ধন কে ছিন্ন করে? প্রেম আছে তাইত বেদন বিরহ, তাই ত অশ্রুসলিল তীর্থে নিত্য ব্যথার পূজা! মঙ্গললোকে আবার মিলন, যেখানে দুঃখ নাই, বিচ্ছেদ নাই—স্রষ্টা পাতা বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্ত জীবনের আনন্দ আভাসে সমস্ত সার্থক করিয়াছেন। তাইত ধূলিময় সংসারেও দেবগন্ধ, স্বর্গের আনন্দ গান, বিশ্বাস ও প্রেমেই যে তাহার অস্তিত্ব।

মরণ সাগর পারেই আমার আনন্দ গৃহ, আমার সত্য জন্মভূমি। সজল নয়নে ঊর্দ্ধমুখে করজোড়ে প্রতীক্ষা কর। পবিত্র দীক্ষা সার্থক হউক্। এই মরজগতে বাস করিয়াই অমৃতে বাস করি। যদি অপরাধের দৈন্যে এ অধিকার হইতে বঞ্চিত হই ওগো ঠাকুর শুদ্ধ কর। যদি অশুদ্ধ ভাব আমার চিত্তদর্পণকে মলিন করে, ওগো শুদ্ধ সুন্দর! আশীর্ব্বাদ কর—এ মোহপরমাদ দূর কর। কত অন্যায় করিয়াছি—তবুও চোখের জলে কেবলই প্রার্থনা করি, বল দাও, ঠাকুর এবার শুদ্ধ হবই হব।

দেহ ফুরাইলে আমরা মিলিবই মিলিব। প্রাণের দেবতা! ধন্য তোমার করুণা! ধন্য তোমার ভালবাসা! আমি কি করিয়া প্রকাশ করি, দেখ আমার দীন সাজ, দেখ আমার দুর্ব্বলতার মোহ; ওগো পূর্ণ মঙ্গল দেবতা আমার, তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি আমার বুকের তলে ভাল করিয়া পাত। আমি নীরব পূজারী হইয়া তোমার মৌন বিশ্ব সভাতে নীরবেই প্রণত হই। হরিষ বিষাদ, আমার প্রতি দীর্ঘশ্বাস বেদনার অশ্রু ওগো দেবতা আমার প্রাণসখা! তোমার ভিতরই সব সার্থক হউক।

(১৯)

মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতি উৎসব

বল জয়, বল জয়,
দেবতার জয়,
অফুরান দান যে গো—
সবই জেগে রয়।

ধূলিমুঠি ল'য়ে খেলা,
জাগরণ-গান,
আশীষ-আলোকে জাগা,—
অমৃত সে দান।
বল জয়, বল জয়,
জয় শিবময়,
তুমি আমি সব সেথা
হেসে জেগে রয়।
বীজ হোতে ফুল ফোটে,
মরি কি বা চুপে!
ফুটিতে জনম হেথা,
নব নব রূপে।
সমাধির হিমরূপ
কোথা গেল মোর,
ধন্য শুভ দিনখানি,—
ভাঙে ঘুমঘোর।
ঘুম ভেঙে গেয়ে উঠি
ধন্য মহারাজ,
ধন্য মম জাগরণ,
নব নব সাজ।

দুখের রজনী দেখ,
　　　　হোল অবসান—
সখার বুকেতে জাগি,
　　　　এ কি মম মান !
ঘুম ভেঙে মনে হয়,
　　　　এ বুঝি স্বপন,
দুদিনের খেলা ধূলা,
　　　　ভাঙন গড়ন।
সুর কোথা গাও আজি
　　　　দেবতার জয়,
শুদ্ধরূপে জাগি সদা
　　　　মহা মহিমায়।
দেবলোকে নিয়ে চলে
　　　　পুণ্য মহাগান,
ধন্য হোল গানখানি
　　　　দেবতার দান।

যেদিন শোকের ভারে মুহ্যমান মানুষ ভালবাসার ধনের, ভক্তের, শব বুকে করিয়া অশ্রু জলে আকুল হইয়া ফিরিল সেদিন ও-কি বাণী ! কোথায় অন্বেষণ কর ধূলিমুষ্টির ভিতর ভক্তের আনন্দ অস্তিত্ব ? ঐ দেখ দেহমুক্ত আত্মা ছুটিয়াছেন

উৰ্দ্ধলোকে, অমৃতধামে। কোথায় মৃত্যু? এখন বল ত কে দিয়াছ ব্যথা? কে পরাইয়াছ কাঁটার মালা? কে মারিয়াছ ভক্তের বুকে বিষাক্ত শলাকা ঐ যোগশুদ্ধ শান্ত কোমল শুভ্র তনুখানিতে? এখন কেন তুমি বিশ্বাসঘাতক চমকিয়া ওঠ আপন মনে?

মূক সমাধির অন্তরালেই অনন্ত জাগরণ। তাই ত তুদিনের খেলা-ঘরে আনন্দোৎসব, তাই ত মৃত্যুঞ্জয়ে আনন্দবরণ। পৃথিবীর ক্ষুদ্রতা মৃত্যুবিরহ যত কিছু তুঃখ বেদনা সব কিছু হইতে মুক্ত হইয়া আজ যে ভাগবতী তনুলাভ, তাই ত আনন্দোৎসব। ভক্তজীবনখানির কি আনন্দে কৰ্ম্মসাধনা ভগবৎপ্রেরণায়। মানুষের সসীম কৰ্ম্মদোলায় স্বার্থলীলায় মঙ্গলগান শুনাইলেন, বিশ্বের শুভসাধনায় সমস্ত উৎসর্গ করিয়া আপনভোলা প্রেমগদ্‌গদ্ হৃদয়খানির কি বিচিত্র দেবপ্রভাব! কেন এত রক্তপাত, এত বেদনা সত্যসাধনায়? এমনি করিয়াই ত দেবসন্তানের রক্তপাতেই জগৎবুকে দেবভাবের জন্মদান; এমনি করিয়াই ত নিৰ্ম্মম অবিশ্বস্ত পাষাণবুকে ভগবদ্ভক্তির অনু-প্রেরণার মহা উদ্বোধন। সে মঙ্গলবীজ একদিন কেমন করিয়া বিশ্ববুকে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে কে জানে? এমনি করিয়া সাধুতার নিষ্পেষণ নিৰ্ম্মম পীড়ন যখন দেখে মানুষ,

তখন যে আশা-উৎসাহ থাকে না। পার্থিব ধন ঐশ্বর্য্য সব কিছু যেদিন হারাইয়া যায়, সেদিন আবার চতুর্দ্দিক অন্ধকার। অথচ বিনাশ নাই দেব-আত্মার। আবার জাগরণের পালা, আবার নব প্রভাতে নব উদ্বোধন। যেই দেহের আবরণ চলিয়া গেল, তখনই মানুষের কাছে সত্য স্বরূপখানি ফুটিয়া উঠিবে। তখনই দেবত্ব সংসারে, তখনই মানুষ বুঝিল নিন্দা প্রশংসা জন্ম মৃত্যু কিছুই নয়—সব কিছুর ভিতর দেবত্বের,—মহত্ত্বেরই—জয়। দেবতার আসন তখন হৃদয় ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন মহাপ্রাণ সাধু জীবনের সত্য পূজা আরম্ভ হইল।

এমনি করিয়াই সাধু জীবনের মহৎ আদর্শ ক্ষুদ্র মানবের বুকে আশা জাগ্রত করে। এমনি করিয়াই ব্যর্থ বেদনা পীড়নের ভিতরই সত্য মঙ্গল মন্ত্র জপ করিয়া চলে। এমনি করিয়াই তখন মৃত্যুঞ্জয় স্বরূপতত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়, আর মরণসাগরপারে অমৃতের আনন্দ-আলো জ্বলিয়া উঠে। সাধুতার মহান্ আদর্শের ভিতরই তুমি আমি সকলেই মুক্তির সন্ধান করি, শুদ্ধ সুন্দর স্বরূপের ভিতর কল্যাণে জাগ্রত হই। তখন আর কি রহিল? সকল অশুভ পাপ তাপের উর্দ্ধে কেবল জীবাত্মা আর পরমাত্মা, তখন জীবনে উদারতা, প্রেমে বিশালতা, ভগবদ্ভক্তি ভূমা মহানের সর্ব্বব্যাপিত্বের আনন্দ

প্রকাশ; তখন আর ক্ষুদ্রে আমার তৃপ্তি নাই, তখন অমৃতেই আনন্দ।

সাধুতায় মঙ্গল আদর্শের ভিতরই একদিন মানুষের কর্ম্ম অবসান হইবে, একদিন নবলোকে নবপ্রেরণা নামিয়া আসিবে। কোথায় ধূলি? কোথায় ছাই? চৈতন্যেই আত্মার অস্তিত্ব, চৈতন্যেই অনন্ত জীবনের আভাস।

মৃত্যু নাই, তাইত কল্যাণময়ী বাণী। তোমার দেহ ধূলিসাৎ হইবে হউক, ভয় নাই। তুমি চেতনময় আত্মা, তোমার মৃত্যু কোথায়? যখন পাপের মালিন্য তখনই মৃত্যু; যেদিন দেহের মৃত্যু হয়, আর ত দৈহিকতার কোন কিছু ব্যর্থ আঘাত আসিয়া পীড়ন করে না! তেমনিই যেদিন অজ্ঞানতার অন্ধকারে জীবাত্মা মলিন, সেদিনই তাহার কাছে সব কুহকাচ্ছন্ন। সেদিনই তাহার আত্মসত্তা দুর্ব্বল দীন হীন।

মোহ পাপে অবসন্ন জনেরই অজ্ঞানতায়, মৃত্যুসম অন্ধকারে, সমস্ত আবৃত। যতক্ষণ মানুষের পাশবৃত্তি, স্বার্থলালসা, মোহপাপ, ততক্ষণ এ মৃত্যুবেদনার ভিতর দিয়া যাইতেই হইবে। দেহের মৃত্যুই সত্য মৃত্যু নহে। আত্ম-বিনাশেই প্রকৃত মৃত্যু। যদি সাধুতা দেবত্ব দেবসাধনার ভিতর বিকসিত হইয়া উঠে, তবে আমার বিনাশ কোথায়?

তাই ত মানুষের তপস্যা সাধনা, তাই ত সাধুতাতেই আত্ম-প্রসাদ, দেব-আশীর্ব্বাদলাভ ?

যতই কেন দীর্ঘযাত্রা মনে হউক্ না, তবুও চলিতে হইবে। জীবনে ক্লান্ত ব্যথিত হইয়াও দেবসন্তানের আনন্দগৌরব রক্ষা করিতেই হইবে। জীবনসংগ্রামের সকল বেদনা দুঃখ বহন করিতেই হইবে। একদিন সব কিছুর অবসান হইবে, একদিন মুক্তির সমাচার নামিয়া আসিবেই আসিবে একদিন মৃত্যুমাঝে অমৃতনাম অমৃত লোকে লইয়া যাইবেই যাইবে।

ধন্য জীবাত্মা, ধন্য তোমার নীরব বেদনা সংগ্রাম, ধন্য তোমার নীরব সাধনা তপস্যা, ধন্য তুমি, যদি পরম লক্ষ্য করিয়া থাক, তাহা হইলে আনন্দের বুকে বাস করিয়া ধন্য হইয়াছ। আর আমি দেখ এখনও ক্ষণে ক্ষণে ক্ষুদ্রে আকৃষ্ট হই, এখনও আমার কত কলুষ ফাঁকি, তবুও সংগ্রাম করি, তবুও নয়নের জলে, অনুতাপের অনলে, ঊর্দ্ধমুখে করপুটে প্রতীক্ষা করিয়া আছি। একদিন দেবতার বরে আমার নব জীবন লাভ হইবে। একদিন আমার ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত হৃদয়েও শান্তির আনন্দধারা বহিয়া যাইবে। যখন অমৃতে জন্ম, অনন্ত বিনাশ অসম্ভব।

তাই ত কেবল সান্ত্বনার কথা। কে তুমি অশান্ত পুত্র-শোকে কাতর পিতা ? কেন ধূলিমুষ্টির ভিতর তোমার

সন্তানের অস্তিত্ব সন্ধান কর? দৃষ্টি ঊর্দ্ধে স্থাপন কর, দেখ অমৃতময়ে অমৃত সন্তান! আনন্দে স্মৃতিপূজা কর, জীবন ও অমরত্ব একসূত্রে গ্রথিত, যেখানে প্রেম সেখানেই জাগরণ; সকলেই আছেন, সকলেই অমৃতে বাস করেন।

ওগো অভাগিনী পতিব্রতা সাধ্বী সতী! আর দুঃখ নাই তোমার। অমৃতময়ে চল, মৃত্যুঞ্জয়ে বাস কর; তুমিও অমৃতে তিনিও অমৃতে; অমৃতময়ের আনন্দবুকে সকলেই আছি; তাই নিত্য-নবোৎসব, তাই মহাযাত্রায় সকলে আনন্দোৎসব কর।

সকল দুঃখের অবসান হইবে, মৃত্যুঞ্জয়ে সকলের অমরত্ব লাভ হইবে। জন্ম মৃত্যুর ভিতরে মানবজন্মের সার্থকতা কোথায়? চলিয়াছেন অমৃতধামের যাত্রীদল, সকলেই অমৃতের সন্তান, তবে আর কেন নৈরাশ্যের গান?

ধরণীর বুকে, কালের মাঝারে,
বাঁধা যে আছিনু দিবস যামি!
মরণ-সখার আশীষ-আলোকে
আজিকে জাগিনু গোপন আমি।
ভয়ে কাঁপে বুক সদা ধুক্ ধুক্,
তাঁহারি মাঝারে উঠিনু জাগি'
সখা যে ডেকেছে স্বরগপুরেতে,
তাইত করুণা-আশীষ মাগি।

পরম গোপন চরম সাধন,
পান করি সুধা অমৃত দান ;
মরণ মাঝারে শরণ জেগেছে
সীমার সুরেতে অসীম গান !
যত কিছু জমে পাতা রাশি রাশি,
ঢেকেছে সমাধি ধূসর ধূলি,
রূপের মাধুরী ছাই হোল হায়
আঁকিল সে কোন্ মোহন তুলি ?
নিমেষে চুকেছে সকল বাঁধন,
মরণ-কুহেলী মিটিল ক্ষণে,
বেদনার বোঝা ফেলে দিয়ে যাই,
চুকিল যা কিছু তাহারি সনে।
স্বরগে উঠেছে জয় কোলাহল,
ছুটিয়া চলেছি সে আহ্বানে,
বিজয়ের মালা দেবলোকে গাঁথে,
তাই আমি ধাই মরণ গানে
কার ভালবাসা অনিমেষ পাত
আমায় নেবেগো আসন পাতি',
তাহারি মাঝারে সব জানা হবে
বেদনা ভুলিয়া উঠিব মাতি'।

স্বষ্টির বুকে অসীম গেয়ানে
কোটি ভানু হাসে, আলোকে ধায়,
তারামণ্ডিত পুলকহসিত
বসুধা-জননী সে আলো চায়।
ত্রিদিবের আলো মাখিয়া অঙ্গে,
নিখিল ভুবন পুলকে হাসে,
আমার পরাণে অসীমের খেলা,
তাই দুখ নাশে, আলোকে ভাসে।
আনন্দভরা প্রেমের নিঝর,
ক'রে দেবে সে কি বাঁধনহারা ?
নিয়ে যাবে মোরে স্বরগদুয়ারে,
ভকতজীবন-আশীষধারা।
অফুরান গান দেবতার হওয়া,
শুদ্ধতা আলো অমৃত খনি,
তাই জাগি শুধু আশীষ আলোকে,
সখা যে বরেছে হৃদয়মণি।

(২০)

শুদ্ধতার জয়

চ'লে যবে যাই, গাহি' জয় জয়,
সমাধি-মৌন-মহিমাপুরে,
থামিবে সেদিন মোহ পরমাদ,—
বিধাতার দান অসীম সুরে !
যত নিন্দা গ্লানি, যত অভিশাপ,
আজ থেমে গেল মরণ-গানে,
উঠিছে বাজিয়া বিজয়ের ভেরী,
ছু'টে চলি নব জীবনের পানে।
থামিল রিপুর যতেক পীড়ন,
থামিল রে আজ যতেক দহন,
দেবতা ডেকেছে, মধুর-লগনে,—
মরণ-বুকেতে পরম শরণ।
অসীম মুকতি দেহের লীলাতে,
ছাই হ'য়ে আজ রয়েছে চাহি,'
রূপ কোথা জাগে অরূপ বীণাতে,—
অভয় নামটি উঠিছে গাহি'।

আনন্দে গায় জাগায়ে লহরী,
বিশ্ব ভুবনে তাঁহারি জয়,
জয়গানে ওড়ে বিজয়-কেতন,—
ধন্য যে আমি হে দয়াময় ।
বিজয়-মাল্য হাসে রে বুকেতে,
মিটে গেল তাই দীনতার খেদ,
তাঁহারি মহান্ ইচ্ছামাঝারে
উঠিছে ফুটিয়া জীবন-বেদ ।
তাই সই আমি যতেক বেদনা,
রিক্ত কাতর দহন-জ্বালা,
তাই বই বুকে শতেক আঘাত,—
আকুল কাঁদন, বিরহ-পালা ।
যে জন গড়েছে ধরণীর বুকে
নিতি নব নব প্রেমের বাসা,
সে কি দেবে ঢেলে মরণ-পাথারে
যত আকাঙ্ক্ষা, যা কিছু আশা ?
উদাস পরাণী, অনিমেষ আঁখি,
জেগে ব'সে আছি হরষ-পুরে ;
তাও কিগো ভুল, দুদিন খেলাতে
সব শেষ হবে ভাঙ্গন সুরে ?

যেদিন মানুষ সত্যের পূজারীর শান্ত মঙ্গলস্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার যোগশুদ্ধ দেহখানিকে শত কণ্টকাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিয়া, কাঁটার মালা পরাইয়া, নরকের দৃশ্য রচনা করিল সংসারে, আর রক্তাক্ত হইয়াও যেদিন ভক্ত হাসিতে হাসিতে ক্ষমার মঙ্গল-মহিমায় সকলের জন্য কল্যাণ-প্রার্থনার ভিতরে দেহমুক্ত হইয়া গেলেন, সেদিনই মানবের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। তখন বিভীষিকার ভ্রূকুটীভঙ্গিমা ক্ষণিক-সুখলিপ্সু অত্যাচারী জনের বুক আকুল করিয়া তুলিল। সেদিন দেবতার সম্মান ও দেবতার পূজার জন্য, শত শত জন অশ্রুজলে আকুল হইয়া বিজন কোণে লুকাইতে চাহিল। তখন তীব্র বেদনার ভিতর কত সন্দেহকুহেলী। তখন মনে করে মানুষ সত্যের এত লাঞ্ছনা কেন? কেন ভগবান্ তাঁহার সন্তানকে বিশ্বের কাছে এমনি করিয়া পীড়িত করেন? বিধাতা কি নাই তবে? একজন ন্যায়বান্ পুরুষ যদি থাকেন, তবে কেন তাঁহার সত্য পূজারীর এ অপমান, পীড়ন? তবে কেন নির্দ্দোষের এই অসহনীয় তাপ ও লাঞ্ছনা? যদি এমন করিয়া ভগবদ্ভক্তেরও রক্তাক্ত হইয়া ফিরিতে হয় সংসারে, তবে কোথায় বিধাতা, কোথায় সত্য বিচার?

এমনি সংশয়-অন্ধকারের ভিতরও কি কথা শুনিল

সকলে ? ঐ দেখ যাঁহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছ, কাঁটার মুকুট পরাইয়াছ, আজ তিনি মৃত্যুকে জয় করিয়া জাগ্রত ! এমনতর আশার কথায় সকলের বুক আনন্দে উৎফুল্ল ! ও কি দেখিল, তখন বলিয়া উঠিল সকলে, এ কি জয়গৌরব, এ কি উজ্জ্বল শোভন সুন্দর ভাগবতী তনু ! ওগো ভক্ত, ওগো দেবতা, কে তুমি ? বুঝেছি শুদ্ধতারই জয়।

অধ্যাত্মজগতে শুদ্ধতা কাহাকে বলে ? এক কথায় এ যে একেবারে সুনির্ম্মল। এখানে বিন্দুমাত্র লুকোচুরি নাই, একেবারে সরল সুন্দর সত্য স্বরূপ। তাইত মনখানিও পুণ্যমহিমায় পুণ্যময়। কোন উত্তেজনা নাই, কোন পরাজয়ের কথাই নাই। তাইত যখন জীবাত্মা শুদ্ধ মুক্ত হইয়া চলেন, তখন তাঁহাকে দৈহিকতা ঐহিকতা স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি দেবভাবের ভিতরই দেবমহিমায় মহিমান্বিত হইয়া যান, সে যে একেবারে সুনির্ম্মল, সুন্দর। সে দেব আত্মার জন্য পরমকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। ইনি যে দিনের পর দিন পরিপূর্ণতার দিকেই চলিয়াছেন, এ শুদ্ধতা যে অবিনাশী—অজয় অমর। কেবল পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতেই পরিণত হইল ! দেহী বিদেহী সকলের কাছেই এ কথা সত্য, এ যে অখণ্ড জগতের নিয়ম. যা কিছু আমার ইন্দ্রিয়জ্ঞানপ্রসূত সবইত পঞ্চভূতজাত। শুদ্ধ কাঞ্চনেরই ত

মূল্য সংসারে। তাহার সে উজ্জ্বল সত্ত্বা শত অগ্নিদাহনেও পরিবর্ত্তিত হয় না। জ্বলিত কাষ্ঠখণ্ডের অবশিষ্ট ভস্মরাশি ত আবার কাষ্ঠেই পরিণত হয় না, অথচ স্বর্ণখণ্ডকে যতই আগুনে দগ্ধ কর, ততই তাহার অগ্নিশুদ্ধ উজ্জ্বল স্বরূপ। তেমনিতর শুদ্ধমনা মানবহৃদয় যতই সংসারের দুঃখ তাপে দগ্ধ হয়, ততই তাঁহার ঐহিক ধন মান ভোগ যাহা কিছুর ভিতর তিনি জড়িত থাকেন, সব কিছু দগ্ধ হইয়া ছাই হইয়া যায়, অথচ তাঁর সুনির্ম্মল সুন্দর শুদ্ধ স্বরূপ সত্ত্বা উজ্জ্বল মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া উঠে।

সকল সংগ্রামের জয়গৌরব শুদ্ধতার ভিতরই। যুগে যুগে সকল ইতিহাস এ কথারই সাক্ষ্য দিতেছে। সেই আদিম যুগে যখন মানুষ সত্য বুঝেনি, কত অসত্যের পথেই চলিয়াছে! অথচ যতই সত্যের বিকাশ, ততই অসত্যের তিরোধান। কোন ভুলই, কোন অসত্যই, স্থায়ী নয়, অথচ যাহা সত্য অবিনাশী মঙ্গলধারা কেমন যুগের পর যুগ প্রকাশিত। ঘন অসত্য-অন্ধকার মোচন করিয়াই সত্যের উজ্জ্বলতর আনন্দপ্রকাশ। মানুষের ঘোর অত্যাচারে দুর্ব্বল ভীত জন হয় ত সত্যের মহিমা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত কিন্তু যে সত্যের পূজারী সে ত ভীত হইল না, সে ত শত অগ্নিদাহনের ভিতরই সত্য বাণী জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়া

গেল, সে ত মৃত্যুকে ভয় করিল না! চিন্তাজগতে তাহার আত্মা মুক্ত, সে ত মানুষের অসত্য অসাধু ভাবকে ঘৃণা করিয়াই গেল! তাই শত মৃত্যুপীড়ন নিষ্পেষণের ভিতরও সত্যের অবিনাশী তেজ চিরদিন জয়গৌরব লাভ করিয়াছে।

যা শুদ্ধ তা-ই সত্য, তা-ই মঙ্গল। জগৎ তার সাক্ষী! যাহা কিছু মঙ্গল তাহার ফলও কল্যাণপ্রদ। যাহা সত্য তা-ই মঙ্গল, তাই আত্মবীণায় প্রকৃতির বুকে মঙ্গলস্থরে সত্যমঙ্গল গান। যাহা অমঙ্গল তাহার জগতের বুকে জয় কোথায়? কত সময় হয়ত আপাত জয়ের মুকুট পরিধান করিয়া অসত্যের ভিতরই মানুষ কত গর্ব্বে, কত দর্পে, চলিয়া যায় কত নির্দ্দোষীর বুক পদদলিত করিয়াই! আবার, কত সময় কত সত্য সেবকের কত লাঞ্ছনা, কত গঞ্জনা! কত বেদনার তীব্র আঘাতেই তাহার পরম পুরস্কার লাভ হইল, কত ভক্তপ্রাণকে অগ্নিদাহনে দগ্ধ করিল! কিন্তু দেখিতে দেখিতে একি হইল তাঁহার শেষ পরিণতি? আগুন দহনের ভিতরই, সেই জ্বলন্ত শ্মশানের বুকেতেই, আবার কেমন সত্য জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল!

তাই আজ লক্ষ লক্ষ প্রাণ যিশুর রক্তপাতের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে, কত রাজমুকুট আজ সে চরণ পূজা করিতেছে! তাই ত ধার্ম্মিক ও জ্ঞানীর পূজা সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে। যদিও

হয়ত তাঁহারা ইহজগতে তেমন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্মান পাইলেন না, তবুও সাধুতারই জয়। সাধুতার পূজা মানুষ চিরদিনই করিয়াছে। এমনি করিয়া দুঃখ বেদনার ভিতর যিনি সত্যের পূজা করিয়া গেলেন, তাঁহার সকল দুঃখের সার্থকতাও ঐখানেই—সাধুতাই সকল পরীক্ষার পুরস্কার। সকল অবিচার নিন্দা কলঙ্কে তাঁহার ভয় নাই। তিনি যে সত্য সেবক হইয়া সাধু ইচ্ছা ভগবদিচ্ছা পালন করিয়া গেলেন, এতেই ত আনন্দ। কি হইবে তাঁহার লোকের নিন্দা লাঞ্ছনায়? তাঁহারা জগতে প্রতারিত হইলেও আত্মপ্রতারিত হন্ না, তাঁদের বিবেক উজ্জ্বল, শুদ্ধ জ্যোতির্মণ্ডিত স্বরূপ, তাই ত শত অপমানের দৈন্যের ভিতরও শুদ্ধতার জয়।

এমনি করিয়া যখন মানুষ অসীম বিশ্বাসে ভগবদ্ভক্তের শুদ্ধ স্বরূপ দর্শন করে, তখন সেও তার দুর্ব্বল জীবনেও আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল হয়, সত্য পথে চলিতে সাহসী হয়। তখন সত্যের জন্য এমন দুঃখ নাই যাহা সে সহ্য করিতে পারে না, এমন ত্যাগ নাই, যাহা স্বীকার করিতে পারে না।

ধন্য হে সত্য পূজারী, ধন্য তাঁর সে দেবস্বরূপ। মানবের দুর্দ্দিনে এ কি আলো জ্বালিলেন, সত্যের পথে মঙ্গলের এ কি মাভৈঃ বাণী শোনাইলেন! তাই ত আশার কথা, তাই ত সততার জয়, শুদ্ধতার জয়।

যুগে যুগে বহু বহু সত্য পূজারী আসুন, আমাদের সত্য দীক্ষায় সহায় হউন। আমার দুঃখ দৈন্যে, নিঃসঙ্গ যাত্রাপথে, বল দিন, আমার জীবনসংগ্রামে আশার আলো জ্বালাইয়া আসুন, বলুন্ ভাল করিয়া শুদ্ধতার সততার জয় হইবেই হইবে। অশুদ্ধতারই বিনাশ—তাই ত বলিয়াছেন সত্যসেবকদল, ওগো দুঃখী তাপী যা কিছু অপবিত্রতা সব কিছু হইতে সরিয়া দাঁড়াও, ঐ শোন ভগদ্বাণী, ঐ দেখ প্রকৃতির বুকে সত্য আলো, ঐ দেখ মানব-জীবনের সকল উত্থান পতনে সত্যেরই জয়, শুদ্ধতারই জয়।

ওগো শুদ্ধ হও, সত্য হও, ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিতে পারিলে না বলিয়া আর ক্ষোভ করিও না। সংসারে সম্মান পাইলে না বলিয়া আর মুহ্যমান হইতেছ কেন? যাহা সৎ, যাহা ধর্ম্ম, তাহাই করিয়া যাও, কোন কিছুর প্রতিদান আশা করিও না। যদি সুখের আশা কর, তাহা হইলে তোমার সুনির্ম্মল শুদ্ধ জীবন-লাভ হইবে না। সকল দুঃখ ভুলিয়া যাও; ওরে অবোধ মন, ভালবাসা পাইবে বলিয়া কাহাকেও ভালবাসিও না। তোমার সর্ব্বস্বদান ব্যর্থ হইল বলিয়া আর কেন ক্লিষ্ট হও? কেবল সত্যপথে চল, বিবেকের শুদ্ধ স্বরূপের ভিতর জাগিয়া থাক, তবেই ত তোমার সকল দৈন্য দূরে

যাইবে, তবেই ত অগ্নিশুদ্ধ উজ্জ্বল কাঞ্চনজ্যোতি লাভ হইবে।

ভক্ত প্রেমিক বলিয়া গেলেন, যিনি তোমাকে দুঃখ দিলেন তাঁহাকে স্নেহালিঙ্গন দান কর, অভাবগ্রস্তের অভাব যতটুকু পার দূর কর। যে তোমায় দুঃখ দিয়াছে, তুমি তাহার দুর্দ্দিনে বিমুখ হইও না। ওগো, প্রতিশোধ লইতে হইবে বলিয়া কাহাকেও রোগে শোকে উপেক্ষা করিও না। এমনি করিয়া নির্ব্বিচারে যদি সত্যব্রত পালন করিতে পার, তবে আর তোমার দুঃখ থাকিবে না। তবে প্রতি কর্ম্মসাধনার ভিতর কি শুভ্র মধুরজ্যোতি, সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবে। তখনই তোমার মঙ্গললোকে শুভযাত্রা। তাই ত রক্তাক্ত হইয়াও শুদ্ধতার সাধনা। যে হারিয়া গেল, তাহার যে সবই ব্যর্থতার দৈন্যে দীন হীন। যে ভগবদ্‌বলে বলীয়ান হইয়া সংগ্রাম করিতে পারিল না, সংসারে সে দুঃখ দৈন্যের ঝঞ্ঝায় ত্রস্ত বিধ্বস্ত হইয়া বিনাশের পথে ছুটিয়া ত যাবেই।

সকল মানুষই মানুষের মনের দৃঢ়তা ও বিবেকের সত্য বাণীর সম্মান করে। যে অতি বড় দুর্জ্জন, সেও সত্যনিষ্ঠ সাধু ভক্তের আজীবন সত্যব্রতপালন যখন দেখে, তখন সেও চমকিয়া ওঠে। যে মানুষ সংশয়-দোলায় এ-দিক্ ও-দিক্ ফেরে,—আজ সত্যের পথে কাল আবার অসত্যের পথে,

আজ ধর্ম্মপালন কাল অধর্ম্মের পথে—এমন মানুষ কি করিয়া মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিবে? তাহাদের জীবন ত তেমন শুদ্ধতায় সুপ্রতিষ্ঠিত নয়! হায়! হায়! অভাগা মানুষ পারিল না তাহার ক্ষণিক লালসার উর্দ্ধে উঠিতে, তাই সংশয়-দোলায় দুলে দুলেই—একবার সুপথে আবার বিপথে, এমনি ভাবেই—দিন কেটে যায়। তাই ত হইল না শুভ সাধনা, হইল না শুদ্ধ জীবন লাভ।

মনে রাখিও নির্ম্মল সত্য পুণ্যময় জীবনেরই জয় সংসারে। মনে রাখিও ভক্তজীবন, মনে রাখিও ভগবৎপ্রেম, জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, মনে রাখিও সর্ব্বস্বত্যাগ মনে রাখিও কঠোর সংযম, মনে রাখিও দৃঢ় নিষ্ঠা, সত্যসাধনা। সুদিনে যখন আনন্দকানন হাসিয়া ওঠে চারিদিকে, তখন তোমার শক্তির পরিচয় হয় না; কিন্তু যেদিন ঝড় ঝঞ্ঝা নামিয়া আসে, যেদিন অন্ধকার, সেদিনই সত্য পরীক্ষা, সেদিনই ধর্ম্মের অগ্নি-দীক্ষা।

সেই ঘন অন্ধকারে যিনি বিশ্বমঙ্গল-দেবতাকে ধ্রুবতারা করিয়াছেন, অন্ধকারেও তিনি ত পথ হারাইবেন না—তাঁহার গম্য পথে ছুটিয়া যাইবেনই যাইবেন। যিনি সঙ্কল্প করিয়াছেন বাক্যে মনে ব্যবহারে সত্য হইবেন, নির্ম্মল হইবেন, তখনই তাঁহার সংগ্রাম-সাজ। যদি সত্যসাধনে সে বীরত্ব

ও ধীরত্ব না থাকে, তবে কেমন করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে ? যে মানুষ সত্য হইবে মনে করে, তাহার সকল প্রকার নিন্দা উপহাস উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে, তখন জগতের নিন্দা প্রশংসার অতীত হইতে হইবে, তখন সকল স্বার্থসম্ভোগ বলিদান দিতে হইবে, তখন সকল ভোগের পিপাসা ভুলিতে হইবে, তখন সকল মানুষের অভিশাপ, সকল মানুষের ঘাত প্রতিঘাত বুক পাতিয়া লইতেই হইবে, তখন সকল দুঃখ মাথার ভূষণ করিতেই হইবে। তবেই ত সকল দুঃখের পুরস্কার হইবে পুণ্যসম্ভোগে। যদি আজীবন সত্য পূজারী হইয়া চলিতে পার, যদি শুদ্ধ প্রীতি ভক্তিতে নম্র ও নিষ্ঠাসাধনে যত্নবান হও, যদি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সত্যের জয়গান গাহিতে পার, যদি সকল উত্তেজনা জয় করিতে পার, তাহা হইলে আর ভয় নাই। মঙ্গলময় শুদ্ধ সুন্দর, চির সত্য, ধ্রুব সত্য। তিনিই বরণীয়, ভজনীয়, তবে কেন দুঃখ সংসারে দৈন্যপীড়নে ? আসুক দুঃখ বেদনা, ভয় নাই, দেবতা আছেন সঙ্গে, পুণ্যময় চির নবীন সুন্দর।

এক এক সময় ঘন ঝঞ্ঝা ঝাপটে পথ খুঁজিয়া পাই না, তবু বুকে বল চাই। আছেন হৃদয়ের দেবতা হৃদয়ে, সে অন্ধকারেও ওঠ, জাগ্রত হও ; আছেন জাগ্রত ভগবান চির সঙ্গী, চির বন্ধু, তাঁহাকেই বুকে চাপিয়া ধর। পরাজিত হব,

তবুও ভাঙ্গিয়া পড়িব না, হারাইব না পথের সম্বল। সকল প্রশংসা গৌরব হইতে বঞ্চিত হইলাম, তবুও ভয় নাই। সংসারে দুদিনের প্রশংসা ধনজন লাভে কি হইবে? অথচ এ কি দেব-আশীর্ব্বাদ ক্ষুদ্র মানবজীবনে! সব হারাইলাম, তবু অমৃতলাভে ত বঞ্চিত হইলাম না! তাই বলি, ধৈর্য্য ধর, বিশ্বাসীর মত সত্যের পথে ন্যায়ের পথে, অগ্রসর হও। যাহা পার্থিব তাহা ত দেহের সঙ্গেই ধূলিসাৎ হইবে। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, সত্য কখনও বিনষ্ট হইবে না। ওগো সত্যের পূজারী! তুমি হয়ত হারিয়া যাইতে পার জীবন-সংগ্রামে, কিন্তু সত্য কখনও হারাইবে না। সত্যের জয় হইবেই হইবে। তাই ত ভক্ত প্রাণ মৃত্যুর ভিতরই অমৃত হইয়া আসিয়াছেন। তাই ত তাঁদের বদন-কমলে স্বর্গের আনন্দবিভা। তাই ত তাঁহাদের মঙ্গলসমাধি পুণ্যের বিজয়-মহিমা কীর্ত্তন করে। তাই ত মানবজীবনে সকল দুঃখ তাপের ভিতরই দেবপূজা, সত্য সাধনা, পুণ্য তপস্যা।

ভাবুক আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, প্রতিবাসী আমাকে ক্ষুদ্র দীন হীন। ভাবুক আমাকে পার্থিব গৌরবহীন, সুখ-আনন্দ-বঞ্চিত দুর্ভাগ্য জীবন, তবু সত্য পথে চল, নীরবে পুণ্যসঞ্চয় কর, কাহারও কিছু আসিয়া যাইবে না। সত্যের বীজাণু, পুণ্যের বীজাণু কখনও ধ্বংস হইবে না। একদিন

জগতের বুকে তার অখণ্ড শক্তি জাগ্রত হইবেই হইবে। তোমার আমার উত্থান পতনে কাহার কি আসিয়া যায়? কাহারও কিছু আসিয়া যাইবে না। কিন্তু তোমার আমার ব্যক্তিগত জীবন যে বড় দীন হীন হইয়া যাইবে, ছোট হইয়া যাইবে, যদি না পার সত্য পথে চলিতে। তাই বলি বলীয়ান্ হও, সংগ্রামসাজে সজ্জিত হও, সত্যসাধনে, শুদ্ধতার আলোকে জীবাত্মার নব জ্যোতিলাভ হউক্। সকল দুঃখ বন্ধনের পরীক্ষা সার্থক হউক্, ধন্য হউক্ এ ক্রন্দন। ধন্য হউক এ নীরস প্রতীক্ষা, কঠোর প্রতীক্ষা—সত্যের জয়, পুণ্যের জয়, ধর্ম্মের জয়। তাই বলি, ওগো শুদ্ধ সুন্দর, পবিত্র কর, নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর। দাও হৃদয়ে সে বল, তেজ —যাহাতে সকল কিছুর অতীত হইয়া যাই। সকল বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া ছুটিয়া চলি শুদ্ধ সুনির্ম্মল লোকে। আমার বুকের ঘরেই সকল কিছুর পুরস্কার। বুকে হাত দিয়া যেন বলিতে পারি, ওগো শুদ্ধ সুন্দর হৃদয়মণি, এ হৃদয়ে বাস কর—এ যে দেবতার আসন, শুদ্ধ উজ্জ্বল জ্যোতিঃ সমুদ্ভাসিত হৃদয়। আর কি চাই? শুদ্ধতার জয় হউক্।

(২৮)

আত্মজ্ঞানেই অমৃত-যোগ

ফুরিয়ে এল রূপের খেলা,
ঘণ্টা বাজে অই,
এবার আমি উঠ্‌ব জেগে
সখার বুকে রই।
ভবের খেলা পাগল দোলা
ক্ষণিক মোহ দোল,
মুক্ত হ'য়ে গাইব আজ,
বোল হরি বোল।
পাপের কথা ফুরিয়ে গেল
দেহের সাথেই লয়,
বিদায় দিনে অশ্রুধারা
আপনা মনেই বয়।
ধূলির দেহ ধূলায় গেছে,
সবার সাথে জাগি,
তারই মাঝে বুক ভরেছে
আপন ঘরের লাগি'।

———•———

চোখের পরে স'রে গেল
যবনিকা কার,
তারই সাথে নাম্‌ছে বুকে
মন্দাকিনী ধার।
তারই সাথে খুলে গেল
যত মোহ ঘোর ;
তারই সাথে নিন্দা গ্লানি
উধাও হোল মোর
লুকিয়ে ছিল যতেক কিছু
দেহের খেলা ঘরে,
জীবন-কমল উঠ্‌ল ফুটে
নব জীবন বরে।
মুক্তপাখী চিদাকাশে
আনন্দেতে ধায়,
উঠ্‌ছে জেগে প্রেম আলোকে
শান্তি মহিমায়।

সীমার বুকে ওগো বঁধু,
এমন দোলা দোল !

ক্ষুদ্র আমি, কেন তবে

এত মহা রোল ?

খুঁজে মরি দিনরজনী

কিসের তরে হায়,

মনগোপনে অমর ধামে

মিল্‌তে সেথা চায়।

জানি সখা, নেবে মোরে

নিত্য চেতন পুরে,

অমৃত নাম উঠ্‌ল বেজে

সকল সুরে সুরে

তোমার মাঝে আমার জাগা,

তাইত নেবে ঘরে,

হেসে কেঁদেই আছি জেগে,

নিত্য মিলন তরে।

নাইক শেষ আদি অন্ত

তোমার করুণ-ধারা

তারই মাঝে নিত্যদোলা,

চিত্ত পাগল পারা।

কে গাইবে, তোমার সখা,
নিত্য পূজার গান ?
দেবলোকে জয়ধ্বনি
আনন্দেরই দান।
দীনের ভাষা হার মেনেছে
দানের মহিমায়
তোমার আলো হাস্‌ছে বুকে
স্বরগ সুষমায়।
চন্দ্র সূর্য্য তারার আলো
হাসে আলোক পাতে,
জ্যোতির্ম্ময় প্রাণ ব্রহ্মে
অমর সভা মাতে।

এক একটী বৎসর এক একটী ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তেরই সমাবেশ। যাহাকে সপ্তাহ বলি, মাস বলি, বৎসর বলি, তাহার ত ঐ মুহূর্ত্তেরই ভিতর অস্তিত্ব। অনন্ত কালের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনের কালস্রোত দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে।

দিন চলিতেছে দ্রুত গতিতে, এই এক দিন, এই আর একদিন, তার পর আর একদিন এইরূপে চলিয়াছে।

• যাহা কিছু দেখি কেবলই পরিবর্ত্তন, অথচ তাহার যে

প্রাণসত্তা তাহা ত স্থিরই আছে। হাজার হাজার বৎসর যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। যাহা পরিবর্ত্তনশীল তাহারও প্রাণসত্তা অপরিবর্ত্তনেই অনুপ্রাণিত। যাহা কেবলই চঞ্চল গতিশীল প্রকাশ, তাহারও স্থিতির ভিতরই প্রাণপ্রতিষ্ঠা। আমি কালকে মুহূর্ত্ত, সপ্তাহ, মাস নামাঙ্কিত করি। ইহা ত মানবীয় জ্ঞানেরই বিভিন্ন সত্তাদান। বাস্তবিক এ কাল যে অনন্ত অখণ্ড কাল। এই যে ঋতুর পরিবর্ত্তন, ইহা ত এই সৌরমণ্ডলের বিচিত্র গতিরই বিচিত্র প্রকাশ—কাল ত অখণ্ড অপরিবর্ত্তনীয়।

বস্তুর যত কিছু বিভিন্ন স্বরূপ, সবই কার্য্যকারণ সাপেক্ষ, এক বিশ্বে সবই এক মণিহারসূত্রে গ্রথিত। দুই বিভিন্ন ব্যবস্থা নাই, বিভিন্ন সত্তাও নাই। একমেবাদ্বিতীয়ম্ সেই এক ভূমা জ্ঞানের ভিতরই সকলের স্থিতি। বিভিন্ন সত্তা স্বরূপের ভিতরই এক প্রাণসূত্র। সব একেরই অংশ, সব কিছু স্রষ্টা পাতা বিধাতা সেই এক পুরুষ মহানেরই বিচিত্র ছবি। আবার প্রত্যেক বস্তু অবিনাশী ভাবে পরস্পরে যোগযুক্ত! কালও অনন্ত যখন, তখন এক কালেই স্থিত দুটী জগৎসত্তার স্থায়িত্ব সম্ভাবনা কেমন করিয়া হইবে?

আজ যে আনন্দ সম্ভোগ, কাল তাহাতে বিভিন্ন ভাব কেমন করিয়া হইবে? এক কালেই সব আবদ্ধ, কেবল

রজনীর ঘন অন্ধকার মধ্যে বইত নয়। যখন শরতে বৃক্ষ লতাদির নব পত্র জীর্ণ হইয়া ঝরিয়া যায়, আর নব বসন্তাগমে সব ফল ফুলে বিকসিত হইয়া উঠে, তখনই কি নব জগতের সৃষ্টি হইল বলিবে? যাহা ছিল তাহাই আছে ও থাকিবে। একই প্রাণসত্তার নব নব বিচিত্র প্রকাশ। যখন বৃক্ষলতার পত্র জীর্ণ হইয়া যায়, যখন ধূলিরাশি দিক্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়ে, তখন কি বলিবে, যাহার অণু পরমাণু এই জগৎ বুকেই সৃষ্ট হইয়াছে, অথচ আজ ধূলিতে পরিণত হইয়া সে চির বিনাশের পথে চলিয়া গেল? বৃক্ষরূপে অণু পরমাণুর সমাবেশে হউক, কি ধূলিরূপে ঐ সূর্য্যকিরণ রেখার ভিতরই প্রকাশিত হউক, সবই আছে, সবই অবিনাশী। জগৎবুকে তাহার অস্তিত্ব কে লোপ করিবে? যে প্রাণসত্তা সব কিছুর অন্তরালে আছেন, সেই মহামহিমায় ধূলিরাশি কখনও নব-শ্যাম দূর্ব্বাদলে, কখনও ফল ফুলে ফুটিয়া উঠে, আবার বীজে পরিণত হয়, তাহার প্রাণসত্তা—শীতেও নয়, গ্রীষ্মেও নয়। বসন্তাগমে রবিকর স্রষ্টার বিচিত্র বিধানে সব কিছু সত্তার ভিতর তাহার জীবনশক্তি সঞ্চার করে, আর নব নব বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, নব পল্লবে ফল ফুলে নব নব মঞ্জরীর ভিতর বিকসিত হইয়া উঠে। সবই সেই এক পুরাতনের প্রাণের খেলা, অথচ সবই চির নবীন সুন্দর।

আমাদের দৃশ্য জগতে সব বিভিন্ন স্বরূপ, অথচ সব একেরই জাগ্রত প্রকাশ।

জগতে কিছু নূতন নাই, অথচ কিছু পুরাতনও নাই, কিছুর বিনাশও নাই। যাহাকে আমরা নূতন পুরাতন বলি, সে আমাদেরই জ্ঞানানুভূতির ব্যবহারিক প্রকাশ কেবল পরস্পরের বিভিন্ন সম্বন্ধেরই পরিবর্ত্তন। এত ক্ষণস্থায়ী। এক একটী মহাদেশ—কত জীবলোকের বসতি—কালে যাহাকে ধ্বংস হইয়াছে বলি, ধূলায় পরিণত হইয়াছে বলি, তাহাও ত সেই একেই স্থিত! ফুলের অণু পরমাণুই হউক, আর মহাদেশের অণু পরমাণুই হউক, সবই বিশ্ববুকে রচিত ও বিশ্ববুকেই স্থিত। বিশ্বময়ের বিশ্ববুকে যাহার স্থিতি তাহার কোথায় গতি সম্ভব? এ কেবল পরস্পর যোগাযোগের বিশেষ সম্বন্ধের ভিতর বিভিন্ন অস্তিত্ব।

একটী ক্ষুদ্র পুষ্প আর ঐ মহাদেশ—একটী আমাদের কাছে কত ক্ষুদ্র, আর একটী কত বিরাট্ মনে হয়; কিন্তু অনন্ত ভূমা মহানের অনন্ত বিরাট্ সত্তার ভিতর তাহার কতটুকু স্থান? মরজগতে অতি ক্ষুদ্র প্রাণীই হউক বা মহা-পরাক্রমশালী জীবই হইক, সবই তাঁহার সৃষ্ট জীব।

যাহা আমার সসীমদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহাই যেন একমাত্র সত্য মনে না করি এমন ভুল যেন না

করি। আমরা ভেদাভেদ রচনা করি, যাহা আমাদের কাছে অদৃশ্য, যাহা এই পৃথিবীতে ধারণা করিতে পারিনা, মনে করি বুঝি তাহার আর অস্তিত্ব নাই। যে সব অণু পরমাণু অদৃশ্য হইয়া আছে, তাহারই সংযোগে বিয়োগে আবার বিভিন্ন বস্তু সত্তা জাগিয়া উঠে। বাতাসে জলীয় বাষ্প, আবার বাতাস ও বৃক্ষ লতার আদান প্রদানের ভিতর সমস্ত জীবজগৎ তাহার প্রাণের উপাদান গ্রহণ করিতেছে। তাই ত সমুদ্র, বিটপী কানন সবই আলো ও বাতাসের সন্তান, আবার সবই ঐ আলোতে বাতাসে মিশাইয়া যাইবে, সবই এক।

একমেবাদ্বিতীয়ম্—সবই এমন পরস্পরে গ্রথিত যে পরস্পরকে বাদ দিয়া কেবল একটীর ধারা আমরা বুঝিতে পারি না। অনন্ত বিশ্বে কোনও আজও নাই, কালও নাই, —এ কেবল মরণধর্ম্মশীল মানুষের কথা। আমরা এই পৃথিবী গ্রহে আলো ছায়া শীত গ্রীষ্মের ভিতর ছুটিয়া চলি, আর তাহাকে কখনও শীত, কখনও গ্রীষ্ম বসন্ত, কখনও দিন রজনী, কত কিছু নামাঙ্কিত করি। অনন্তবুকে আদিও নাই, অন্তও নাই—কেবল কার্য্যকারণ যোগাযোগের সম্বন্ধ। তাহাকেই আমরা জীবন বলি, কিন্তু সবই সেই একেই প্রতিষ্ঠিত। সবই যেন এক জালে বোনা! কোন অংশের কোন সম্বন্ধ হয়ত থামিয়া যাইতে পারে, কিন্তু সকল সত্তার যে

প্রাণশক্তি তাহার কখনও ধ্বংস হইবে না। যাহার আদি আছে অন্ত আছে মনে করি, যাহার জন্ম আছে আবার মৃত্যু আছে ভাবি, যাহার শৈশব আছে আবার জরা আছে দেখি—এ সবই বিশ্ববুকে বিচিত্র সম্বন্ধেরই ভিতর স্রষ্টার বিচিত্র লীলা।

জগতে এক অমৃতময় দেবতা, আমি মরণান্তেও সে বুকে, এখনও সেই বুকে। আমি মরণান্তেও তাঁহার হইব, এবং এখনও আমার এ মরজীবনেরও মালিক বিধাতা সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্।

যেদিন মরণসখার আনন্দ ঘণ্টা বাজিয়া যাইবে, যেদিন দেহের অণু পরমাণু বিশ্লিষ্ট হইয়া ধূলায় ও ভস্মে দেহ পরিণত হইবে, সেদিনও বিচিত্র সত্তার ভিতরই তাঁহার বুকে নবরূপে জাগিয়া থাকিব। আর চেতনময়ী বিদেহী আমি, অমৃতময়েই আমার চৈতন্য, আমিও অনন্ত জাগরণে জাগিয়া থাকিব।

আজ আমার যে প্রকাশ কাল নব বস্ত্র ধারণে কি তাহা অন্যরূপ হইবে? না গো না, যে আমি এই মরণ ধর্ম্মশীল দেহের ঘরে, সেই আমি মৃত্যুর পরপারে বিদেহীসত্তার ভিতর নন্দন সাজেও জাগ্রত। দেহধর্ম্ম ত আত্মাকে স্পর্শ করে না। এই ক্ষণিক লীলা যাহাকে আমরা পার্থিব জীবন

বলি, সেই আমি এই উন্নত লোকে। যোগ্যতানুসারে পাপ-পুণ্য কর্ম্মফল অনুসারে সুখদুঃখের স্থান লাভ হয়। তাইত ভক্ত বলিয়াছেন, ধর্ম্মই একমাত্র মৃত্যুর পরও অনুগামী হন।

ধন্য তাঁহারা যাঁহারা ভগবদ্‌সত্তায় জীবিত, ধন্য সে আত্মা, তাঁহার সকল পরিশ্রম সার্থক—তাঁহার ধর্ম্ম কর্ম্ম আজ তাঁহাকে কোন্ সুখময় অনুভূতি দান করিবে কে জানে? কাল-প্রবাহ ত নিত্য সত্তাতেই অখণ্ড যোগযুক্ত। সমস্ত বিশ্ব চরাচর একেই প্রকাশিত, আমিও সেই একের মহামহিমাময় বুকেই বাস করি। কাজেই আমার অনন্ত জীবন।

কাল ও অনন্ত সত্তা একই সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, কাজেই আমাদের যত কিছু কর্ম্ম সাধনা, কালপ্রবাহ সবই প্রাণসূত্রে গ্রথিত। সমস্তরেই প্রকাশ কালের বুকে। এই আমার জাগরণ এ ত অনন্ত জাগরণ। এই বিশ্ববুকে বাস করিয়াই অনন্তের প্রজা। পিতার গৃহে বসতি, ক্ষুদ্র আমি, আমারও মহানেই জন্ম, আমি অনন্তের ভিতর জাগ্রত। কে আমার সত্তা অস্বীকার করিবে? এ অখণ্ড যোগতত্ত্ব, এ আত্মজ্ঞান পরিপূর্ণ মঙ্গলেই সুপরিস্ফুট। যদি আমি বিনাশের পথে যাই, তবে অনন্ত কাল প্রবাহেরই বা অস্তিত্ব কোথায়? একমেবাদ্বিতীয়ম্ তাঁহারই অখণ্ড বিধানে বিশ্বপ্রকাশে ভূমার ভিতরই ক্ষুদ্রের প্রকাশ, অথচ অনন্তে তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

আজ যিনি আমার জীবন দেবতা, তিনি অনন্তকালের দেবতা, এ অনন্ত বন্ধন ডোর কে ছিন্ন করে ?

ধন্য ভগবদ্‌ভক্ত যিনি ভগবদ্‌মহিমায় অণুপ্রাণিত। যাঁহার ধর্ম্ম কর্ম্ম তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত, অনন্তকাল তাঁহার সে মঙ্গল কর্ম্মসাধনা অনন্তের পথেই লইয়া যাইবে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, যদি কিছু মহত্তর কর্ম্মের উদ্বোধন হইয়া থাকে সংসারে, আমাকে তেমনি উচ্চতর পদবী দান করিবে।

কত মানুষ পাশবিক বৃত্তির ভিতরেই চরিতার্থতা লাভ করিতে চাহে, যত ধর্ম্মভাব, যত কিছু আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তাহারা উপেক্ষাভরে অগ্রাহ্য করিয়াই হয়ত চলে। এ জগতে যতদিন থাক খাও দাও, উচ্চ প্রাসাদে আনন্দ আরাম লাভ কর, ধনৈশ্বর্য্য সুখসম্ভোগ দৈহিকতার চরম সুখ সম্ভোগ কর, আর কি চাই? যদি বল আত্মোৎসর্গের কথা, যদি বল সত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনের কথা, তাহা হইলেই হয়ত বলিবে, ও কি বাতুলের কথা! এমনি করিয়া আত্মার পরম অস্তিত্বের কথা ভুলিয়া যায় মানুষ, দৈহিকতা সাংসারিকতাকেই মানুষ জীবনের পরম গৌরবের ধন মনে করে! ইহারই নাম কি আত্মবিকাশ ?

ওগো ধনজনগর্ব্বিত মানুষ! বুকে হাত দিয়া বল ত তৃপ্ত হইয়াছ কিনা কেবলই অসার তরল আমোদ প্রমোদে ? হয়ত

কেহ বলিবেন এ ধর্ম্ম কর্ম্ম দেবসাধন, এ সমস্ত মনগড়া কথা। এ পার্থিব জীবনে যাহা আমার প্রয়োজনীয়, যাহাতে আমার সুখ সুবিধা তাহারই সত্য মূল্য, যাহা আমার সাংসারিক ক্ষতি ও পীড়ার কাবণ তাহাই বর্জ্জনীয়। এমনি করিয়া সাংসারিক লাভ ক্ষতির ভিতরই তাহাদের ভাল মন্দ। তবুও ত একদিন আসে সেদিন সকলেই বুঝে, এই এত পরিবর্ত্তন, এত জাতির সংঘটন, যত কিছুর ভিতর এক অবিনাশী সত্য নিহিত আছে। সকল শাস্ত্রে সকল ধর্ম্মে সত্যের মহিমা ঘোষণা করিতেছে, সকল দেশে সকল কালে সাধুপূজা চিরদিন হইয়া আসিতেছে। যুগ যুগান্তর ধরিয়া এই একই সততার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা। ধর্ম্মভাব সাধুতা চিরদিন এই দেহের ঘরেই অনুপ্রাণিত হইয়া আছে। যেমন অনাহারে দেহের পতন অবশ্যম্ভাবী, তেমনই অসাধুতার ভিতরই জীবাত্মার পতন।

যদি সাধুতার কোন মূল্যই নাই সংসারে, যদি সাধুভাব জীবনে কেবল আকস্মিক ব্যাপার, তাহা হইলে মানব-ইতিহাসে চিরদিন মানুষের কেন অন্যায় অধর্ম্ম অমঙ্গলকে এত ভয় ও এত ঘৃণা? তবে কেন মানুষ কুকাজ অধর্ম্ম অন্যায় এত গোপনে গোপনে সম্পন্ন করে?

সাধুতাই জীবাত্মার প্রাণ। যে বুঝিল না সে অপরিপূর্ণতার ভিতরই চলিয়া গেল। মানুষ দেহী হইয়াও

দৈহিকতার ঊর্দ্ধে শাশ্বত-লোকে অগ্রসর। তাই ত তাহার দেবত্ব, তাই ত তাহার অমরত্ব, পশুভাবের ঊর্দ্ধে দেবভাব লাভ করে। যত বড়ই জ্ঞানী গুনী হও না কেন, কর্ম্ম চতুরতা লাভ কর না কেন, সাধুতা ও সততা ভিন্ন সবই ব্যর্থ। দেহধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সব দৈহিকতা শেষ হইবে, কিন্তু সাধুতা ও সততা দেহের পরপারে অনন্তকালের সহায় ও সম্বল। যিনি জীবনে পরম ইচ্ছার ভিতর আপনার ইচ্ছা উৎসর্গ করিয়া গেলেন, তাঁহার সার্থকতা হয়ত ঐহিকতার ভিতর লাভ হইল না, কিন্তু তিনি জানেন আত্মলোকে সে আত্মোৎসর্গের কি অক্ষয় আনন্দ শান্তি আরাম তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আত্মার প্রাণ ধর্ম্ম—ধর্ম্ম সাধুতায়। সাধুতাই ঐহিকতার ঊর্দ্ধে নিত্য সত্ত্বা দান করে। দেবতার আনন্দ বুকেই সাধুতার জন্ম। পৃথিবীতে পার্থিব পদার্থেই পৃথিবীর মানুষের পুরস্কার। কিন্তু সাধুতা ঐহিকতার অতীত নিত্য শাশ্বতের অধিকারী। ভগবদ্‌ভক্তগণ তাই সাংসারিক সুখের জন্য লালায়িত নন, তাঁহারা ভগবদ্‌মহিমাতে অনুপ্রাণিত, তাঁহাতেই সমাহিত। এ অনন্তকাল অনন্ত জীবন তাঁহারই মঙ্গল বিধান। ধন্য তিনি আমাদের ক্ষুদ্র বুকে তাঁহার অসীমের আনন্দ আলো জ্বালাইয়া আসিয়াছেন।

(২২)

মৃত্যুর পরপারের গৌরব মহিমা

আমার জীবন দেবতার ধন,

আমার এ আমি তাঁহারি দান.

ধূসর ধূলিতে পুলক প্রবাহ

অসীমে গাহিছে মহিমা-গান।

অঙ্গে অঙ্গে জ্যোতির লহরী

ঢালিছে অমর জীবন ভাতি,

তাহারি গরবে গেয়ে উঠি তাই,

দেবতার জ্যোতি মাখি' দিবা রাতি

মৃত্যু মলিন হিমের জড়তা,

কেমনে ছাইবে চেতন বুকেতে,

কে ডাকে আমারে মরণের পারে

ছুটেছি অরূপে শান্তি সুখেতে।

তোমার করুণা আশীষ মাঝারে

আমি হে একটি জ্যোতির বিন্দু,

তোমার বুকেতে হাসি আমি বঁধু,

চেতন-হসিত কনক ইন্দু।

ওগো প্রাণসখা, তোমার বরেতে
জেগে আছি সুখে, নাহি কিছু ভয় ;
তোমারি আলোক জ্যোতির প্রকাশে
সব গেল চ'লে, সবই হোল লয়।
এস সবে আজি সখার নামেতে,
যে জন মেরেছ শত দুখ-বাণ,
আজ ধূলি ছেড়ে দেখরে কোথায়
স্বরগেতে বাস দেবতার মান।
বিজয়-সঙ্গীত উঠেছে ভরিয়া
থেমেছে মরণ-মোহের খেলা,
ত্রিভুবন-পতি, করি গো প্রণতি,
ধন্য তোমারি মহিমা মেলা।
দেবলোকে যত স্বরগের বালা
ধরেছে পুলকে মোহন তান,
জয় জয় বঁধু, তোমারি হে জয়,
তোমারি করুণা মহিমা-গান।

ইহ পরলোকের প্রজা আমি। কেবল এই রূপের দেশেই ত আমার খেলা নয় ; আমার যে আর এক উন্নততর লোকের সঙ্গে অক্ষয় যোগ। তাইত ক্ষণে ক্ষণে সীমার বুকে বাস করিয়াও অসীমে উধাও হইয়া যাই। তাই ত অনন্তের

পিপাসা, তাই ত মৃত্যুও আমার প্রিয়ধনদের কাড়িয়া লইতে পারিল না। বুকের ঘরে তাঁহারা চিরজাগ্রত হইয়া রহিলেন ; দেহ চলিয়া যাইল, তবুও যোগ ফুরাইল না। দেহাতীত শুদ্ধ আত্মা এখনও আত্মপুরে বাস করেন, এখনও নীরব আদান প্রদান বাক্যহীন বাণী। যে বুকে প্রেমময়ের প্রেমলীলা, কে তাহাকে বিনাশ করে ?

জানি না আমি কোথায় চলিয়াছি মৃত্যুর পরপারে। তবু জানি আমার ভাগ্যবিধাতা আমার বুকে অমৃত বীণা বাজাইয়া আসিয়াছেন ; তাই ত সকল সুরে সুরে অমৃত গান মেশামেশি হইয়া আছে, তাইত আনন্দ আশ্বাসে জাগিয়া থাকি, তাই ত ভাগবতী তনুখানির জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ পূজা করি।

দেহান্তে ও কি দিব্য স্বরূপ লাভ! জানি না ত সে তেজোময় স্বরূপ, তবুও বুঝিয়াছি আত্মার অমরত্ব লাভ। দেহাতীত শাশ্বত স্বরূপ চেতনাময় আত্মসুন্দর, ধ্রুব সত্তা অনন্ত অমর জীবন। যাহা পার্থিব তাহা পৃথিবী-বুকেই নব নব রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, আর দেবস্বরূপ তাহার অখণ্ড অস্তিত্ব, উন্নত হইতে উন্নততর লোকেই ছুটিয়া চলিবে।

মৃত্যু যেন সুষুপ্তির আভাস মাত্র! মৃত্যুর আনন্দ আবেশে সকল বহির্মুখীনতা শান্ত হইয়া আসে, ভিতরে

জ্ঞানালোকে জ্যোতির্ম্ময় ধামের নিত্য সত্তা প্রকাশিত হয়। নিদ্রার কোমল স্পর্শে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া আসে, মৃত্যুর ছায়া ঘনাইয়া আসে, অথচ প্রাণের লীলা চলে, ধমনীতে রক্তপিণ্ডে আনন্দজীবননৃত্য প্রবাহ চলে! প্রাণের নীরব আনন্দসাড়া সর্ব্বাঙ্গে প্রাণ-জগতে ছুটিয়া চলে! অথচ ও কি নিদ্রাবেশ! ও কি সুপ্তি ঘোর! আনন্দ বিশ্রাম দৈহিক জীবনের স্বাস্থ্য আরাম দান করে। সুপ্তির আনন্দলীলার ভিতরই প্রতিদিনের কর্ম্মসাধনা, নবশক্তি নব আনন্দসূচনা। তেমনই আত্মার বিচিত্র চৈতন্য সত্তা মৃত্যুর ভিতর,—দেহ অবশ হইয়া গেল অথচ আত্মা জাগিয়া রহিলেন! মানব জীবনে সুপ্তির মহা-ঘোরের ভিতর এ কি ঐন্দ্রজালিক রহস্য! নিদ্রাই দৈহিক জীবনের প্রাণখাদ্য সঞ্চার করে, কোমল স্নিগ্ধ মাংসল সুস্থ সবল দেহখানি রচনা করে। এ কি অবর্ণনীয় লীলা মাহাত্ম্য! এই সুপ্তিঘোরের ভিতরই আবার আমার আমি সেই একই চেতনার সুরে জাগিয়া আছি, তাহার সেই একত্ব—স্থায়িত্ব মহিমা জাগিয়া রহিল, তেমনই মৃত্যুর আনন্দ সমাবেশে মহানিদ্রার ভিতর যেদিন সকল বহির্মুখীন ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া যাইবে, কে জানে আবার আমার মুক্ত প্রকাশের সে কি বিচিত্র উপলব্ধি!

সুপ্তির আবেশের ভিতর তন্দ্রাঘোরে আমার চেতনা স্বপ্নঘোরে কত কি দৃশ্যের অবতারণা করে, আর এক অখণ্ড প্রাণলীলা জাগ্রত হইয়া থাকে ! তন্দ্রাঘোরেও আমার অন্তরে অন্তরে কত কিছু ধারণা করি, দর্শন করি, চিন্তা করি, সুখ দুঃখের লীলা কানন রচনা করি ! তেমনই বুঝি যেদিন এ বহির্মুখীন লীলা শেষ হইয়া যাইবে, সেদিন আমার আনন্দে না জানি কি নব জাগরণ হইবে। আত্মজ্ঞানেই সকল জ্ঞানের মহিমা, আত্মজ্ঞানেই তাহার নিত্য নূতন কল্পনা নিত্য নূতন কর্ম্মসাধনা ; যদিও স্মৃতির ঘরে সব কথা সুস্পষ্ট হইয়া থাকে না, তবু সেই আমি, চির পুরাতন আমি, জাগিয়াই আছি ! অধ্যাত্ম লোকে শান্ত সমাহিত মৌন আত্মার ও কি দেহাতীত শাশ্বত মঙ্গল অস্তিত্ব-সত্তা উপলব্ধি ! মানুষ দেহের ঘরে বাস করিয়া তাহা শুভ মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করে। যুগে যুগে সাধু ভক্তদের ধন্য আনন্দ-সমাধি।

কি গভীর সুপ্তি ঘোর, কি তন্দ্রাবেশ, সকল অবস্থাতেই আমার চেতনাধারা একই ভাবে প্রবাহিত। আমার আমি আত্মস্বরূপেই জাগ্রত। জীবাত্মা তাহার বিচিত্র সত্তার ভিতর যাহা ক্ষণস্থায়ী তাহা পরিহার করেন, আর সত্যরূপে জাগ্রত হন। কত সময় হয়ত ভীষণ ব্যাধিতে কত অঙ্গ অবশ হইয়া গেল, তবু আমি যে আমি সে আমিই জাগিয়া রহিলাম। কত

মানুষ স্বপ্নঘোরে উঠে, চলে, কত কিছু করে, অথচ তাহার সে চলা, সে দেখা ত তাহার ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ জ্ঞানক্রিয়া নয়, অথচ জাগ্রত আত্মা কেমন সুনিপুণ সুশৃঙ্খলায় কত ক্রিয়ার আদান প্রদানের ভিতর তাহার জাগ্রত আত্মারই মহিমালীলা প্রকাশ করে। বহির্মুখীন ইন্দ্রিয় ঘুমাইয়া রহিল অথচ অন্তর্মুখীন জাগ্রত সত্তার জ্ঞানময় কর্ম্মপ্রবাহ চলিল। ইহার সত্য ব্যাখ্যা কে দিবে? আত্মার জাগরণেই দেহের কর্ম্মলীলা, ইন্দ্রিয়-জ্ঞান উপলব্ধিও এই আত্ম জাগরণেই প্রকাশিত। তাই আমি যখনই সুপ্ত, আমার ইন্দ্রিয়জ্ঞানও লুপ্ত। বহির্জগতের জ্ঞান, ইন্দ্রিয় দ্বারের বিচিত্র প্রতিষ্ঠার ভিতর আমার জ্ঞানলীলার ভিতর জাগ্রত।

জীবাত্মা দেহেই আবদ্ধ নন, যেদিন লীলা ফুরাইয়া যায়, জীবাত্মা মুক্ত হইয়া চেতন সত্তার ভিতর জাগিয়াই থাকেন। দেহের ঘরে বাস করিয়াও উপলব্ধি করি, যখন আমি সমাহিত হই আমার সকল ইন্দ্রিয় নিস্পন্দ হইয়া যায়, কোন্ বাহ্যজ্ঞানে উপলব্ধি আর থাকে না তখন দেহের ঘরে বাস করিয়াও বিদেহী হইয়া যাই। তাই ত মৃত্যুর ভিতরও আমার দেবত্ব অমরত্ব ভগবদ্গরিমা। দেহ পড়িয়া রহিল, ধূলার দেহ ধূলিসাৎ হইল, দৈহিক সংগ্রাম, দৈহিক বেদনা, দৈহিক জ্বালা ফুরাইয়া যাইল, আর চেতনাময় মুক্ত আত্মার কি দেবশক্তি

কি শাশ্বত স্বরূপ! যতই দেহমুক্তি ততই নিত্যানন্দ উপলব্ধি, জরামরণ রহিত শাশ্বত সচ্চিদানন্দলীলা।

ওগো আমার জীবন দেবতা! দেহমুক্ত আত্মার যেদিন উজ্জ্বল স্বরূপ লাভ হইবে কেমন করিয়া তোমার কাছে দাঁড়াইব। হায়! হায়! এখানে প্রিয়জনেরা ক্রন্দন করেন, আর আত্মলোকে দেহমুক্ত প্রিয়ধনদের ওকি আনন্দ সমাগম, শুভ সম্ভাষণ! সব একাকার। এলোকে ওলোকে ভালবাসা সব মেশামিশি। একি জয় গৌরব! এ দীনাত্মাও তোমারই বরে শুদ্ধ মুক্ত হইয়া তোমারই চরণপ্রান্তে আপনাকে নিবেদন করিয়া ধন্য হইল, কৃতার্থ হইল। এবার সত্য শুদ্ধ সত্তার ভিতর কৃতার্থ কর, ধন্য কর। ওগো পূর্ণ মঙ্গল সত্য সুন্দর, তোমারি জয়। ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্।

ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ।

ওঁ শান্তিঃ॥